কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

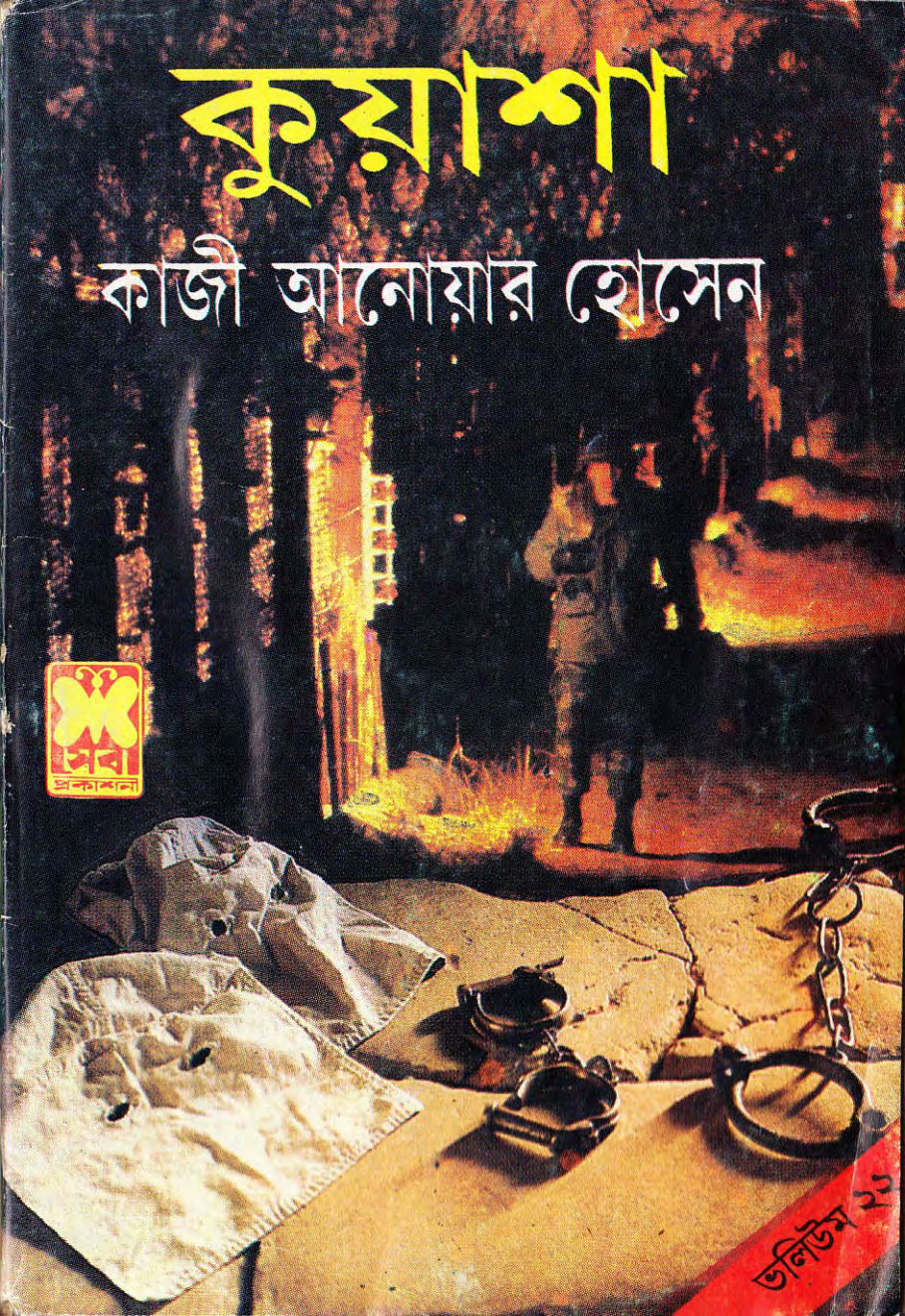

ভলিউম ২২

কুয়াশা

৬৪, ৬৫, ৬৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1112-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 22
KUASHA SERIES: 64, 65, 66
By: Qazi Anwar Husain

সাতাশ টাকা

কুয়াশা ৬৪: ৫—৫০
কুয়াশা ৬৫: ৫১—১০৩
কুয়াশা ৬৬: ১০৪—১৪৪

কুয়াশা ৬৪

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৭

এক

আতিকুর রহমানকে চেনে না এমন লোক দেশে খুব কমই আছে। তিনি একাধারে সুলেখক, চিত্র প্রযোজক। বক্স অফিস হিট করা আধ ডজন ছবির প্রযোজক তিনি। আতিকুর রহমানের আরও পরিচয় আছে। সবাই জানে তিনি বছর বিশ আগে একটা ছবিতে নায়ক হিসেবেও অভিনয় করেছিলেন। নিতান্ত কপর্দকহীন অবস্থা থেকে তিনি উন্নতির চরমে পৌঁছেচেন। ছায়াছবির ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য ব্যবসাও আছে তাঁর।

গণ্যমান্য লোক হিসেবে দেশে তাঁর খ্যাতি আছে। কাজকর্মে সৎ, চলনে বলনে ভদ্র, কথায়বার্তায় বিনয়ী। মোটামুটি শত্রুরা ছাড়া সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু শত্রু বা মিত্র, কেউই তাঁর একটি বিশেষ হবি বা দুর্বলতার কথা জানে না।

সৈয়দ আতিকুর রহমান একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর। দেশী-বিদেশী দুষ্প্রাপ্য বিচিত্র সব স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা তাঁর একটি শখ। এ ব্যাপারে তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরাও তাঁর এই বিশেষ হবিটি সম্পর্কে কিছু জানে না। তাঁর নব-বিবাহিতা স্ত্রী এ ব্যাপারে বহুবার প্রশ্ন করেছে ।

'এগুলো দেখতে সামান্য হলেও এক একটা অসামান্য, অমূল্য জিনিস। কারও নজরে পড়ুক তা আমি চাই না।'

ব্যস।

এর বেশি স্ত্রীকেও কিছু বলেননি কখনও তিনি। ক'জনই বা আর দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্পের মাহাত্ম্য বোঝে। তাঁর স্ত্রীও বোঝে না।

'ওই ছোট্ট ছোট্ট রঙিন কাগজের টুকরোগুলোকে অসামান্য বলছ? ক'পয়সাই বা দাম ওগুলোর!'

আতিকুর রহমান কথা বলেন না স্ত্রীর এ ধরনের অর্বাচীন মন্তব্যে। তবে মনে মনে তিনি সন্তুষ্টই হন। তাহমিনা যে স্ট্যাম্পগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না এটা তাঁর জন্য সুসংবাদ।

তাঁর স্ট্যাম্প কেউ দেখে ফেলবে, চুরি করে নেবে এই ভয়ে সর্বক্ষণ একধরনের আতঙ্কে ভোগেন তিনি। রীতিমত আশ্চর্যই বলা যায় তাঁর এই মানসিকতাকে। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা দেখাশোনা করছে তাঁর নিযুক্ত লোকেরা, তিনি কদাচ ব্যবসা ক্ষেত্রে যান কি না যান, সব কিছু ম্যানেজারদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। চুরি যে তারা করে না তা নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে তাঁর তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। যত মাথাব্যথা তাঁর এই ছোট্ট ছোট্ট রঙিন কাগজের টুকরোগুলোকে নিয়ে।

বাড়িটা তিনতলা। সামনে সুদৃশ্য বাগান। পিছনে বিরাট সুইমিংপুল। এত বড় বাড়িতে মানুষ বলতে মাত্র দু'জন। তিনি ও তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী তাহমিনা। গোটা পাঁচেক চাকর-চাকরানী অবশ্য আছে। তারা বাড়ির এক ধারেই থাকে।

একতলাটা আতিকুর রহমান নিজের দখলেই রেখেছেন। তাঁর অফিস এই নিচ তলাতেই। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন তিনি লাইব্রেরী রুমে বসে। পাশের রুমটাকে বলা যায় তাঁর হৃৎপিণ্ড। এই রুমেই আছে তাঁর স্ট্যাম্পের সংগ্রহ। দেয়ালের সাথে ফিট করা স্টীলের সেফ। কম্‌বিনেশন তালা দিয়ে বন্ধ করা। দিনে দু'বার কি তিনবার এই রুমে ঢোকেন তিনি। ঢোকার আগে ভাল করে দেখে নেন আশেপাশে কেউ আছে কি না। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই তিনি বন্ধ করেন দরজা। জানালাগুলো সর্বক্ষণ বন্ধই থাকে। দরজা বন্ধ করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না তিনি। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, কী-হোলে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করেন কেউ তাঁর উপর গোয়েন্দাগিরি করছে কি না।

গোয়েন্দাগিরি করার মত লোক অবশ্য একজন আছে। ছোকরা এমনিতে ভাল মানুষের চরম। যতই গালমন্দ করো, মুখে রা নেই। আছেও সেই ছোটবেলা থেকে। অবিশ্বাস করার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু···ছোকরার ভয়ঙ্কর একটা বদভ্যাস আছে। সে তাঁর স্ট্যাম্প কালেকশনের ব্যাপারে খুবই কৌতূহলী।

এই বিশেষ রুমটিতে তিনি ঢুকলেই কিভাবে যেন ছোকরাটা টের পেয়ে যায়। যেখানেই থাকুক ড্রয়িংরুমে চলে আসে। ড্রয়িংরুমের সাথের দরজাটা দিয়ে এই রুমটায় যাওয়া আসা করা যায়। দরজার গায়ের কী-হোলে চোখ রেখে ছোকরা দেখার চেষ্টা করে, কি করছেন তিনি। না, এ তাঁর অমূলক সন্দেহ নয়। তিনি জানেন, ছোকরার এই বিষয়ে কৌতূহল আছে। হাতে-নাতে তিনি আজও ছোকরাকে ধরতে পারেননি বটে। কিন্তু ধরতে পারাটা বড় কথা নয়। তিনি বুঝতে পারেন। দরজা খুলে বাইরে বের হলেই তিনি দেখতে পান ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। মুখের চেহারা পাংশু হয়ে যায়, মাথা হেঁট করে সরে যাবার চেষ্টা করে। একটা গর্হিত অন্যায় করার সময় ধরা পড়ে গেলে যা হয়।

ধমক-ধামকেও কাজ হয়নি। মাঝে মধ্যে মারধোরও করেন তিনি। কিন্তু অবস্থা থাকে তাই। রুমটার আশে পাশে তাকে দেখা যাবেই। টোটাকে তিনি বহুবার তাড়িয়ে দেবার কথা ভেবেছেন। কিন্তু টোটা আসলে তাঁর নয়, তাঁর স্ত্রীর চাকর। স্ত্রীকে চটাতে চান না বলে টোটাকে তাড়াতে পারেননি।

সেদিন সন্ধ্যার খানিক পর অতিথিদের বিদায় দিয়ে আতিকুর রহমান হাঁক ছাড়লেন, 'টোটা!'

টোটা দরজার বাইরেই দেয়াল ঘেঁষে সাহেবের হুকুম পাবার অপেক্ষায় ছিল। 'জ্বী, হুজুর' বলেই দোর গোড়ায় দাঁড়াল সে।

'তোর হাতে এখন কি কাজ?'

টোটা দুটো হাত চোখের সামনে তুলে দেখে নিল। বলল, 'কাজ নেই, হুজুর।'

'তবে যা, এক ঘণ্টার জন্যে তোর ছুটি। বাইরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আয়। এই

নে, এই টাকাটা নিয়ে যা, বাদাম কিনে খাবি। খবরদার, একঘণ্টার আগে বাড়ি ফিরবি না বলে দিচ্ছি।'

আতিকুর রহমান কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটি টাকা তুলে নিলেন, টাকাটা রাখলেন নিচু টেবিলের উপর।

এগিয়ে এল টোটা। টেবিল থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে জানতে চাইল, 'এক টাকার বাদাম একঘণ্টা ধরে খাব, তারপর বাড়িতে ফিরব—না, হুজুর?'

'হ্যাঁ। এবার দূর হ আমার সামনে থেকে।'

টোটা ত্রস্ত পদে বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে।

পাইপ ধরালেন আতিকুর রহমান সাহেব। মিনিট খানেক ধূমপান করার পর তিনি সোফা ছাড়লেন। পকেট থেকে চাবি বের করে একটি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। হঠাৎ কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন।

দেখলেন নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে টোটা দোর গোড়ায়।

'হারামজাদা! এখনও তুই যাসনি?' গর্জে উঠলেন আতিকুর রহমান সাহেব।

টোটা বলল, 'হুজুর, কোন মেহমান যদি আপনাকে ডাকতে আসেন তাহলে কি বলব? বাড়ির বাইরে, মানে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব কিনা আমি···।'

'বলবি আমি বাড়িতে নেই। যা ভাগ।' নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি টোটাকে।

টোটা চলে গেল। আতিকুর রহমান দরজার কবাট উন্মুক্ত করে ভিতরে ঢুকলেন, বোতাম টিপে টিউব লাইট জ্বাললেন, তারপর বন্ধ করে দিলেন দরজাটা ভিতর থেকে। চাবির গোছা থেকে বেছে বেছে বের করলেন অন্য একটি চাবি। গিয়ে দাঁড়ালেন ওয়াল-সেফের সামনে। কমবিনেশন মিলিয়ে তালা খুললেন।

রুমটা খুব যে ছোট তা নয়। কিন্তু আসবাবপত্র বলতে একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং একটি কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। মেঝেতে লাল কার্পেট বিছানো আছে। টেবিলের উপরটা শূন্য, শুধু একটা টেবিল ল্যাম্প রয়েছে।

ওয়াল-সেফ থেকে স্ট্যাম্প বুক বের করে টেবিলে রাখলেন আতিকুর রহমান। সেফটা বন্ধ করে বসলেন চেয়ারে। অতি ক্ষুদ্র একটা চিমটা এবং একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করলেন টেবিলের দেরাজ থেকে। স্ট্যাম্প বুক খুলে চিমটা দিয়ে একটা চারকোণা স্ট্যাম্প তুললেন, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে অতি মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করতে লাগলেন স্ট্যাম্পটাকে। গতকাল তিনি বেশ কিছু স্ট্যাম্প কিনেছেন। সেগুলো এখনও স্ট্যাম্প বুকে সাঁটা হয়নি। পরীক্ষা করে নিচ্ছেন, তারপর জায়গা মত সেঁটে রাখবেন।

ঠক! ঠক! দরজায় টোকা পড়ল।

চুপ করে রইলেন আতিকুর রহমান। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে রইল।

ঠক! ঠক! ঠক!

চেয়ার না ছেড়ে উপায় কি। রাগে জ্বালা করছে গা। কিন্তু কে না কে, রূঢ়

কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে।

দরজা খুললেন তিনি।

নির্বিকার মূর্তি টোটার। দরজার সামনে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কথা নয়, ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলেন আতিকুর রহমান টোটার গালে, 'হারামজাদা! আমার সাথে ফাৎরামি করছিস তুই! দাঁড়া, আজই তোকে আমি তাড়াচ্ছি এ বাড়ি থেকে।'

টোটা আহত গালে হাত বুলাতে থাকে। মাথাটা নিচু করে আছে। দু'চোখ ভরা পানি। কিন্তু কণ্ঠস্বর অকম্পিত, 'হুজুর, আমার কি দোষ, টেলিফোন বাজছিল যে!'

'তুই জানলি কিভাবে? তোর তো বাড়ির বাইরে থাকার কথা।'

আতিকুর রহমান আড়চোখে দেখলেন ফোনের রিসিভারটা ক্রেডলে নেই, নামানো রয়েছে টেবিলের উপর।

'গেটের বাইরে থেকেই তো শুনলাম। অনেকক্ষণ থেকে বাজছিল।'

আতিকুর রহমান অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চান, 'কে ফোন করেছে?'

'স্পেশাল অফিসার মি. সিম্পসন।'

আতিকুর রহমান দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, 'সিম্পসন? ও নামের কাউকে আমি চিনি না। বলে দে আমি বাড়িতে নেই।'

দরজার কবাট দুটো বন্ধ করে আবার মেলে দিলেন আতিকুর রহমান। কেমন যেন খটকা লাগছে। জানতে চাইলেন, 'কি যেন বললি? স্পেশাল অফিসার? স্পেশাল অফিসার মানে? কিসের স্পেশাল অফিসার?'

'সি. আই. ডি না কি যেন বললেন।'

আতিকুর রহমানকে চিন্তিত দেখাল, 'সি. আই. ডির স্পেশাল অফিসার? ব্যাপার কি? তাহলে তো জরুরী কোন ব্যাপার মনে হচ্ছে। সর, দেখি।'

ড্রয়িংরুমে ঢুকে সোফায় বসলেন আতিকুর রহমান সাহেব। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, 'সৈয়দ আতিকুর রহমান স্পিকিং।'

ফোনে কথা বলছেন তিনি ঠিক, কিন্তু নজর রয়েছে খোলা দরজার দিকে।

অপরপ্রান্ত থেকে পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন মি. সিম্পসন, 'আমি সি. আই. ডির স্পেশাল অফিসার সিম্পসন বলছি। রহমান সাহেব, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। ব্যাপার কি জানেন, আমরা একটা কেস নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছি। কেসটার ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন মনে করে…।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। সাহায্য করতে পারলে আমি খুবই খুশি হব। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনার সাহায্যে লাগতে পারি…।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আপনি তো প্রখ্যাত একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর, তাই না?'

আঁতকে উঠলেন আতিকুর রহমান সাহেব। রীতিমত দাবির সুরে ব্যাখ্যা চাইলেন পরমুহূর্তে, 'কোথা থেকে পেলেন আপনি এ তথ্য, মি. সিম্পসন? আমি

একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর একথা কেউ জানে না বললেই চলে। কে বলেছে আপনাকে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'স্ট্যাম্প কালেক্টর হিসেবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান মনে হচ্ছে, রহমান সাহেব?'

'অবশ্যই। আমি চাই না কেউ জানুক।'

'কারণ?'

'কারণটা ব্যক্তিগত। আমি চাই না আমার স্ট্যাম্পগুলোর প্রতি কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠুক।'

মি. সিম্পসন একটু বিরতি নিলেন, তারপর বললেন, 'আমাদের হাতে এমন একটা কেস এসেছে, যার সাথে স্ট্যাম্পের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। অনুমানের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয় আমাদের, বোঝেনই তো। এদিকে স্ট্যাম্প সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তাই দিল্লীর এক বিখ্যাত স্ট্যাম্প বিক্রেতার কাছে টেলিফোন করি। তারা বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারেনি—তা সম্ভবও নয়। আমাদের কেসের সাথে যে-সব স্ট্যাম্প জড়িত সেগুলো না দেখে তারা কিভাবে মতামত দেবে? সে যাই হোক, তারা টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদেরকে পরামর্শ দেয় আপনার সাথে যোগাযোগ করার। আপনি নাকি তাদের কাছ থেকে আজ দশ বছর ধরে স্ট্যাম্প কিনছেন।'

আতিকুর রহমান সাহেবকে বেশ একটু উৎফুল্লই দেখাল। বললেন, 'মি. সিম্পসন, স্ট্যাম্প সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কোন সমস্যায় পড়ে থাকেন, নির্ঘাৎ আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। তা সাহায্যটা কিভাবে করতে পারি?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'এক ভদ্রলোকের স্ট্যাম্প কালেকশন দেখতে হবে আপনাকে। তারপর আপনার মতামত নেব আমরা।'

'জাল স্ট্যাম্প? স্ট্যাম্পগুলো দেখে বলতে হবে আমাকে নকল স্ট্যাম্প ওগুলোর মধ্যে আছে কিনা?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কেসটা আরও গুরুতর, রহমান সাহেব। এটা একটা মার্ডার কেস। এবং আমরা জানতে চাই···।'

'হোয়াট! মার্ডার কেস? আই সি!'

মি. সিম্পসন তাড়াতাড়ি বললেন, 'মার্ডার কেস হলেও, আপনাকে সে ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। যে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তার কালেকশন দেখতে হবে শুধু আপনাকে। দেখে আপনি আমাদেরকে রিপোর্ট দেবেন। অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। কি জানেন, ঠিক কি যে সন্দেহ করছি তা ভাল করে আমরা নিজেরাই জানি না। তবে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তাঁর কালেকশন সামনে নিয়ে বসে থাকার সময়। তাই সন্দেহ করছি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে স্ট্যাম্পের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। একজন বিশেষজ্ঞের মতামত দরকার তাই। একমাত্র আপনিই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'সানন্দে সাহায্য করব। কোথায় যেতে হবে বলুন? আপনাদের হেডকোয়ার্টারে?'

'না। আপনি যদি দয়া করে ২১৫ নম্বর গুরুদাস লেনে আসেন তাহলে স্ট্যাম্পগুলো দেখাতে পারি। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি···।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'কোন দরকার নেই। আমি নিজের গাড়ি নিয়েই যাচ্ছি।'

মি. সিম্পসন আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, 'ধন্যবাদ, রহমান সাহেব। আপনার সহযোগিতার মনোভাব মুগ্ধ করেছে আমাকে।'

'ওসব কথা রাখুন। স্ট্যাম্প আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শখের ব্যাপার। একজন কালেক্টরের কালেকশন দেখার সুযোগ দিচ্ছেন আমাকে—আমি সত্যি ভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে। ছাড়ি, কেমন? এখুনি রওনা হচ্ছি আমি।'

'গুরুদাস লেন—খুঁজে পাবেন তো বাড়িটা? দু'শো পনেরো নম্বর বাড়ি। দোতলা।'

'খুঁজে নেব। অসুবিধে হবে না। ওই এলাকায় আগেও ক'বার গেছি আমি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে সোফা ত্যাগ করলেন আতিকুর রহমান।

'টোটা!'

দোর-গোড়ায় উদয় হলো টোটা সাথে সাথে, 'জ্বী, হুজুর!'

'আমি বাইরে যাচ্ছি। তোর বিবিসাহেবকে বলবি ফিরতে দেরি হতে পারে। যতক্ষণ না ফিরি, তুই উপরেই থাকবি। নিচে নামবি না।'

'জ্বী, হুজুর।'

আতিকুর রহমান ঘুরে দাঁড়ালেন। খোলা দরজা দিয়ে পাশের রুমে ঢুকলেন তিনি। দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ভেজানো দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। শব্দ পেয়ে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আতিকুর রহমান। দেখলেন টোটা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

'এখনও উপরে যাসনি তুই?'

টোটা বলল, 'হুজুর, রাতে কে গেট খুলে দেবে আপনাকে?'

রাগ সামলে আতিকুর রহমান বললেন, 'গেট খোলা থাকবে। যা ভাগ।'

টোটা চলে গেল।

আতিকুর রহমান টেবিল থেকে স্ট্যাম্প বুক ইত্যাদি ওয়াল সেফে ভরে তালা বন্ধ করলেন। মিনিট পাঁচেক পর রুমের তালা লাগিয়ে বাইরে বেরুলেন তিনি। গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে।

দোতলার বারান্দা থেকে টোটা দেখল সব। গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যেতে বিড় বিড় করে বলল, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে! দোষ নেই, অপরাধ নেই—শুধু শুধু আমার গায়ে হাত তোলে! রঙিন আজে বাজে কাগজ নিয়ে কি কাণ্ডই না করে! ওই ঘরের ভিতর যেন সোনার খনি আছে। আমার গায়ে হাত তোলে, সুযোগ পেলে আমিও দেখিয়ে দেব···।'

গুরুদাস লেনের ২১৫ নম্বর বাড়িটা পুরানো ধাঁচের, তবে প্রকাণ্ড আকারের দোতলা। গেটটা বন্ধ। নামফলকটা পড়লেন আতিকুর রহমান।

সেকান্দার আলী খান, অ্যাডভোকেট।

কলিংবেলের বোতাম টিপে ধরতে একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। আতিকুর রহমান একটু যেন অপ্রতিভ হলেন।

'কাকে চান?'

আতিকুর রহমান মৃদু হেসে বললেন, 'মি. সিম্পসনকে খবর দিন। বলুন, রহমান সাহেব এসেছেন।'

'মি. সিম্পসন? মি. সিম্পসন কে?' বিরক্তির সাথে চেয়ে রইল যুবতী।

'মি. সিম্পসন, সি. আই. ডির স্পেশাল অফিসার— আমাকে ফোন করে এই ঠিকানায় আসতে বললেন···।'

যুবতী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে একটু রূঢ় কণ্ঠেই জানিয়ে দিল, 'মি. সিম্পসন নামে কেউ এখানে থাকেন না।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আতিকুর রহমান।

'কে, লিলি?' যুবতীর পিছন থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল। যুবতী পিছন দিকে তাকাল, তারপর সরে দাঁড়াল এক পাশে। বলল, 'বাবা, এক ভদ্রলোক মি. সিম্পসন নামে কাকে যেন খুঁজছেন।'

প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, মস্ত টাক তাঁর মাথায়, দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'মি. সিম্পসন? আপনি কে?'

আতিকুর রহমান বললেন, 'আপনাদের বাড়ি ২১৫ নম্বর নয়? গুরুদাস লেন, তাই না? ভদ্রলোক আমাকে ঠিকানাটা দু'বার বলেছেন···।'

'মিথ্যে কথা বলেছে, বুঝতেই পারছেন। বন্ধু-টন্ধু বুঝি? হয়তো ঠাট্টা করেছে।'

আতিকুর রহমান মনে মনে চটছিলেন। কিন্তু চোট-পাট দেখিয়ে লাভ কি!

যুবতীটি ফিসফিস করে কি যেন বলছে প্রৌঢ়কে।

প্রৌঢ় বললেন, 'সি. আই. ডি? তার মানে পুলিশী ব্যাপার। না-না, পুলিশ-টুলিশ এদিকে কেউ থাকেন না, আমরা কেউ ডাকিনিও। আপনি বরং···।'

আতিকুর রহমানের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এই ২১৫ নং বাড়িতে মি. সিম্পসন নামে কেউ উপস্থিত নেই। তিনি দ্রুত ভাবছিলেন। সত্যিই কি কেউ তাঁর সাথে ঠাট্টা করেছে? মিছিমিছি ফোন করে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের ফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি? সি. আই. ডি. হেডকোয়ার্টারে ফোন করে দেখতাম একবার।'

প্রৌঢ় কিছু যেন ভাবলেন। তারপর মাথা নাড়লেন, 'না। আমাদের ফোনটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে ক'দিন থেকে।'

আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠলেন আতিকুর রহমান। স্টার্ট দিলেন।

প্রৌঢ় হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'এই যে মিস্টার, শুনুন। রাস্তার নামটা ঠিক মনে আছে তো আপনার? গুরুদাস বসাক লেন, নাকি গুরুদাস সরকার লেন? প্রায় একই নামের তিন চারটে লেন আছে···।'

আতিকুর রহমান গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, 'গুরুদাস লেনই তিনি বলেছিলেন আমাকে।'

'গোলমালটা ওখানেই, মিস্টার। এই লেনটাকে সবাই গুরুদাস লেন বললেও এটা আসলে গুরুদাস বসাক লেন। গুরুদাস সরকার লেনও আছে একটা। আমাদের কাছে গুরুদাস সরকার লেনের চিঠিপত্র মাঝেমধ্যে এসে পড়ে, পিয়ন ভুল করে দিয়ে যায়।'

গাড়ি থেকে নেমে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছ থেকে গুরুদাস সরকার লেনের অবস্থান সম্পর্কে বিশদ জেনে নিলেন আতিকুর রহমান। তারপর আবার গাড়িতে চড়লেন।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে। জোরেই গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি। মিছামিছি পঁচিশটা মিনিট নষ্ট হয়ে গেল।

গুরুদাস সরকার লেনটা মাইল খানেক দূরে। কয়েকটা বাড়ির নেমপ্লেটে জায়গাটার নাম দেখে মনটা আরেকটু দমে গেল নতুন করে। গুরুদাস সরকার লেন নয়, শ্রী গুরুদাস সরকার লেন। এই শ্রী শেষ পর্যন্ত বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি না করে আবার।

২১৫ নম্বর বাড়িটা নতুন। আধুনিক আর্কিটেকচারের নিদর্শন বলা চলে। ছোট একটা সুন্দর বাগান দেখা যাচ্ছে গেটের ভিতর। গেটটা খোলা। কংক্রিটের রাস্তা চলে গেছে বিল্ডিংটার দিকে। শেষ মাথায় দুটো গাড়ি, একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

গেট পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছে গেলেন আতিকুর রহমান। গাড়ি থেকে নেমে বন্ধ একটা দরজার গায়ে টোকা দিলেন।

ইউনিফর্ম পরা একজন কনস্টেবল দরজা খুলে দিল।

'মি. সিম্পসন কোথায়?'

কনস্টেবলটি জানতে চাইল, 'আপনি মি. রহমান, স্যার?'

আতিকুর রহমান মাথা নাড়তে কনস্টেবলটি সামনের পথ ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আসুন, স্যার। মি. সিম্পসন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

দরজা পেরিয়ে লম্বা হলরুমে ঢুকলেন আতিকুর রহমান। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। বাড়ির মালিক যে ধনী, তা বোঝা যায় ফার্নিচারের ডিজাইন এবং সংখ্যা দেখে। রেলিং দেয়া, কার্পেট মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার দিকে। উপর থেকে ভেসে আসছে একটি নারী কণ্ঠ থেকে মৃদু, অস্পষ্ট কান্নার শব্দ।

কনস্টেবলের পিছু পিছু খোলা দরজা দিয়ে একটি মাঝারি আকারের সুসজ্জিত রুমে ঢুকলেন আতিকুর রহমান। রুমের ভিতর চারজন ভদ্রলোক উপস্থিত রয়েছেন। খুব ফর্সা তাদের মধ্যে একজনই। ইনিই যে মি. সিম্পসন তা বুঝতে পারলেন আতিকুর রহমান।

দরজার দিকে পিছন ফিরে সুঠামদেহী এক ভদ্রলোকের সাথে নিচু কণ্ঠে আলাপ করছিলেন মি. সিম্পসন। সুঠামদেহী ভদ্রলোকই প্রথম দেখতে পেলেন তাঁকে। মৃদু একটু হাসলেন তিনি। ভদ্রলোককে আতিকুর রহমান চিনতে পেরেছেন। পরিচয় না

থাকলেও ছবি দেখেছেন তিনি সংবাদপত্রে।

অপর একজন লোক প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গাদা গাদা কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করছেন, বেছে বেছে কোন কোনটা পড়ছেন, রেখে দিচ্ছেন একপাশে। অপর একটি টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে আছেন আর এক ভদ্রলোক। টেবিলের উপর মোটা মোটা অ্যালবাম। অ্যালবামগুলোর লেদারের কভার কুঁচকে গেছে, মসৃণতা নেই এতটুকু। কোণাগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। বোঝা যায়, অ্যালবামগুলো বহুদিন থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিটি অ্যালবামের উপর দুটো অক্ষর লেখা রয়েছে। E এবং K।

পদশব্দ শুনে মি. সিম্পসন ঘুরে দাঁড়ালেন।

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মি. রহমান।'

হ্যাণ্ডশেক করতে করতে মি. সিম্পসন বললেন, 'আসুন পরিচয় করিয়ে দিই।'

সুঠাম দেহী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আতিকুর রহমান সহাস্যে বললেন, 'ওঁকে চিনি। পরিচয় নেই—তবু চিনি। বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানকে কে না চেনে?'

শহীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন আতিকুর রহমান। করমর্দন করতে করতে শহীদ বলল, 'পৌঁছুতে একটু দেরি করেছেন আপনি, মি. রহমান।'

'ঠিকানাটাই যে গোলমেলে। গুরুদাস সরকার···।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'দুঃখিত, মি. রহমান। ভুলটা আমারই। এ বাড়ি থেকে ফোন পেয়ে আমরাও ওই ঠিকানার দিকে রওনা হয়েছিলাম···।'

আতিকুর রহমান প্রশ্ন করলেন, 'ঘটনাটা তাহলে গত রাতে ঘটেছে?'

মি. সিম্পসন সিগারের ছাই ঝাড়লেন টেবিলের উপরের অ্যাশট্রেতে। সময় নিলেন তিনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। রাত ন'টা থেকে মাঝরাতের মধ্যে কোন একসময়।'

টেবিলে কার্যরত দু'জনকে দেখিয়ে মি. সিম্পসন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'এরা আমার সহকারী। ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ, সাব ইন্সপেক্টর বোরহান। বসুন, মি. রহমান।'

পাইপ টানতে টানতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল শহীদ আতিকুর রহমানকে। আতিকুর রহমান বসলেন। তাকালেন শহীদের দিকে, 'খুন হয়েছেন কে? এ বাড়ির মালিক···।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। মি. ইব্রাহিম।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের নাম শুনেছেন? বিখ্যাত ধনী ছিলেন। আপনার মতই নাম করা স্ট্যাম্প কালেক্টর।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'হ্যাঁ, নাম শুনেছি। কিন্তু পরিচয় ছিল না। কিন্তু তিনি যে একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর ছিলেন, তা আমার জানা ছিল না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ভদ্রলোক অনেকটা আপনার মতই। হবিটা গোপন রাখতেই ভালবাসতেন। স্ত্রী মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেননি। আপনজন বলতে একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। ইব্রাহিম

সাহেব এ বাড়িতে একাই বসবাস করছিলেন। চাকর চাকরানী মাত্র দু'জন। দু'জনই গতরাতে বাড়ির বাইরে ছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী গিয়েছিল নিজেদের গ্রামে। গতরাত ন'টায় যায় ওরা, যাবার সময় এই রুমে ওই টেবিলটার সামনে ইব্রাহিম সাহেবকে বসে থাকতে দেখে গিয়েছিল ওরা। যে চেয়ারটায় আপনি বসে রয়েছেন, ওই চেয়ারটাতেই।'

আতিকুর রহমানের কাঁচাপাঁকা ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাল। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন তিনি।

মি. সিম্পসন বলে চলেছেন, 'টেবিলের উপর স্ট্যাম্পের অ্যালবামগুলো ছিল। বেশিরভাগই ছিল বন্ধ, একটি মাত্র ছিল খোলা। আজ বেলা এগারোটার সময় স্বামী-স্ত্রী একযোগে ফেরে ওরা। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে দু'জনই, দেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন ইব্রাহিম সাহেব। ওরা ভাবে, ঘুমোচ্ছেন তিনি। তবে ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে যায়। তারপর কাছাকাছি গিয়ে দেখে চোখ দুটো খোলা, সিলিংয়ের দিকে নিবদ্ধ, মণি দুটো অচল, নিষ্প্রাণ। ওরা বুঝতে পারে, ইব্রাহিম সাহেব বেঁচে নেই। ডাক্তার আর পুলিশকে ফোন করে ওরা।'

মি. সিম্পসন বিরতির জন্যে থামলেন।

'মৃত্যুর কারণ?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'গলায় দাগ পাওয়া গেছে। চেয়ারের পাশে পাওয়া গেছে একটা সিল্কের বড় রুমাল।'

রুমালটা ইব্রাহিম সাহেবেরই। কোন সন্দেহ নেই খুনী ইব্রাহিম সাহেবের গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ধরেছিল—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

আতিকুর রহমান তাকালেন শহীদের দিকে। মৃদু হেসে বললেন, 'প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খান স্বয়ং এখানে উপস্থিত! রুমালটা একটা বিরাট সূত্র, এই সূত্র অনুসরণ করে খুনীকে খুঁজে বের করে ফেলবেন, কি বলেন?'

হাসল না শহীদ। বলল, 'রুমাল ছাড়াও সূত্র আমাদের হাতে আরও রয়েছে, মি. রহমান।'

আতিকুর রহমান ঘাম মোছার জন্য পকেট থেকে একটা রুমাল বের করলেন।

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'আপনি যেমন ঘাম মোছার জন্যে রুমাল বের করলেন, ইব্রাহিম সাহেবও সম্ভবত ঘাম মোছার জন্যে রুমাল বের করেছিলেন। খুনী তার হাত থেকে রুমালটা কেড়ে নেয়, পেঁচিয়ে ধরে গলায়...।'

আতিকুর রহমান গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কপালের ঘাম মুছে পকেটে রাখলেন রুমালটা। সবাই তাঁকে লক্ষ করছে, বুঝতে পারলেন তিনি। তাঁর রুমালটাও সিল্কের, দৃষ্টি এড়ায়নি কারও।

'খুনী ইব্রাহিম সাহেবের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও কেউ হতে পারে। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ স্ট্যাম্প সংগ্রাহক আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে,' বললেন ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ।

মি. সিম্পসন বললেন, 'খুনী যে-ই হোক, স্ট্যাম্পের সাথে সে কোন না কোন ভাবে জড়িত, এটা আমাদের বিশ্বাস। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম সাহেবের অতীত জীবন

সম্পর্কে প্রায় সব তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছি আমরা। তাঁর শত্রু ছিল না। নিতান্ত নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন তিনি। জীবনে কারও সাথে ঝগড়া করেননি। ব্যবসায়ী হলেও, নিজে দেখাশোনা করতেন না কিছু। শুধু কাগজ-পত্রে সই করতেন, তাও এই বাড়িতে বসে। রউফ আর সাবিহা একেবারে ছোটবেলা থেকে আছে এই বাড়িতে, বাকি জীবনটাও তারা এই বাড়িতে কাটাবে, ইব্রাহিম সাহেবের সেইরকমই ইচ্ছা ছিল। ওরা গতরাতে নিজেদের গ্রামেই ছিল, সন্ধান নেওয়া হয়েছে। মোটকথা, ওরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তাছাড়া, ওদের মোটিভই বা কি হতে পারে? আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, খুনী ভিতরে ঢুকেছে, খুন করেছে, চলে গেছে। কেউ তাকে দেখেনি। বাড়িতে ছিলও না কেউ, দেখবে কে? কিছুই চুরি যায়নি। আয়রন সেফে টাকা ছিল হাজার দশেক। ছোঁয়নি খুনী। ইব্রাহিম সাহেব ইন্সুরেস করেননি, উইলও করার প্রশ্ন দেখা দেয়নি। তাঁর অবর্তমানে সমুদয় অর্থ, সয়-সম্পত্তির মালিক হবে তাঁর একমাত্র মেয়ে রুবিনা।'

'হলরুমে ঢুকে এক মহিলার কান্নার শব্দ পেয়েছি আমি···।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মিসেস রুবিনা। নারায়ণগঞ্জ থাকেন। খবর পেয়ে স্বামীর সাথে এসেছেন দুপুরে। সেই থেকে কাঁদছেন। ওর স্বামী জুট এক্সপোর্টার, বিরাট ধনী।'

আতিকুর রহমান জানতে চাইলেন, 'খুনীকে পাকড়াও করা বেশ কঠিন হবে মনে হচ্ছে, কি বলেন? তা সে যাই হোক, আমি এ ব্যাপারে আপনাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তাই বলুন।'

মি. সিম্পসন তাকালেন শহীদের দিকে।

শহীদ বলল, 'আপনার সাহায্য আমিই চেয়েছি মি. রহমান। আপাতদৃষ্টিতে খুনের উদ্দেশ্য ডাকাতি না হলেও, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারছি না। নগদ টাকা বা মূল্যবান গহনা হয়তো ডাকাতি করার জন্যে খুনী আসেনি। সে হয়তো স্ট্যাম্প ডাকাতি করার জন্যে এসেছিল। স্ট্যাম্প সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞই বলতে পারেন। তবে, জানি, কোন কোন দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্পের দাম কয়েক লাখ টাকা বা তার চেয়েও বেশি। এই দিকটা আপনাকে দেখতে হবে। ইব্রাহিম সাহেবের কালেকশনটা দেখুন আপনি। হয়তো দামী কোন স্ট্যাম্প চুরি গিয়ে থাকতে পারে। চুরি হয়ে থাকলে ব্যাপারটা আপনার চোখে ধরা পড়তে পারে, তাই না?'

আতিকুর রহমান মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'অবশ্যই। ইব্রাহিম সাহেব তাঁর স্ট্যাম্প যদি নির্দিষ্ট কোন নিয়মে সাজিয়ে রেখে গিয়ে থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই, আমি দেখেই বলে দিতে পারব কোনও স্ট্যাম্প চুরি গেছে কিনা।'

টেবিলের দিকে চেয়ার সরিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি, টাইয়ের নটটা ঢিল করে নিলেন একটু, বললেন, 'আপনারা বলছেন, টেবিলের উপর একটা অ্যালবাম খোলা ছিল। কোন্‌টা সেটা?'

শহীদ আঙুল দিয়ে মোটা একটা অ্যালবাম দেখিয়ে বলল, 'বাঁ দিকেরটা।'

'খোলা অবস্থায় কত নম্বর পৃষ্ঠা দেখা যাচ্ছিল?'

মি. সিম্পসন তাকালেন শহীদের দিকে।

শহীদ বলল, 'একশো দুই এবং তিন নম্বর পৃষ্ঠা। দাঁড়ান, খুলে দিচ্ছি।'

অ্যালবামটার নির্দিষ্ট পাতা খুলল শহীদ।

আতিকুর রহমান পকেট থেকে একটা খাপ বের করলেন। লেদার খাপ থেকে চশমাটা বের করে চোখে আঁটলেন। ঝুঁকে পড়লেন খোলা অ্যালবামের উপর। হেডিংটা পড়লেন বিড়বিড় করে, 'কেপ অভ গুড হোপ।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'শূন্য ফ্রেমগুলো দেখছেন মি. রহমান? খালি কেন ওগুলো? কি বোঝাচ্ছে…?'

আতিকুর রহমান সাবধান করে দিয়ে বলে উঠলেন, প্রায় ধমকেই উঠলেন বলা যায়, 'আহ্! করছেন কি. মি. সিম্পসন! খালি হাতে ধরবেন না বলে দিচ্ছি, নখ লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। স্ট্যাম্প খুবই ভঙ্গুর জিনিস। কত বছরের পুরানো জিনিস—বুঝতে পারছেন না? দিন, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমাকে দিন।'

গ্লাস দিয়ে দেখতে দেখতে তিনি খানিক পর বললেন, 'খালি ফ্রেমগুলো কোন অর্থই বহন করছে না, মি. সিম্পসন। ওগুলো প্রথম থেকেই খালি ছিল। ভাল কথা, একটা কথা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। স্ট্যাম্প কালেক্টররা কখনও স্ট্যাম্পের পিছনে জিভ দিয়ে থুথু মাখিয়ে অ্যালবামের উপর তা সাঁটে না। চিঠি লিখে, খামে ভরে, খামের উপর অবশ্য ওই ভাবে স্ট্যাম্প লাগায় বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু একজন জেনুইন স্ট্যাম্প কালেক্টর তা করেন না। তিনি কিভাবে কাজটা করেন বলুন তো?'

সবাই চেয়ে রইল আতিকুর রহমানের দিকে।

'ফ্রেমগুলোর মাথার উপর এই যে ছোট ছোট কাগজের টুকরো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোর একটা দিকে গাম লাগানো আছে। অ্যালবামের পৃষ্ঠায় এই গাম লাগানো কাগজের একটা প্রান্ত সাঁটা হয়, তারপর ভাঁজ করা হয় কাগজের টুকরোটা, ফলে গাম লাগানো দিকটা উপরে চলে আসে। তখন স্ট্যাম্পটাকে ওই গাম লাগানো দিকটায় চেপে ধরা হয়। সুন্দর আটকে থাকে স্ট্যাম্প। দরকারের সময় খোলা যায় অনায়াসে, স্ট্যাম্পের কোন ক্ষতিই হয় না এতে করে। খালি ফ্রেমগুলোয় যে স্ট্যাম্প ছিল না কোনকালে তা কিভাবে বুঝলাম বলুন তো? গাম লাগানো কাগজের টুকরোগুলোর দিকে তাকান, একটাও ভাঁজ করা নয়, তাই না? স্ট্যাম্প থাকলে ভাঁজ থাকতই। এখন বুঝতে পারছেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হুঁ।'

'বড় লোভনীয় কালেকশন ভদ্রলোকের!'

আতিকুর রহমান আত্মভোলা হয়ে উঠেছেন। কোন দিকে খেয়াল নেই তাঁর এখন। স্ট্যাম্প দেখলে তাঁর এই অবস্থা হবেই হবে—সব ভুলে ডুবে যাবেন বিশেষত্ব আবিষ্কারে।

'অনেক বছরের কঠোর সাধনার ফল এই সংগ্রহ! খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক জীবিত থাকতে এই হবির কথা আমি জানতে পারিনি। দেখা যাচ্ছে আমরা দু'জনে একই বিক্রেতার কাছ থেকে স্ট্যাম্প কিনেছি। দিল্লী, হংকং, ব্যাঙ্কক,

ম্যানিলা—বিভিন্ন জায়গার এজেন্টদের কাছ থেকে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেছেন··· করেছিলেন ইব্রাহিম সাহেব। আরে···মাই গড···।'

অকস্মাৎ নিষ্প্রাণ মূর্তিতে পরিণত হলেন আতিকুর রহমান। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন তিনি খোলা অ্যালবামের দিকে। এইমাত্র অ্যালবামের পাতা উল্টেছেন তিনি। পাতা উল্টে কিছু এমন দেখতে পেয়েছেন যা দেখে চমকে উঠেছেন ভীষণভাবে।

'ব্যাপার কি বলুন তো? কোথাও কোন অসঙ্গতি লক্ষ করছেন? আবিষ্কার করেছেন এমন কিছু যাতে বোঝা যায়···?'

মি. সিম্পসন চুপ করে গেলেন আপনা থেকেই। আতিকুর রহমানের মুখের চেহারা দেখে হতবাক তিনি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ঘামে ভিজে গেছে তাঁর মুখ। তাকালেন তিনি আবার অ্যালবামের দিকে। দুটো পৃষ্ঠা ভরা স্ট্যাম্প। দুই পৃষ্ঠার কোথাও খালি ফ্রেম নেই। প্রত্যেকটি ফ্রেমেই রয়েছে স্ট্যাম্প।

'কিছু বলুন মি. রহমান! কি দেখে অমন চমকে উঠলেন?' ইন্সপেক্টর সাদত জানতে চাইলেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন! বলছি, কি আবিষ্কার করেছি বলছি আমি!'

সিল্কের রুমালটা পকেট থেকে বের করলেন আতিকুর রহমান। মুখটা মুছলেন ভাল করে। কেউ লক্ষ না করলেও শহীদের দৃষ্টি এড়াল না একটা ব্যাপার। আতিকুর রহমানের দুটো হাতই কাঁপছে।

'আর কিছু দেখার দরকার নেই আমার। যা দেখেছি তাতেই বলতে পারি, স্ট্যাম্প চুরি করার জন্য খুনী খুন করেনি।'

'কিভাবে বুঝতে পারছেন?'

আতিকুর রহমান চোখ তুলে তাকালেন মি. সিম্পসনের দিকে। বললেন, 'এই যে পৃষ্ঠাটা দেখছেন, এর মধ্যে বারোটা স্ট্যাম্প রয়েছে, তাই না? এই বারোটার মধ্যে একটা স্ট্যাম্প রয়েছে যার মূল্য এত বেশি যে আপনাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্পগুলোর মধ্যে এটি একটি।'

'কোন্‌টা? কোন্ স্ট্যাম্পটার কথা বলছেন আপনি?'

আতিকুর রহমান ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'দেখিয়ে না দিলে স্ট্যাম্পটাকে খুঁজে বের করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেখতে সবগুলোই তো প্রায় একরকম। তবে আমার চোখে তা নয়। আমি এক পলক দেখেই বলে দিতে পারি কোন্ স্ট্যাম্পটার গুরুত্ব কতটুকু, মূল্য কি। আমি যে বিশেষ স্ট্যাম্পটার কথা বলছি সেটার নাম হলো কেপ অভ গুড হোপ ট্রায়াঙগুলার, এই এইটা, এই তেকোণা স্ট্যাম্পটা। এক মিনিট সময় দিন আমাকে। স্কট কি লিখছে এটা সম্পর্কে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের।'

টেবিলের একধার থেকে মোটা একটা বই টেনে নিলেন আতিকুর রহমান। স্ট্যাম্প কালেক্টরদের বাইবেল বলা হয় এই বইকে। পৃথিবীতে যত স্ট্যাম্প ছাপা এবং বিলি করা হয়েছে, সবগুলোর বর্ণনা এবং ক্যাটালগ ভ্যালু ছাপা রয়েছে এই

বইয়ে।

'এই যে, এই দেখুন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এর মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে দেড়শো হাজার ডলার। এখন পাঁচশো হাজার ডলার তো হবেই। এক ডলার যদি তেরো টাকা হয়—৬৫ লক্ষ টাকা দাম এই স্ট্যাম্পটার!'

অকস্মাৎ সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন মি. সিম্পসন। কর্কশ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। চিৎকার করে জানতে চাইলেন তিনি, 'মানে? মি. রহমান, আপনি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন নাকি?'

ইন্সপেক্টর সাদত খিল খিল করে হাসলেন। 'ছোট্ট অতটুকু একটা কাগজের দাম পঁয়ষট্টি লাখ টাকা! মাথা-টাথা ঠিক আছে তো রহমান সাহেব আপনার?'

রীতিমত ধমকে উঠলেন আতিকুর রহমান, 'চুপ করুন! বোকার মত কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি! স্ট্যাম্প সম্পর্কে ঘোড়ার ডিম জানেন আপনারা! আমি যা বলি কান পেতে শুনে যান, মন্তব্য করে নিজেদের বোকামি প্রকাশ করবেন না। শেষবার যখন এই স্ট্যাম্পটা হাত বদল হয় তখন দেড়শো হাজার ডলার দেওয়া হয় বিক্রেতাকে। আসলে এটা অমূল্য একটা জিনিস। ডলার, টাকা বা স্বর্ণ দিয়ে এর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, জানামতে মাত্র তিনটে কেপ অভ গুড হোপ ট্রায়াঙগুলার আছে গোটা দুনিয়ায়। মৃত কিং জর্জের কালেকশনে একটি, মৃত রাশিয়ান জারের কালেকশনে একটি এবং তিন নম্বরটি ছিল ফেরারীর কালেকশনে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্যারিসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই তিন নম্বর স্ট্যাম্পটি নিলামে বিক্রি করা হয়। এটা সম্ভবত প্রথম দুটির একটি, যদি এটা জেনুইন হয়ে থাকে, যদি এটা নকল না হয়। জাল বা নকল আছে বহু।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'এটা নকল কিনা বুঝতে পারছেন না?'

'এখুনি বলা সম্ভব নয়।' আতিকুর রহমান অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'খালি চোখে এমনকি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করেও বলা সম্ভব নয় এটা জাল স্ট্যাম্প কিনা। ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টর দরকার।

শহীদ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার ও জানতে চাইল, 'স্ট্যাম্পের সাথে খুনের কোন সম্পর্ক নেই বলছেন কেন?'

'এমন মহামূল্যবান স্ট্যাম্প চুরি যায়নি—এটাই তো প্রমাণ করে খুনী স্ট্যাম্প চুরি করতে আসেনি। সেরকম উদ্দেশ্য থাকলে এই স্ট্যাম্প এখানে থাকত না।'

শহীদ বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে এটা আসলে নকল স্ট্যাম্প, জেনুইনটা খুনী নিয়ে গেছে, তার বদলে রেখে গেছে নকলটা—যাতে ব্যাপারটা ধরা না পড়ে কারও চোখে।'

'নট ইমপসিবল্। এখুনি রায় দিতে পারছি না আমি। তবে, মনে হয় তেমন কিছু ঘটেনি। ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করতে হলে স্ট্যাম্পটাকে অ্যালবাম থেকে তুলতে হবে। তারপর আসলটার জায়গায় নকলটা সাঁটতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে তেমন কিছু ঘটেনি। ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা গ্লাস দিয়ে ভাল করে লক্ষ করুন, কর্ণারগুলো মসৃণ রয়েছে। গামের উপর এতটুকু দাগ নেই। একটা স্ট্যাম্প তুলে অন্য একটা স্ট্যাম্প সেখানে লাগালে দাগ একটু থাকতই।'

মি. সিম্পসন কিছু ভাবছিলেন। আতিকুর রহমান থামতে তিনি বলতে শুরু করলেন। 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে এই বিশেষ স্ট্যাম্পটা খুনী দেখেও চুরি করার সাহস পায়নি। আপনি ইতিমধ্যে যতটুকু বলেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে এই বিশেষ স্ট্যাম্পটি মহামূল্যবান, স্ট্যাম্প কালেক্টররা এর সম্পর্কে ডিটেলস জানে। এটা চুরি করা হয়তো সম্ভব কিন্তু হজম করা সম্ভব নয়। চোর ধরা পড়বেই পড়বে। কারণ চোর এটা চুরি করে বিক্রি করতে চেষ্টা করবে তো? কোথায় বিক্রি করবে সে? নিশ্চয়ই কোন স্ট্যাম্প কালেক্টর বা ব্যবসায়ীর কাছে। বিক্রি করতে গেলেই হৈ-চৈ পড়ে যাবে, তাই না? চোর হয়তো এত বড় ঝুঁকি নিতে চায়নি। অপেক্ষাকৃত কম দামী স্ট্যাম্পগুলো হয়তো চুরি করেছে সে, কিন্তু ভয়ে এটা ছোঁয়নি। নিশ্চিত হবার জন্যে, মি. রহমান আপনাকে A থেকে Z পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

তেকোণা কেপ ট্রায়াঙগুলারের দিকে সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আতিকুর রহমান। চুম্বকের মত আকৃষ্ট করছে তাঁকে ছোট্ট তেকোণা স্ট্যাম্পটা।

অস্ফুটে তিনি বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে। চেক করব আমি সবগুলো অ্যালবাম। অ্যালফাবেটিক্যালি সব দেখতে হবে আমাকে। কোন দেশই বাদ দেয়া চলবে না।'

কোটটা খুলে ফেললেন তিনি। নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।

'অনেক বেশি খাটতে হবে আপনাকে। আপনি যদি চেকিংয়ের পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিতেন তাহলে আমরাও কাজে লাগতে পারতাম।' বললেন ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ।

'অসম্ভব। স্ট্যাম্প কালেক্টর ছাড়া আর কারও পক্ষে দেখে বোঝা সম্ভব নয় অ্যালবাম থেকে কোন স্ট্যাম্প চুরি গেছে কিনা। খাটনিটা কম হবে না, সত্যি। কিন্তু এ আমি আনন্দের সাথে করব। এটা আমার হবি। এর মধ্যে মজা পাব বলেই করব।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা রুমাল দিয়ে পলিশ করতে লাগলেন আতিকুর রহমান।

সবাই লক্ষ করছে তাঁর কাজ। পাতার পর পাতা ওল্টাচ্ছেন তিনি। একটা একটা করে স্ট্যাম্প গ্লাস দিয়ে দেখছেন। প্রচুর সময় লাগছে। কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই কিন্তু মিনিট দশেক পর বিরক্ত বোধ করল সবাই। নীরস, একঘেয়ে কাজ। দেখার কিছু নেই। দু'একটা মন্তব্য করছেন প্রত্যেকেই, কিন্তু আতিকুর রহমানের মুখে কথা নেই। তিনি এমন নিবিষ্ট, এমনই মগ্ন হয়ে কাজটা করছেন যে ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন সচেতন নন।

অন্যান্যরা নিজের নিজের কাজে ফিরে গেল।

মি. সিম্পসনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শহীদ হলরুমে।

'চলুন, মিসেস রুবিনার সাথে জরুরী আলোচনাটা সেরে নিই এই ফাঁকে।'

ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ সাব-ইন্সপেক্টরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাড়ির আশপাশে, বাগানে কোন পদচিহ্ন বা সূত্র কিছু পাওয়া যায় কিনা নতুন করে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।

সবাই চলে গেল কিন্তু আতিকুর রহমান যেন সচেতন নন সে ব্যাপারে। খানিকপর মাথা তুলে তাকালেন তিনি।

বিড় বিড় করে কিছু বললেন। ভাবলেন, কি বোকা লোক এরা সবাই! পঁয়ষট্টি লাখ টাকা দামের একটা স্ট্যাম্প রেখে সবাই চলে গেল। একজন স্ট্যাম্প কালেক্টরকে বসিয়ে রেখে! আমি চোর নই, কিন্তু একজন কালেক্টর তো! আমার কাছে কেপ ট্রায়াংগুলার স্বর্গের চেয়েও দামী। আসলে আমার কথা ওরা কেউ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। ছোট্ট এক টুকরো রঙিন কাগজের দাম পঁয়ষট্টি লাখ টাকা—এটা মেনে নিতে পারেনি ওরা কেউ। সেজন্যেই একা আমাকে রেখে চলে যেতে বাধেনি ওদের। কিন্তু···আমি তো আর দেবতা নই!

শেষ পর্যন্ত কানাডার স্ট্যাম্পগুলো পরীক্ষা করলেন তিনি। এরপরই কেপ অভ গুড হোপ। এদিকে রাত গভীর হয়েছে। আজ আর নয়। অ্যালবামটা বন্ধ করে গায়ে কোট চড়ালেন তিনি। কি মনে করে খুললেন আবার অ্যালবামটা। মহামূল্যবান কেপ ট্রায়াংগুলারটা দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে, অপলক চোখে। ঘাম ফুটতে শুরু করল তাঁর কপালে।

'তুমি কি আসল কেপ ট্রায়াঙগুলার? নাকি আমার কাছে যেটা আছে সেটার মতই নকল?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। হঠাৎ অপ্রতিভভাবে আপনমনে হাসলেন।

ওয়াটারমার্ক দেখেই কেবল বলা সম্ভব স্ট্যাম্পটা নকল কিনা। আঠারোশো চল্লিশ সনে ইস্যু করা হয় কেপ ট্রায়াংগুলার। ব্যাঙ্ক নোটের মত, স্ট্যাম্প যে কাগজে ছাপা হয়, সেই কাগজের শিটে ওয়াটারমার্ক থাকে। ছাপার পর স্ট্যাম্পগুলো আলাদা করা হলেও ওয়াটারমার্ক থাকে। তবে খালি চোখে, এমনকি গ্লাস দিয়েও ওয়াটারমার্ক দেখা যায় না, এমনই সূক্ষ্ম তা। কেপ ট্রায়াংগুলারের ওয়াটারমার্ক কি জানা আছে তাঁর।। বৃটিশ রয়াল ক্রাউন এবং ভিক্টোরিয়া রেজিনার ইনিশিয়াল VR হলো কেপ ট্রায়াংগুলারের ওয়াটারমার্ক।

যারা নকল করে তারা অফিশিয়াল পোস্টাল পেপার সংগ্রহ করতে পারে না বলে তাদের নকল স্ট্যাম্পে ওয়াটারমার্ক থাকে না।

আসল না নকল—জানার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন তিনি। ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টর আছে তাঁর কাছে, বাড়িতে। সেটা আনতে হবে আগামীকাল।

নাকি স্ট্যাম্পটা কাউকে না জানিয়ে পকেটে করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবেন···? না-না! তা উচিত হবে না! কি ভাববে ওরা সবাই তিনি যদি ধরা পড়ে যান?

তারচেয়ে কাল সন্ধ্যায় ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টরটা নিয়ে আসবেন তিনি।

আচ্ছা, সকলের অজ্ঞাতে কাজটা করার কি দরকার আছে? ওদেরকে জানিয়ে পরীক্ষা করলে ক্ষতি কি? না! না! সেক্ষেত্রে ওরা সবাই সচেতন হয়ে উঠবে। তা তিনি চান না।

মাথাটা ঘুরছে তাঁর। আচ্ছা, স্ট্যাম্পটা কি তিনি চুরি করতে চাইছেন? ছিঃ! ছিঃ! এসব কি ভাবছেন তিনি?

দ্রুত দরজার দিকে তাকালেন তিনি। পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

ভিতরে প্রবেশ করলেন মি. সিম্পসন।

'আজকের মত বিদায় নিচ্ছি, মি. সিম্পসন। দয়া করে অ্যালবামগুলো টেবিলের উপর ফেলে রাখবেন-না।'

'চিন্তা করবেন না। একজন পুলিশ কনস্টেবল চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকছে এই হলরুমে।'

আতিকুর রহমান অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'তবু, অ্যালবামগুলো স্টীল আলমারির ভিতর রেখে তালা লাগিয়ে দিন। মি. শহীদ খান কোথায়, চলে গেছেন নাকি?'

'না মিসেস রুবিনাকে জেরা করছে ও।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'আজ চলি। আগামীকাল সন্ধ্যায় আবার আসতে হবে আমাকে। যতটুকু পরীক্ষা করেছি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। আগামীকাল ফাইনাল রিপোর্ট দিতে পারব আপনাকে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ধন্যবাদ, মি. রহমান। আপনার সহযোগিতার মনোভাবের প্রশংসা করি আমি।'

'ইটস এ প্লেজার!'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন আতিকুর রহমান। মি. সিম্পসন পিছন পিছন আসছেন না টের পেয়ে তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

দেখলেন মি. সিম্পসন দ্রুত পাতা ওল্টাচ্ছেন একটা অ্যালবামের।

দুই

একই দিন সকালের ঘটনা।

বাড়ির সাথেই নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির অফিস মি. স্যানন ডি. কস্টার। বাড়িতে সে একাই থাকে। অফিসে বসে নিয়মিত দশটা পাঁচটা। ক্লায়েন্ট আসবে এই আশায় ওত্ পেতে থাকে সারাটা দিন। কিন্তু ভুলেও কেউ ঢোকে না তার অফিসে। ডিটেকটিভ হিসেবে মোটেই সুনাম অর্জন করতে পারেনি সে। পাগল মনে করে সবাই।

অথচ রাজকীয় হালে থাকে সে। গোটা অফিসটার মেঝে দামী কার্পেট দিয়ে মোড়া। আধুনিক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো প্রতিটি কামরা। ফোন, টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার—আরাম-আয়েশের সব উপকরণই রয়েছে তার বাড়িতে।

অবশ্য যাবতীয় কেনাকাটা এবং দৈনন্দিন খরচাদির টাকা পাঠায় কুয়াশা। পরিস্থিতি ইদানীং জটিল আকার ধারণ করেছে, পুলিশ কুয়াশার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে চব্বিশ ঘণ্টা। ডি. কস্টাকে তাই দূরে সরিয়ে রেখেছে কুয়াশা।

কুয়াশার শেখানো বুলি বেশ ভালই আওড়ায় ডি. কস্টা, পুলিশ এলে। 'হামার সহিট মি. কুয়াশার কোন রিলেশনশিপ নাই, টাহাকে হামি পরিট্যাগ করিয়াছি। বিকজ টাহার আডর্শের সহিট হামার আডর্শের ঘোর বিরোড ডেকা ডিয়াছে।'

পুলিশ সন্ধান নিয়ে দেখেছে, সত্যি, ডি. কস্টা সারাদিন অফিসে থাকে। সন্ধ্যার পর বাইরে বের হলেও বিভিন্ন নাইট ক্লাব এবং রেস্তোরাঁতেই সময় কাটায় সে। সেসব জায়গায় কুয়াশার ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় না।

আসলে কুয়াশার সাথে ডি. কস্টার যোগাযোগ আগের মতই আছে। তবে যোগাযোগের মাধ্যমটা কেউ জানে না এই যা। ওয়্যারলেসের মাধ্যমেই সাধারণত কথা বলে ডি. কস্টার সাথে কুয়াশা। দেখা-সাক্ষাৎও নিয়মিত হয়। ছদ্মবেশ নিয়ে থাকে কুয়াশা, তাই কেউ তাকে চিনতে পারে না।

একটা অত্যাধুনিক রোবট তৈরির কাজে কুয়াশা ইদানীং খুব ব্যস্ত। সময় নেই তার হাতে। প্রায় পনেরো দিন হতে চলল, ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চেষ্টা করেও ডি. কস্টা যোগাযোগ করতে পারেনি কুয়াশার সাথে। অবশ্য ইমার্জেন্সী সিগন্যাল দিয়ে চেষ্টা করলে যে কোন মুহূর্তে যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু সেটা করা উচিত হবে না। সাধারণ কোন ব্যাপারে ইমার্জেন্সী সিগন্যাল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

টাকা-পয়সার অভাব দেখা দিয়েছে ডি. কস্টার। ব্যাঙ্ক থেকে হাজার বিশেক টাকা তুলে আলু কিনেছে সে, রেখেছে কোল্ড স্টোরেজে। আলুর যখন অভাব দেখা দেবে তখন সেগুলো চড়া দামে বিক্রি করবে। কথাটা কুয়াশাকে জানায়নি সে, জানাবেও না। কুয়াশা জানলে খেপে যাবে ভীষণ। জিনিসপত্র কিনে মওজুদ করাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে সে। এই মওজুদদারীর জন্যেই জিনিস-পত্রের দাম বাড়ে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় জিনিসের মূল্য।

ভয়ে ভয়ে আছে ডি. কস্টা। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কুয়াশাকে বলবে না কথাটা।

এদিকে দৈনন্দিন খরচের টাকা শেষ হয়ে গেছে। মাত্র তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা আছে এই মুহূর্তে তার পকেটে। এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক সিগারেট কেনাও সম্ভব নয়।

অফিসে বসে সাত-পাঁচ ভাবছিল ডি. কস্টা। ক্লায়েন্ট নেই। বন্ধু-বান্ধবরা তাকে তেমন বিশ্বাস করে না, টাকা ধার চাইলেও দেবে না। ইচ্ছে করলে বেশ কিছু টাকা রোজগার করতে পারে সে। সিনেমা হলগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়। ছবি দেখে দলে দলে লোক বেরিয়ে আসবে যখন তখন সুযোগ মত কারও পকেট থেকে টাকাগুলো তুলে নিলেই হয়।

কিন্তু পকেটমারার কাজটা ছেড়ে দিয়েছে সে। প্রতিজ্ঞা করেছে সে বসের কাছে। এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে ভাবল সে, মি. শহীদ খানকে ফোন করে দেখলে হয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার চাইলে না বলতে পারবেন না। কিন্তু কথাটা বসের কানে যেতে পারে। বস জিজ্ঞেস করলে কি বলবে সে?

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা।

চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ডি. কস্টা।

'গড ইজ গুড!'

বিড়বিড় করে সৃষ্টিকর্তার গুণগান গাইল সে। রিসিভারটা কানে তুলে বলল,

'রয়েল ইনভেস্টিগেশনস্। স্যানন ডি. কস্টা স্পীকিং। হু ইজ দেয়ার?'

একটি সুমিষ্ট নারী কণ্ঠ ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে, 'মি. ডি. কস্টা, আমি আপনার সাথেই কথা বলতে চাই।'

'বলিয়া ফেলুন, কি করিটে পারি হামি হাপনার জন্য।'

নারীকণ্ঠ বলল, 'আপনার ফোন নাম্বার আমি পেয়েছি গাইডে। আমার একটা সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে আপনাকে। আপনার সাথে আলোচনা করার আগে আপনার ফি কত জানতে চাই।'

এতটুকু চিন্তা না করে ডি. কস্টা বলল, 'সাডারণট হামি ডশ হাজার টাকা নিয়ে ঠাকি। টবে, কেসটা কটো জটিল টাহার উপর ডিপেণ্ড করে ফির পরিমাণ।'

মেয়েটি বলল, 'ঠিক আছে। কখন আপনার সময় হবে?'

ডি. কস্টা বলল, 'হাপনি এখুনি আলোচনা করিটে পারেন। হামার অফিসে হামি হাপনার জন্য অপেক্ষা করিটেছি।'

'ঠিক আছে। আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি আপনার অফিসে।'

ডি. কস্টা বলে উঠল, 'ওয়েট এ মিনিট। আসিবেন, ভেরি গুড, বাট অ্যাডভ্যান্সের টাকা নিয়া আসিটে ভুলিবেন না।'

মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ঠিক পনেরো মিনিট পর সুন্দরী এক যুবতী এবং সুদর্শন এক যুবক ডি. কস্টার অফিসরুমে ঢুকল।

ডি. কস্টা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন, আসুন। আসন গ্রহণ করিয়া হামাকে কৃটার্থ করুন। কী লজ্জার কঠা ভাবুন একবার, হাপনাডের নাম ইট্যাডিও জানা হয় নাই ফোনে।'

যুবতী সহাস্যে বলল, 'ইনি আমার স্বামী, আবদুস শুকুর। আমি মিসেস শেফালী।'

বসল ওরা।

ডি. কস্টা বলল, 'বসুন, কি খাওয়াইব হাপনাডেরকে।'

'না-না। ঝামেলা বাড়াবেন না। আমাদের হাতে সময় খুব কম। কাজের কথাটা সেরে একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে আবার।'

'টা বেশ, টা বেশ। নিমন্ট্রণ খুব ভাল জিনিস, হামার কাছে আকাশের চাঁডের মটো।'

'আকাশের চাঁদের মত? কেন, আপনাকে নিমন্ত্রণ করার কেউ নেই বুঝি?' যুবক আবদুস শুকুর জানতে চাইল মৃদু হেসে।

'টা নয়, টা নয়। প্রট্যেক ডিনই টো ডজন খানেক নিমন্ট্রণ পাইটেছি—কিন্তু টাইম কোঠায়! হাপনাডের মটো ক্লায়েন্টডের সাহায্য করিটেই টো টুয়েনটি ফোর আওয়ারস্ বিজি ঠাকি।'

শেফালী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার স্বামীর দিকে।

আবদুস শুকুর বলল, 'শেফালী, আমাদের সমস্যার কথাটা এবার মি. স্যানন ডি. কস্টাকে বলে ফেলো। আমরা উপযুক্ত মানুষের কাছেই এসেছি। মি. স্যানন ডি. কস্টা যোগ্য গোয়েন্দা, তিনি আমাদের কেসের সমাধান করতে পারবেন।'

শেফালী বলল, 'তুমিই বলো না কেন।'

'কিন্তু আমি কি গুছিয়ে বলতে পারব? সমস্যাটা আসলে তোমার।'

ডি. কস্টা শেফালীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিসেস শেফালী, হাপনিই বলুন। হাপনার কণ্ঠস্বরটি হামার কানে মধু বর্ষণ করিটেছে—প্লীজ, ডোন্ট মাইণ্ড! হামি খোলামেলা মানুষ, স্পষ্ট করিয়া কঠা বলিয়া ঠাকি।'

লাল হয়ে উঠল শেফালীর দুই গাল।

শুরু করল সে, 'কেসটা কি বলতে হলে আমার পরিবারের সংক্ষিপ্ত একটা ইতিহাস বলতে হবে আগে, মি. স্যানন ডি. কস্টা। আমার বাবা-মা মারা যান আমি যখন মাত্র পাঁচ বছরের। আত্মীয়স্বজন বলতে আমার একমাত্র খালা-আম্মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি সেই থেকে খালা-আম্মার কাছেই মানুষ। খালা-আম্মা আমাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্যে তিনি বিয়ের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করেননি। আমি বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া শিখি। ম্যাট্রিক পাস করি বোর্ডিং-স্কুল থেকে। তারপর ঢাকায় খালার কাছে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি। রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছিল, তাই সোভিয়েট সরকারের একটা বৃত্তি পেয়ে এরপর চলে যাই মস্কোয়। যাবার আগে অনেক করে বুঝিয়ে শুনিয়ে খালা-আম্মাকে বিয়েতে রাজি করাই। খালা-আম্মা শেষ পর্যন্ত, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বিয়েটা আমি দেখেই যাই। মস্কোয় গিয়ে কিন্তু থাকতে পারিনি আমি, ফিরে আসি মাস তিনেক পরই। ওখানকার প্রচণ্ড শীত আমি সহ্য করতে পারিনি। যাই হোক, ঢাকায় ফিরে আমি একটা ব্যাঙ্কে চাকরি নিই, এবং আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই বাস করতে থাকি। খালা-আম্মা অবশ্য চেয়েছিলেন আমি তাদের সাথেই থাকি। কিন্তু আমি রাজি হইনি। রাজি না হবার অন্যতম কারণ, খালা-আম্মা যে ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন অর্থাৎ যিনি আমার খালু, রগচটা ধরনের মানুষ। স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি হত। ব্যাপারটা আমার খুবই খারাপ লাগত। তাই।'

ডি. কস্টা অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে আবদুস শুকুরের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল নিজের দিকে। একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে অগ্নি সংযোগ করল সে, গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিংয়ের দিকে, বলল, 'হাপনার খালুর নামটা বলুন ডয়া করে।'

'নামটা আমি বলতে চাই না। তিনি সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত কিছু দুর্বলতার কথা আপনাকে বলতে হচ্ছে আমাকে ঠিক, কিন্তু তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে চাই না আমি। ভদ্রলোক খুবই রাগী মানুষ, রেগে গেলে অশ্রাব্য গালাগালিও করেন। যাই হোক, একদিনের ঘটনা বলি। আমি সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। গিয়েছিলাম খালা-আম্মাকে দেখতে। গিয়ে দেখি ওঁরা ঝগড়া করছেন। খালু, তাঁর স্বভাব অনুযায়ী গালাগালি দিতে শুরু করলেন খালা-আম্মাকে। আমার

সামনে ব্যাপারটা ঘটল বলে খালা-আম্মার মনে খুবই দুঃখ হলো। অপমানে, ক্ষোভে তিনি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। 'আমি চলে যাচ্ছি'—মাত্র এই একটি কথা বলে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার কথাও তিনি মানেননি। খালু অবশ্য খানিক পরই শান্ত হন এবং গাড়ি নিয়ে খালা-আম্মাকে খুঁজতে বেরিয়ে যান। ফেরেন তিনি ঘণ্টা দুয়েক পর। একা। খালা-আম্মাকে সম্ভাব্য কোন জায়গাতেই তিনি খুঁজে পাননি। এরপর আমি, রাত গভীর হচ্ছে বলে, বাড়ি ফিরে আসি। পরদিন সকালে আবার খালা-আম্মাদের বাড়িতে যাই। আমার জন্যে দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। খালু আমাকে বললেন, খালা-আম্মা রাতে বাড়ি ফেরেননি।'

'টারপর?'

শেফালী বলল, 'ঘটনাটা ঘটেছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। খালা-আম্মার কোন সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি।'

'মাই গড।' ডি. কস্টা আঁতকে উঠল।

শেফালী কি যে বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে জানতে চাইল ডি. কস্টা, 'পুলিশবাহিনীকে খবর ডেয়া হয় নাই টখন?'

শেফালী বলল, 'না। খবর দেবার প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ খালা-আম্মা সঠিক অর্থে নিখোঁজ হয়ে যাননি। তাঁর ঠিকানা আমরা কেউ জানি না, চিঠিপত্রও পাই না—কিন্তু তিনি নিয়মিত টাকা পাঠান আমার কাছে।'

'টাকা পাঠান—হোয়াট ডু ইউ মিন?'

শেফালী বলল, 'তার আগে আপনাকে বলা দরকার যে আমার খালা-আম্মা অগাধ টাকা এবং প্রচুর সয়-সম্পত্তির মালিক। ব্যাঙ্কে তার নামে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ছিল, এ আমি জানি সেই ছোটবেলা থেকেই। টাকা এবং সয়সম্পত্তি খালা-আম্মা খালুর হাতে তুলে দেন, অর্থাৎ লিখিতভাবে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে স্বামীকে দান করেন। তবে দলিলে আমার জন্য বিশেষ একটা ব্যবস্থা ছিল। খালা-আম্মা মারা গেলে আড়াই লাখ টাকা এবং পঁচিশ বিঘা ধানী জমি আমার পাবার কথা। আর যত দিন তিনি জীবিত থাকবেন প্রতিমাসে আমাকে দেবেন পাঁচশো করে টাকা। পাঁচশো করে টাকা আমি প্রতিমাসেই পেয়েছি। খালা-আম্মা রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পরও—ডাকযোগে, নিয়মিত পাচ্ছি আমি টাকা।'

'কোঠা হইটে হাপনার খালা-আম্মা টাকা পাঠাইটেছেন?'

শেফালী বলল, 'চট্টগ্রামের একজন উকিলের মাধ্যমে টাকাটা পাচ্ছি আমি। খালা-আম্মার ঠিকানা চেয়ে ভদ্রলোকের কাছে আমি চিঠি লিখেছিলাম। ভদ্রলোক উত্তরে আমাকে লেখেন, খালা-আম্মার কঠোর নিষেধ আছে তাঁর ঠিকানা কাউকে জানানো চলবে না, তাই তিনি অপারগ।'

ডি. কস্টা জানতে চাইল, 'হাপনার খালা-আম্মা বাঁচিয়া আছেন বলিয়া মনে করেন?'

'তার মানে?' চমকে উঠল শেফালী।

আবদুস শুকুরও বলে উঠল, 'এ কি রকম প্রশ্ন হলো আপনার?'

শেফালী আবার বলল, 'খালা-আম্মা বেঁচে নেই মানে? বেঁচে না থাকলে টাকা পাঠাচ্ছে কে আমাকে প্রতিমাসে?'

ডি. কস্টা বলল, 'হাপনারা এখন কি চান? কি করিটে বলেন হামাকে?'

'টাকাটা আসছে চট্টগ্রামের এক উকিলের মাধ্যমে। আমরা জানতে চাই খালা-আম্মার হদিশ। তাঁর ঠিকানাটা যোগাড় করে দিন। কোথায় তিনি আছেন, কিভাবে আছেন খোঁজ নিয়ে জানান।'

'বিশ হাজার ডিটে হইবে,' নির্বিকারভাবে বলল ডি. কস্টা।

'আপনার ফি? বিশ হাজার টাকা?'

ডি. কস্টা আবদুস শুকুরের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল, 'ইয়েস। টোয়েনটি ঠাউজেণ্ড টাকা। এবং হাপনার খালুর নাম ঠিকানাও চাই।'

'কিন্তু আমরা চাই না খালুর পরিচয় প্রকাশ করতে।'

ডি. কস্টা বলল, 'ঠিক হ্যায়। হাপনার খালুর নাম-ঠিকানা হামি যোগাড় করিয়া নিব উকিল সাহেবের নিকট হইটে। টাকার কঠা বলুন।'

'কিছু কম করুন না···।'

'নো···।'

শেফালী বলল, 'পনেরো হাজারে রাজি হয়ে যান। কাজটা তো তেমন কোন কঠিন নয়।'

'কঠিন টো হবেই। কঠিন না হইলে কি কেউ মি. স্যানন ডি. কস্টার হেলপ নিটে ছুটিয়া আসে? টবে হাপনি মিষ্টি কণ্ঠস্বরের অটিকারী, পাঁচ হাজার কম ডিটে চাইটেছেন—ডিন। কিন্টু পাঁচ হাজার টাকা এখুনি অ্যাডভান্স ডিটে হইবে।'

'চেক বই আমরা সাথে করেই এনেছি। ওগো, পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক লিখে দাও মি. স্যানন ডি. কস্টাকে। ভালকথা, কতদিনের মধ্যে আমাদেরকে জানাতে পারবেন?'

'বেশি সময় লাগিবে না। চট্টগ্রামে যাইটে হইটে পারে হামাকে। বড় জোর ডশ ডিন লাগিবে। এর মট্যেই হাপনারা হাপনাডের খালা-আম্মার খোঁজ খবর জানিটে পারিবেন।'

'ধন্যবাদ।'

আরও খানিকক্ষণ আলোচনা করে ওরা বিদায় নিল। অফিসের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সদ্য প্রাপ্ত পাঁচ হাজার টাকার চেকটা হাতে নিয়ে নাচতে লাগল ডি. কস্টা। সেই সাথে মহা আনন্দে গাইতে শুরু করল—।

মানি ইজ এ ফানি থিং
আই অ্যাম এ লাকি কিং
ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং

তিন

বাড়ি ফিরে ছটফট করতে লাগলেন আতিকুর রহমান। কেপ ট্রায়াংগুলার! মাই গড!

কেপ ট্রায়াংগুলার! একজন কালেক্টরের শত জনমের আকাঙ্ক্ষা ওই কেপ ট্রায়াংগুলারের অধিকারী হওয়া। সাত রাজার ধনের চেয়ে বেশি মূল্য ওটার। ওটার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা, চোখের দেখা দেখতে পেলেও যে কোন কালেক্টর নিজেকে ধন্য মনে করবে!

পঁয়ষট্টি লাখ কম করেও, তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা দাম হতে পারে ওটার। কিন্তু টাকার অঙ্কটা এখানে বড় কথা নয়। টাকা তাঁর নিজের কম নেই। প্রচুর রোজগার করেছেন তিনি, এখনও করছেন, আরও করবেন। কিন্তু টাকা দিয়ে সবাই কেপ ট্রায়াংগুলার পায় না। কেপ ট্রায়াংগুলারের মূল্য টাকা দিয়ে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

স্ত্রীর সাথে রূঢ় ব্যবহার করলেন ডিনারে বসে। রীতিমত কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'নিজের চরকায় তেল দাও। আমি খাচ্ছি কি খাচ্ছি না সে ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

স্বামীর রগচটা স্বভাবের সাথে নববিবাহিতা স্ত্রীর পরিচয় আছে। কিন্তু এমন অকারণে ধমক খায়নি সে এর আগে। কিছু যে একটা ঘটেছে, বুঝতে পারল সে। কিন্তু স্বামীর মেজাজের বহর দেখে প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

নিচে নেমে এলেন আতিকুর রহমান। প্রায় কিছুই খেতে পারেননি। নিচে নেমেই মুখোমুখি হলেন করিডরে টোটার সাথে।

'এখনও ঘুরঘুর করছিস তুই? যা, শুয়ে পড়। তোকে আর দরকার হবে না আমার।'

'জী, হুজুর।'

'জী হুজুর না, যা বলছি কর।'

টোটা বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল।

ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন আতিকুর রহমান। পায়চারি করতে লাগলেন। চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে কেপ ট্রায়াংগুলারের ছবিটা। আসল তো? নাকি নকল? না-না! নকল হতে পারে না! নকল একটা কেপ ট্রায়াংগুলার তো তাঁর কাছেই আছে। তাঁর কাছে যেটা আছে সেটার সাথে কোথায় যেন অমিল আছে ইব্রাহিম সাহেবের কেপ ট্রায়াংগুলারের।

ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। কে খুন করেছে তাঁকে? কেন? ধুত্তরী ছাই! এসব কথা ভেবে কি লাভ? কে খুন হয়েছেন, কেন হয়েছেন—এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি? কেপ ট্রায়াংগুলার—একমাত্র কেপ ট্রায়াংগুলারের কথা ভাববেন তিনি! ওটা চান তিনি, ওটা তাঁকে পেতেই হবে···।

পায়চারি থামালেন আতিকুর রহমান। পেতে হবে, না? হ্যাঁ, অবশ্যই। জীবনে এ সুযোগ আর কখনও আসবে না। সৃষ্টিকর্তা তাঁকে একটা সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন, তিনি ভাগ্যবান। এ সুযোগ হারানো চলে না।

কিন্তু কিভাবে? কিভাবে কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে জিনিসটা পাওয়া যায়? কিভাবে? কিভাবে? কিভাবে?

চুরি করলে ধরা পড়তেই হবে। নিজের মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে

করল তার। নিজের সর্বনাশ তিনি নিজেই করে ফেলেছেন। কেন বললেন ওদেরকে কেপ ট্রায়াংগুলারের কথাটা? কেন! কেন!

ওরা কেউ জানত না। জিনিসটা যে মহামূল্যবান তা তিনিই ওদেরকে জানিয়েছেন। না জানালে কোন সমস্যাই দেখা দিত না। চুপিসারে পকেটে ভরে নিয়ে চলে এলেই হত।

কিন্তু সে উপায় এখন আর নেই। সবাই জানে ওটা কেপ ট্রায়াংগুলার। সবাই জানে, তিনিই বলেছেন, ওটার দাম পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা।

অস্থির পায়চারি শুরু হলো আবার।

রাত বাড়ছে। ঘুম নেই চোখে। অ্যাশট্রেতে আর সিগারেটের অবশিষ্টাংশ রাখার জায়গা নেই, ভরে গেছে সেটা। সারারাত কেটে গেল, পায়চারি করছেন তো করছেনই। ভোরবেলা স্থির হলেন তিনি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। চুরিই করবেন তিনি কেপ ট্রায়াংগুলারটা। তবে কৌশলে। তাঁর কাছে যে নকল স্ট্যাম্পটা আছে সেটা আজ সন্ধ্যায় ইব্রাহিম খলিলের বাড়িতে নিয়ে যাবেন। ইব্রাহিম খলিলের অ্যালবাম থেকে আসল কেপ ট্রায়াংগুলারটা চুরি করে পকেটে রাখবেন, তাঁর নকলটা রেখে আসবেন অ্যালবামে। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। কেউ পার্থক্যটা টের পাবে না। দুটো প্রায় হুবহু একই রকম দেখতে। তিনি একা শুধু জানবেন, আর কারও চোখে ধরা পড়বে না।

হালকা হয়ে গেল মনটা। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

বেলা বারোটায় ঘুম থেকে জাগলেন আতিকুর রহমান। স্নানাহার সেরে বাইরে বেরুলেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কর্তব্য সারলেন ঘুরে ঘুরে বিকেল চারটে পর্যন্ত। এক হোটেলে দেখা করলেন একজন কাহিনীকারের সাথে। তার কাহিনী শুনলেন। পছন্দ হলো কাহিনীর সিনপসিস। চিত্রনাট্য রচনা করার নির্দেশ দিলেন তিনি। কথা দিলেন, আগামী ছবির কাহিনী হিসেবে এটাকেই গ্রহণ করবেন।

বাড়ি ফিরলেন তিনি বিকেল পাঁচটায়। ড্রয়িংরুমে বসে তিনি জর্জরিত হতে লাগলেন বিবেকের কষাঘাতে। কাজটা কি উচিত হবে? দুপুর থেকে প্রতিটি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই প্রশ্নটা নিজেকে করেছেন তিনি। কাজটা কি উচিত হবে? কেপ ট্রায়াংগুলার চুরি করা কি উচিত হবে?

উচিত হবে না কেন? কেপ ট্রায়াংগুলারটা যার ছিল তিনি বেঁচে নেই। একজন মৃত মানুষের জিনিস চুরি করাটা তেমন অন্যায় কিছু নয়। কি! অন্যায় নয়? নিশ্চয়ই অন্যায়? ঠিক আছে, ঠিক আছে! মানছি অন্যায়। কিন্তু এ অন্যায় না করে উপায় নেই তাঁর। তিনি একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর। কেপ ট্রায়াংগুলার একজন স্ট্যাম্প কালেক্টরের কাছে নিজের জীবনের চেয়েও দামী। জিনিসটা কোথায় আছে তিনি জানেন, জানেন কত সহজে ওটা চুরি করা যায়, জানেন চুরি করলেও ধরা পড়বার এতটুকু আশঙ্কা নেই—এরকম পরিস্থিতিতে চুরি না করে পারা যায়? এরকম পরিস্থিতিতে সাধু হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব?

না।

চুরি তিনি করবেনই। স্ট্যাম্প আরও আছে দামী দামী···না থাক। অত সাহস নেই, একটাই যথেষ্ট। এখন একটাই প্রশ্ন—জিনিসটা আসল কেপ ট্রায়াংগুলার তো? এটাই চিন্তার বিষয়।

সময় হয়ে গেল। ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টরটা নিয়ে বেরুলেন তিনি। গাড়ি চালিয়ে পৌঁছুলেন ইব্রাহিম সাহেবের বাড়িতে। প্রহরী কনস্টেবলটি গেটেই ছিল। বলল, 'আপনার কথা এইমাত্র জিজ্ঞেস করছিলেন মি. সিম্পসন, স্যার।'

'তাই নাকি! কখন এসেছেন তিনি?'

'এই তো, মিনিট দশেক আগে, স্যার।'

শহীদের কথা জানতে চাইলেন তিনি।

কনস্টেবল বলল, 'না, তিনি আসেননি। সকালে অবশ্য এসেছিলেন একবার।'

হলরুমেই দেখা হলো মি. সিম্পসনের সাথে। বসে আছেন তিনি সোফায়, অপরূপ সুন্দরী এক যুবতীর মুখোমুখি। যুবতীর চোখ দুটো ভেজা ভেজা, ঘন ঘন রুমাল দিয়ে চোখের কোণা মুছছে। মি. সিম্পসন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। বললেন, 'আসুন, মি. রহমান। মিসেস রুবিনা, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। মি. আতিকুর রহমানের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম আপনাকে। নিশ্চয়ই ওঁর নাম শুনেছেন?'

মিসেস রুবিনা কপালের কাছে হাত তুলে বলল, 'আদাব।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'বসুন, মি. রহমান।'

রুবিনা বলল, 'আপনার সব ছবিই দেখেছি আমি, মি. রহমান। কিন্তু বাবার মুখে কোন দিন আপনার নাম কিন্তু শুনিনি। বাবা ঢাকার প্রায় সব স্ট্যাম্প কালেক্টরকে চিনতেন···।'

আতিকুর রহমান বসলেন মি. সিম্পসনের পাশে। বললেন, 'তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না, মা। আমার মেয়ে থাকলে তোমার বয়সীই হত। তোমার বাবা জানতেন না আমি একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর। তার কারণ কি জানো? দোষটা তোমার বাবার ছিল না। আমিই দোষী। আমি যে একজন কালেক্টর তা ইচ্ছে করেই গোপন রাখার চেষ্টা করেছি সবসময়। তুমি আমাকে কাকা বলবে, কেমন?'

রুবিনা বলল, 'বাবা আর সকলের খোঁজ খবর রাখতেন বটে কিন্তু নিজেও যে একজন কালেক্টর তা সহজে কাউকে জানাতেন না।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'মি. সিম্পসন, আপনাদের কাজ কতটুকু এগোল?'

'আমি এখনই কোন মন্তব্য করছি না। তবে, এটা ঠিক, হত্যাকারী রেহাই পাবে না। তাকে ধরাটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আপনার রিপোর্টের উপরও অনেক কিছু নির্ভর করছে, মি. রহমান। হত্যার মোটিভটা কি এখনও আমরা জানতে পারছি না।'

রুবিনা বলল, 'স্ট্যাম্প চুরি হয়েছে বলে মনে করি না আমি। স্ট্যাম্প চুরি করার জন্যেই যদি কেউ হত্যা করে থাকে বাবাকে, কেপ ট্রায়াংগুলারটা কেন সে

চুরি করল না?'

বুকের ভিতর রক্ত ছলকে উঠল আতিকুর রহমানের।

রুবিনা জানতে চাইল, 'কাকা, সত্যিই কি কেপ ট্রায়াংগুলারটার দাম পঁয়ষট্টি লাখ টাকা?'

'যদি ওটা নকল না হয়।'

'নকল কি না বোঝার উপায় কি?'

'এই যাহ্! ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টরটা সাথে করে নিয়ে আসতে ভুলে গেছি।'

রুবিনা বলল, 'ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করলে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে ওটা আসল কিনা?'

'তা জানা যাবে।'

রুবিনা চোখ মুছল, নিচু স্বরে বলল, 'হত্যাকারী কেন ওটা চুরি করেনি? স্ট্যাম্পটা অতি বিখ্যাত, বিক্রি করতে গেলে ধরা পড়ে যেতে হবে বলে? উঁহুঁ, এ আমার বিশ্বাস হয় না। যে চুরি করবে সে অত কথা ভাবে না। বিশেষ করে চুরি করার জন্যে যে খুন করতেও পিছপা হয়নি—কেপ ট্রায়াংগুলার কেন, গোটা দুনিয়াটা বিক্রি করার মত দুঃসাহস তার থাকার কথা। আমার ধারণা, স্ট্যাম্প চুরিটা বাবাকে খুন করার একটা মোটিভ হতে পারে না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, খুনী কেপ ট্রায়াংগুলারের কথা জানত না। কেপ ট্রায়াংগুলার সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। এমনও তো হতে পারে কেউ খুনীকে ভাড়া করেছিল নির্দিষ্ট কয়েকটা স্ট্যাম্প চুরি করার জন্যে,—সে হয়তো এমন একজন লোক যে জানত না কেপ ট্রায়াংগুলার আপনার বাবার কাছে আছে।'

রুবিনা বলল, 'হতে পারে। কিন্তু ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে কেউ বাবাকে খুন করিয়েছে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হয়তো কোন কালেক্টর আপনার বাবার কিছু স্ট্যাম্প দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। চাইলে পাওয়া যাবে না, কিনতে চাইলে কেনা যাবে না, তাই সে হয়তো ভাড়াটে খুনীকে নিয়োগ করে।'

আতিকুর রহমান রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি বরং আমার কাজ শুরু করে দিই, কি বলেন মি. সিম্পসন?'

'অবশ্যই। সোজা গিয়ে ঢুকুন পাশের রুমে—কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে।'

আতিকুর রহমান উঠতে উঠতে বললেন, 'তোমার সাথে পরে আলাপ করব, রুবিনা। তোমার বাবার অ্যালবামগুলো চেক করে মি. সিম্পসনকে রিপোর্টটা দিই আগে।'

রুবিনা বলল, 'বাবার হত্যাকারীকে ধরার জন্যে আপনি যে সহযোগিতা করছেন—চিরকাল আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনার প্রতি, কাকা।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'এটা তো মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, মা।'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছল রুবিনা। আতিকুর রহমান আর দাঁড়ালেন না। পাশের

রুমে গিয়ে ঢুকলেন।

পিছন পিছন এলেন মি. সিম্পসন। 'চাবিটা নিন। স্টীল আলমারির ভিতর আছে অ্যালবামগুলো।'

চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন আতিকুর রহমান। টেবিলের উপর নামালেন অ্যালবামগুলো।

মি. সিম্পসন বিনাবাক্যব্যয়ে রুম ত্যাগ করলেন, যাবার সময় দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

চেয়ার এগিয়ে নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে বসলেন আতিকুর রহমান। গতকাল যেখানে শেষ করেছিলেন, তারপর থেকে শুরু করলেন চেকিং। কয়েক মিনিটের মধ্যে কেপ অভ গুড হোপ-এর সবগুলো স্ট্যাম্প দেখা শেষ করলেন। শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন দরজার দিকে।

দরজাটা আগের মতই ভেড়ানো রয়েছে। ওয়াটারমার্ক ডিটেক্টরটা বের করলেন তিনি কোটের পকেট থেকে। এই সুযোগ! সুযোগটা হারানো উচিত হবে না। কখন কে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। আপাতত কেউ ঢুকবে বলে মনে হয় না।

ডিটেক্টরটা বের করার সময় হাতটা কাঁপছে, লক্ষ করলেন তিনি। জিনিসটা গভীর তলদেশ বিশিষ্ট ছোট একটা ট্রের মত। চার বাই ছয় ইঞ্চি। বের করেও সাথে সাথে কাজ শুরু করলেন না। দুই উরুর মাঝখানে লুকিয়ে রাখলেন যন্ত্রটা। ঠিক তখুনি দরজাটা মৃদু শব্দে খুলে গেল।

লাফ দিয়ে উঠল বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা।

'স্যার, বেগম সাহেবা জানতে চাইলেন চা, না কফি খাবেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে মধ্য বয়স্ক চাকরটার দিকে চেয়ে রইলেন আতিকুর রহমান। বেশ কয়েক সেকেণ্ড পর কথা বলার শক্তি ফিরে পেলেন তিনি।

'কিছু না, এক গ্লাস পানি নিয়ে এস শুধু।'

'আনছি, স্যার।'

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা।

মাথা নিচু করে অ্যালবামটা দেখতে লাগলেন তিনি। কাজ করছেন না, ভান করছেন কাজের। খানিকপর আবার উন্মুক্ত হলো দরজার কবাট দুটো। এক গ্লাস পানি রাখল লোকটা টেবিলের উপর। ফিরে গেল। দরজাটা ভিড়িয়ে দিতে ভুল করল না এবারও।

গ্লাসে দুটো আঙুল ডুবিয়ে দিলেন আতিকুর রহমান। অপর হাত দিয়ে ডিটেক্টরটাকে টেবিলের উপর তুললেন। যন্ত্রটার নিচের দিকটা ভিজিয়ে নিলেন পানি দিয়ে।

চিমটা দিয়ে গাম লাগানো কাগজ থেকে অতি সাবধানে তুলে নিলেন অ্যালবামের কেপ ট্রায়াংগুলার। যন্ত্রটার ভেজা তলদেশে সাঁটলেন আলতোভাবে সেটা।

হাত দুটো কাঁপছে। ঘন ঘন তাকাচ্ছেন দরজার দিকে। কী-হোল দিয়ে মি. সিম্পসন তাঁকে লক্ষ করছেন না তো?

অপেক্ষার পালা। ধীরে ধীরে দাগ ফুটছে। কালো, প্রায় দৃষ্টি চলে না কাঁচের ভিতর। এক সময় প্রায় পরিষ্কার হয়ে উঠল দাগগুলো। ব্রিটিশ রয়াল ক্রাউন, সাথে ইনিশিয়াল V. R—পরিষ্কার, অতি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল।

হাঁপাচ্ছেন আতিকুর রহমান। কেন যেন বিকট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো তাঁর। ঘেমে যাচ্ছেন হু হু করে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। তাঁর এই অবস্থা কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। আসল কেপ ট্রায়াংগুলার! এটা আসল কেপ ট্রায়াংগুলার! সারা দুনিয়ায় মাত্র তিনটে আছে, এটি সেই তিনটের মধ্যে একটি।

কেপ ট্রায়াংগুলারের অর্থনৈতিক মূল্যটাকে বড় করে দেখছিলেন না তিনি। একজন কালেক্টরের দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্যাম্পটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি। সব কিছুর বিনিময়ে, বিবেকের দংশন অগ্রাহ্য করে, বিপদে পড়ার ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি সর্বান্তকরণে চাইছেন স্ট্যাম্পটাকে চুরি করে নিজের অধিকারে রাখতে। জীবনে এটা কাউকে তিনি দেখাবেন না। কাউকে এর অস্তিত্বের কথা জানতে দেবেন না। এটাকে নিয়ে গর্ববোধ করবেন তিনি আপনমনে, লুকিয়ে লুকিয়ে একা একাই দেখবেন এবং আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে থাকবে তাঁর বুক।

এরপর দ্রুত বাকি কাজগুলো সেরে ফেললেন আতিকুর রহমান। পকেট থেকে বের করলেন নিজের নকল কেপ ট্রায়াংগুলারটা। অ্যালবামে সেটা যথাযথ পদ্ধতিতে সাঁটলেন। আসলটা ভরে রাখলেন অতি যত্নের সাথে কোটের বুক পকেটে।

খানিকপর যখন শহীদ রুমের দরজায় টোকা দিল, আতিকুর রহমান তখন অ্যালবাম চেকিংয়ের কাজে মগ্ন হয়ে পড়েছেন নতুন করে। শহীদকে দেখে হাসলেন তিনি। বললেন, 'কেমন আছেন, মি. শহীদ?'

শহীদ বলল, 'ভাল। আপনার কাজ কতদূর এগোল?'

'আজ রাতের মধ্যেই রিপোর্ট দিতে পারব। কিন্তু, মি. শহীদ, রুবিনা বলছিল তার ধারণা স্ট্যাম্প চুরিটা তার বাবাকে হত্যা করার মোটিভ হতে পারে না।'

শহীদ বলল, 'ধারণাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। তবু, আপনার রিপোর্টটা না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বোঝা যাবে না।'

আতিকুর রহমান জানতে চাইলেন, 'কেসটার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনি নিয়েছেন। নতুন কিছু জানতে পেরেছেন ইতিমধ্যে?'

শহীদ একটু চিন্তিতভাবে বলল, 'অদ্ভুত একটা তথ্য পেয়েছি। যদিও তথ্যের স্বপক্ষে এখনও কোন প্রমাণ পাইনি।'

'সে কি রকম?'

শহীদ বলল, 'ইব্রাহিম সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন, বছর পঁচিশেক আগে। একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। তখন তাঁর প্রথম স্ত্রী জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় বিয়েটা করেছিলেন ইব্রাহিম সাহেব গোপনে। তার প্রথম স্ত্রী, অর্থাৎ মিসেস রুবিনার আম্মা, ব্যাপারটা জানতে পেরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। ইব্রাহিম সাহেব সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রথম স্ত্রীকে কথা দেন, তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং পুত্রের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তিনি

নাকি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে তিনি ডাইভোর্স করেন। তারপর থেকে তার এবং সেই পুত্র-সন্তানের কোন খোঁজ খবর তিনি রাখেননি। কোথায় তারা আছে, কিভাবে আছে, নাকি মরে গেছে—কিছুই তিনি জানতেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ইব্রাহিম সাহেবের আত্মীয়-স্বজন, এমনকি তার একমাত্র মেয়ে মিসেস রুবিনাও তার এই দ্বিতীয় বিয়ের কথা আজ পর্যন্ত জানে না।'

'ইন্টারেস্টিং অফকোর্স! সেই পুত্র সন্তান বেঁচে থাকলে তার বয়স এখন বাইশ-তেইশ তো হবেই, কি বলেন?'

চিন্তিতভাবে শহীদ বলল, 'তা হবে। কিন্তু কোথায় সে? কোথায় তার আম্মা? কেউ বলতে পারছে না···আপনি কাজ করুন, মি. রহমান। আমি মিসেস রুবিনার সাথে কথা বলে আসি।'

চলে গেল শহীদ। আতিকুর রহমান মগ্ন হয়ে পড়লেন নিজের কাজে।

প্রত্যেক কালেক্টরের অ্যালবামের শেষ দেশ হচ্ছে জাঞ্জিবার। রাত সাড়ে এগারোটার সময় জাঞ্জিবারের সর্বশেষ স্ট্যাম্পটি পরীক্ষা করে দায়িত্ব সারলেন আতিকুর রহমান।

মি. সিম্পসন এবং শহীদ অপেক্ষা করছিল হলরুমে। টেবিল ছেড়ে উঠে হলরুমে ঢুকলেন আতিকুর রহমান।

'খুব খেটেছেন। আপনার সাহায্য চেয়ে বিপদেই ফেলেছি দেখছি,' বললেন মি. সিম্পসন।

হাসলেন আতিকুর রহমান। মুখ ভরা তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'ও কথা বলবেন না। আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। আনন্দের কারণ কি জানেন? ইব্রাহিম সাহেবের কালেকশনে কারও হাত পড়েনি। কালেক্টর হিসেবে এটা একটা আনন্দের ব্যাপার আমার কাছে।'

জানতে চাইল শহীদ, 'আপনি বলতে চাইছেন অ্যালবামগুলো থেকে কোন স্ট্যাম্প চুরি যায়নি?'

'হ্যাঁ। একটা স্ট্যাম্পও চুরি যায়নি। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হুঁ। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, খুনী হয়তো স্ট্যাম্প চুরি করতেই এসেছিল কিন্তু ইব্রাহিম সাহেবের চোখে ধরা পড়ে যায় সে—ফলে খুন করতে বাধ্য হয় তাঁকে এবং খুন করে ফেলে ভয় পেয়ে যায়, চুরি না করেই কেটে পড়ে···।'

শহীদ একটু বিরক্তির সাথেই বলল, 'এসব ব্যাপার নিয়ে মি. রহমানকে বিব্রত করার কোন মানে হয় না, মি. সিম্পসন।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'আমার রিপোর্টে কোন ভুল নেই। আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হয়।'

'অবশ্যই। আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ভালকথা, মি. রহমান, দরকার হলে আবার কিন্তু যোগাযোগ করব আপনার সাথে আমরা। আশা করি···।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'অবশ্যই। আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমি সব সময় তৈরি আছি। আচ্ছা, চলি, মি. সিম্পসন। মি. শহীদ, বিদায়।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আবার দেখা হবে।'

পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেলেন আতিকুর রহমান। কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে বিনাবাক্যব্যয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। বুকটা কেমন যেন দুরু দুরু করছে। মি. সিম্পসনের শেষ কথাটা যেন কেমন! তিনি কি কিছু সন্দেহ করেছেন?

চিন্তিতভাবে গাড়িতে এসে উঠলেন আতিকুর রহমান। ব্যাপারটা কি? মি. সিম্পসন তাঁর সম্পর্কে কি ভাবছেন? ইব্রাহিম খলিলের হত্যাকাণ্ডের সাথে তিনি জড়িত, এই রকম অমূলক সন্দেহে ভুগছেন নাকি আবার ভদ্রলোক?

হাসি পেল আতিকুর রহমানের। না, না, তেমন কিছু ভাববেন কেন? হাসিটা উবে গেল হঠাৎ। কেপ ট্রায়াংগুলার চুরি করেছেন তিনি—মি. সিম্পসন কী-হোলে চোখ রেখে ব্যাপারটা দেখে ফেলেননি তো?

না। তা সম্ভব নয়। অতটা ঘটতে পারে না। দেখে থাকলে মি. সিম্পসনের মত জাঁদরেল পুলিশ অফিসার তাঁকে কেপ ট্রায়াংগুলার নিয়ে বাইরে বেরুবার সুযোগ দিতেন না।

বাড়ি ফিরলেন আতিকুর রহমান। গেটটা খোলাই দেখলেন। গ্যারেজে গাড়ি রেখে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন তিনি দরজা খুলে। আশপাশে কোথাও দেখলেন না টোটাকে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের ঘরে। ভালই হয়েছে, ভাবলেন তিনি।

তালা খুললেন পাশের রুমের। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। গোছা থেকে চাবি বের করে কমবিনেশন মিলিয়ে ওয়াল-সেফের তালা খুললেন।

পকেট থেকে বের করলেন পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার কেপ ট্রায়াংগুলার। মুগ্ধ, সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি স্ট্যাম্পটার দিকে। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। শুকিয়ে যাচ্ছে গলা। চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে। কেপ ট্রায়াংগুলার! আসল কেপ ট্রায়াংগুলার! এ মহার্ঘ্য বস্তু এখন তাঁর নিজের। এর একমাত্র মালিক তিনি। তিনি কত বড় ভাগ্যবান! বিশ্বের সব কালেক্টরের হিংসার পাত্র তিনি। কী আনন্দ! সাত রাজার ধন তাঁর হাতে এসেছে। কেউ জানে না, কেউ কোন দিন জানবে না—কিন্তু তিনি জানেন, একা তিনি কেবল জানেন!

আনন্দে, গর্বে ছটফট করছে দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু। এত আনন্দ ধরে রাখার যেন জায়গা নেই তাঁর শরীরে। চোখ ভরে উঠল পানিতে। আনন্দাশ্রু। চরমানন্দে কাঁদছেন তিনি।

জীবনে তিনি কখনও চুরি করেননি। সে মানসিকতা তাঁর কোনকালেই ছিল না। আজ চুরি করেছেন—চুরি করেছেন বটে কিন্তু তার জন্যে মনে কোন অপরাধ বোধ নেই, তিনি লজ্জিত নন।

রুমাল বের করে চোখ মুছলেন তিনি। পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিলেন কেপ ট্রায়াংগুলারের পিছনটা, তারপর অ্যালবামের উপর সাঁটা, ভাঁজ করা গাম লাগানো কাগজে বসালেন নিখুঁতভাবে কেপ ট্রায়াংগুলারকে, চাপ দিলেন হাত দিয়ে।

ও কিসের শব্দ? ঝট করে দরজার দিকে তাকালেন তিনি। ড্রয়িংরুমে আলো জ্বালিয়ে রেখে এসেছেন তিনি···কিন্তু ওকি! কী-হোল দিয়ে ড্রয়িংরুমের আলো দেখতে পাবার কথা। দেখা যাচ্ছে না কেন?

পরমুহূর্তে কী-হোল দিয়ে দেখা গেল আলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন আতিকুর রহমান। কী-হোলে এতক্ষণ চোখ রেখে কেউ নজর রাখছিল তাঁর উপর। সব দেখেছে সে···।

কে! কে দেখছিল?

তাঁকে অনুসরণ করে মি. সিম্পসন এসেছেন নাকি? ছাঁৎ করে উঠল বুকটা মি. সিম্পসনের কথা মনে পড়তেই। অ্যালবামটা বন্ধ করলেন তিনি কাঁপা হাতে। ওয়াল-সেফে তুলে রাখলেন সেটা। এগোলেন তারপর দরজার দিকে।

হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তাঁর। একটা অপরাধ করেছেন তিনি। ধরা পড়ে গেছেন। বেশ সুচারুভাবেই সেরেছিলেন কাজটা। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। একটা ভুল তিনি শেষ পর্যন্ত করে ফেলেছেন। দেখে ফেলেছেন মি. সিম্পসন কী-হোল দিয়ে, কেপ ট্রায়াংগুলারটা রেখেছেন তিনি অ্যালবামে।

ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছেন মি. সিম্পসন তাঁর জন্যে।

তালা খুলতে হাত ওঠে না। দরজা খুললেই তো দেখবেন উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন মি. সিম্পসন।

দরজা না খুললে কেমন হয়?

লাভ নেই, জানেন তিনি। মি. সিম্পসন বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবেন না। করাঘাত করবেন তিনি, শেষ পর্যন্ত না খুললে দরজা ভাঙবেন।

তালা খুললেন আতিকুর রহমান। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা ঘাম পড়ল জুতোর উপর। দরজার কবাট দুটো উন্মুক্ত করলেন তিনি ধীরে ধীরে।

ফাঁকা ড্রয়িংরুম। মি. সিম্পসন নেই। একটা বিড়ালের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে করিডরের দিকে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উঁকি মেরে তাকাতেই দেখলেন টোটাকে।

'তুই? তুই এত রাতে জেগে আছিস? তুই···তুই-ই তাহলে!'

কী-হোলে চোখ রেখে কে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল বুঝতে পেরে মাথায় আগুন ধরে গেল আতিকুর রহমানের। খ্যাপা মোষের মত তেড়ে গেলেন তিনি। ঠাস্ করে একটা চড় মারলেন টোটার গালে।

টোটা তাল সামলাবার আগে বাঁ হাত দিয়ে আবার একটা চড় কষালেন তিনি। পড়ে গেল টোটা করিডরের মেঝেতে। মৃদু শব্দ করে কেঁদে ফেলল সে।

দাঁতে দাঁত চেপে গালাগালি দিতে লাগলেন আতিকুর রহমান, 'কুত্তার বাচ্চা! বেজন্মা শয়তান! দুধ খাইয়ে কালসাপ পুষছি! বেরিয়ে যা, শালা, বেরো বলছি···।'

সবেগে লাথি মারলেন তিনি টোটার পেটে। গুঙিয়ে উঠল টোটা। ফিরেও তাকালেন না আতিকুর রহমান। ঝড়ের বেগে ড্রয়িংরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ করলেন দরজা। সেই একই গতিতে করিডর ধরে এগোলেন।

টোটার মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রাগে কাঁপছেন। খোঁচা মারলেন

জুতো পরা পা দিয়ে টোটার মুখে।

'কাল সকালে তোকে যদি এ-বাড়িতে দেখি জ্যান্ত কবর দেব! জ্যান্ত পুঁতে ফেলব—মনে রাখিস!'

হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ির দিকে এগোলেন তিনি। রাগের মাত্রাটা এতই বেশি হয়েছে যে সত্যি সত্যি টোটাকে জ্যান্ত করব দেয়া যায় কিনা ভাবতেও ইতস্তত বোধ করলেন না আতিকুর রহমান।

চার

কিন্তু পরদিন সকাল থেকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন আতিকুর রহমান। তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক আন্তরিকতার সাথে গল্প করলেন। কথায় কথায়, ভাবাবেগের বশে, তিনি তার সাথে খারাপ, কর্কশ ব্যবহার করেছেন বলে হাত ধরে ক্ষমাও চাইলেন। বললেন, 'আজ থেকে আমি সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছি। জীবনে অনেক পেয়েছি, আর কোন দাবি নেই আমার। সৎ, সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকব, মানুষকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করব। তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি সব পারি।'

সারাটা দিন চরকির মত ঘুরে বেড়ালেন আতিকুর রহমান। তাঁর একাধিক ব্যবসা। প্রতিটি অফিসেই তিনি গেলেন। অন্যান্য দিন তাঁকে দেখে কর্মচারীরা ভয়ে ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আজ কিন্তু অন্য রকম ঘটল। আতিকুর রহমান সহাস্যে সকলের সাথে যেচে পড়ে কথা বললেন। প্রায় প্রত্যেকের কুশলাদি, বাড়ির খবরাখবর, সুবিধে-অসুবিধের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই যেমন আশ্চর্য হলো তেমনি খুশিও হলো।

বিকেলে বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা করতে বেরুলেন তিনি। নিমন্ত্রণ করলেন পরদিন বাড়িতে সবাইকে, ডিনার খাওয়াবেন।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন মিসেসের জন্যে একসেট জড়োয়া গহনা কিনে। গ্যারেজে গাড়ি রেখে বেরুতেই দেখলেন টোটাকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। করিডরের সিঁড়ির শেষ ধাপে। গম্ভীর হলেন একটু আতিকুর রহমান। কিন্তু ধমকও মারলেন না, রাগও দেখালেন না। নিঃশব্দে উঠে গেলেন করিডরে ধাপ তিনটে টপকে।

পরদিন ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে ডজন দুয়েক বন্ধু-বান্ধব এলেন। হোটেল থেকে বয়-বেয়ারা এবং চাইনিজ ডিশ আমদানী করা হয়েছে। খোশ-গল্পে মেতে উঠলেন তিনি। ডিনারের পরও বৈঠক চলল। রাত বারোটার পর ছুটি দিলেন।

ফেরার পথে সবাই একবাক্যে মন্তব্য করল, আতিকুর রহমান হঠাৎ বদলে গেছেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। খুব একটা মিশুক ছিলেন না তিনি কোন কালেই। তাছাড়া, কাজ ছাড়া কারও সাথে গল্প করে ফালতু সময় নষ্ট করেননি কখনও। এর আগে কাউকেই তিনি বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেননি।

বন্ধু-বান্ধবরা খুশিই হলো।

তার পরদিন বিকেল। ছাদে স্ত্রী তাহমিনাকে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন আতিকুর রহমান। হাসি-ঠাট্টা করছিলেন খুব। দু'জন পায়চারি করছিলেন ছাদের এদিক থেকে সেদিক পর্যন্ত।

রেলিংয়ের ধারে দাঁড়ালে বাড়ির পিছনের দিকটা সবটুকু দেখা যায়, দেখা যায় বহুদূর অবধি। নিচে বাগান। বাগানের মাঝখানে তাঁদের সুইমিং পুল। একপাশে চাকর-বাকরদের টালির ছাত দেয়া ছোট ছোট সাত আটটা কুঁড়ে ঘর। তার পাশেই গোয়াল ঘর। গরু আর ছাগল আছে সব মিলিয়ে গোটা সাতেক। চাকর-বাকররাই দেখা শোনা করে। দুধ বিক্রি করে কি পায় না পায় তা-ও তিনি খুঁটিয়ে জানতে চাননি কখনও। যা দেয় তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

বাড়ির সীমানার বাইরে বড় বড় ঘাসের রাজ্য। ঝোপ-ঝাড়ও বিস্তর। বৃষ্টির মৌসুম নয় এটা, তাই সব শুকিয়ে গেছে। বাড়িটার সীমানা চিহ্নিত করা আছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। ঝোপ-ঝাড় আর মানুষ সমান উঁচু শুকনো ঘাসে তা ঢাকা পড়ে গেছে, দেখাই যায় না। বাড়ির পিছন দিকে আর কোন বাড়ি ঘর নেই বহুদূর অবধি।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আঁতকে উঠলেন আতিকুর রহমান।

'তাহমিনা! সর্বনাশ হয়েছে!'

'কি গো! কি হলো! অমন আঁৎকে উঠলে কেন?'

স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল তাহমিনা। বলতে হলো না, নিজেই দেখতে পেল সে।

'আগুন! হায়, খোদা, আগুন ধরে গেছে ঘাসে!'

আতিকুর রহমান বিপদের গুরুত্বটা সাথে সাথেই অনুধাবন করতে পেরেছেন।

এগিয়ে আসছে আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে লম্বা শুকনো ঘাস।

'ফায়ার ব্রিগেড! এক্ষুণি খবর দিতে হবে!'

ছুটলেন তিনি সিঁড়ির দিকে। মনে মনে, জানেন, ফায়ার ব্রিগেড আসার আগেই সর্বনাশ ঘটে যাবে। যেভাবে আগুন এগিয়ে আসছে তাতে দমকলবাহিনীর লোকজন পৌঁছুবার আগেই বাড়ির ভিতর নাক গলিয়ে দেবে অগ্নিশিখা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে থমকালেন আতিকুর রহমান! ও কিসের শব্দ! ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং···।

ফায়ার ব্রিগেড!

আশ্চর্য ব্যাপার তো, ওরা খবর পেল কিভাবে? কে খবর দিল এত তাড়াতাড়ি?

অত কথা ভাবার সময় নেই। যাক, বিপদটা হয়তো কেটে যাবে। ভাগ্যটা নিতান্ত ভালই বলতে হবে।

দোতলায় নেমে বারান্দা থেকে দেখলেন তিনি, বাড়ির গেট খুলে দিচ্ছে টোটা। দমকলবাহিনীর দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। গেট খোলা হতেই তীর বেগে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটল গাড়ি দুটো পিছন দিকে।

বারান্দা থেকে ছুটলেন তিনি সিঁড়ির দিকে।

বাড়ির পেছনে পৌঁছে তিনি দেখলেন, দমকলবাহিনীর লোকেরা বিপুল ব্যস্ততায় মেতে রয়েছে।

পানির ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঝোপ-ঝাড়, উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার দিকে। পাইপগুলো দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি দুটো, পানির ট্যাঙ্কসহ, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। চাকর-বাকরদেরকে ধমক মারছে দমকলবাহিনীর কর্মীরা, কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

আগুন প্রায় পৌঁছে গেছে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে।

বিপদ কেটে যাবে। রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে ভাবলেন আতিকুর রহমান। দমকলবাহিনীর তৎপরতা দেখে এককথায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন তিনি। কাছাকাছি গেলেন না, খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ওদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

তীরবেগে ছুটে এল দমকলবাহিনীর এক শুকনোপাতলা অফিসার। ঘামে ভিজে গেছে তার ইউনিফর্ম। উত্তেজিত, অস্থির দেখাচ্ছে তাকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে আতিকুর রহমানের সামনে দাঁড়াল অফিসার।

'হাপনিই এই বাড়ির মালিক? হাপনিই মি. আতিকুর রহমান?'

আতিকুর রহমান বললেন, 'হ্যাঁ···আগুন কি নেভানো যাচ্ছে না?'

'না, যাইটেছে না! টবে, চিন্টা করিবেন না। ফায়ারকে কন্ট্রোল করার কায়ডা হামাডের ভালই জানা আছে। বাট—প্রবলেম ডেকা ডিয়াছে, মি. রহমান। অনলি ইউ ক্যান সলভ্ ইট।'

'কি প্রবলেম?'

'হামাদের ট্যাঙ্কের ওয়াটার শেষ হইয়া যাইটেছে। বাট দিস মোমেন্টে গাড়ি লইয়া গিয়া ওয়াটার নিয়া আসা সম্ভব হইবে না—অনেক ডেরি হইয়া যাইবে। হাপনি যডি আপট্টি না করেন, হাপনার সুইমিং পুল হইটে ওয়াটার নিটে চাই।'

'সুইমিং পুল থেকে পানি নেবেন?' চিন্তিত দেখা গেল আতিকুর রহমানকে। ভয়ানক এক সমস্যায় পড়ে গেছেন যেন তিনি।

'সুইমিং পুলের পানির চাইটে হাপনার বাড়িটা নিশ্চয়ই ইম্পরট্যান্ট? কাকে পছন্দ করেন? সুইমিং পুলের পানিকে, না হাপনার বাড়িকে?'

'আসলে কি জানেন, সুইমিং পুলটা তৈরিই করেছি আমি, কোনদিন নামিনি ওতে আমি। আমার স্ত্রী সাঁতার কাটেন···।'

'সেটো ভাল কঠা। ভবিষ্যটেও সুইম করিবেন। ওয়াটার নিব, পরে সময় মট ওয়াটার ডিয়া ভরিয়াও ডিব—ডিসিশন নিন।'

আতিকুর রহমান তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

অফিসার ধমকে ওঠেন, 'কুইক!'

পিছন থেকে তাহমিনা বলে ওঠে, 'কী আশ্চর্য! তুমি অমন ইতস্তত করছ কেন? বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না?'

ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন আতিকুর রহমান। মনস্থির করতে পারছেন

না তিনি। কিছু যেন ভাবছেন। বেশ একটু আতঙ্কগ্রস্ত মনে হলো তাঁকে।

তাহমিনা অনুমতি দিল। অফিসারের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে, 'আমি বলছি, পানি নিন আপনারা।'

আতিকুর রহমান বলে উঠলেন, 'কিন্তু…'

ধমকে উঠল তাহমিনা স্বামীকে, 'কোন কিন্তু নয়। তোমার হয়েছে কি বলো তো?'

অফিসার ছুটল তখুনি। এক মিনিট পর দেখা গেল কয়েকটা পাইপ নামিয়ে দিচ্ছে কর্মীরা সুইমিং পুলে।

মিনিট পঞ্চাশেক পর বিপদটা সম্পূর্ণ কেটে গেল। দমকলবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আগুন নিভিয়ে ফেলা হলো। কর্মীরা গাড়িতে উঠে বসল। অফিসারও উঠল। এগিয়ে যাচ্ছিলেন আতিকুর রহমান, অফিসার চিৎকার করে বলে উঠল, 'চিন্টা করিবেন না, মি. রহমান। ওয়াটার ডিয়া যাইব।'

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল পরমুহূর্তে। কিছু বলার অবকাশ পেলেন না তিনি। দেখতে দেখতে গাড়ি দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির আড়ালে।

সুইমিং পুলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন আতিকুর রহমান। দেখলেন, তলদেশ দেখা যাচ্ছে। পানি নেই।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কাজটা উচিত হলো না।'

'কি যে হলো তোমার বুঝতে পারছি না। পুলের পানি দিয়ে আগুন নিভিয়েছে—এত দুঃখ পাবার কি আছে!'

কথা না বলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন আতিকুর রহমান।

পাঁচ

পরদিনের ঘটনা। বেলা দুটো। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন আতিকুর রহমান। ড্রয়িংরুমের দরজায় দেখা গেল টোটাকে।

'এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন, হুজুর।'

'নাম কি? নাম জিজ্ঞেস করে আয়।'

টোটা বলল, 'নাম বললেন, সুধীন গুপ্ত।'

'সুধীন গুপ্ত?'

পরিচিত নয় নামটা। তবু বললেন, 'নিয়ে আয় সাথে করে।'

লম্বা, সুবেশী, তীক্ষ্ণ চেহারার এক ভদ্রলোককে নিয়ে এল টোটা ড্রয়িংরুমে।

চিনতে পারলেন না ভদ্রলোককে আতিকুর রহমান। এ চেহারা আগে কখনও দেখেননি। কিন্তু ভদ্রলোক হাসছেন তাঁর দিকে চেয়ে অতি পরিচিতের মত।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন আতিকুর রহমান।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম সুধীন গুপ্ত।'

ভাবটা ভদ্রলোকের এমন, যেন নাম বললেই তাকে চেনা যাবে।

'চিনতে পারলাম না কিন্তু…।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বলেন কি, মি. রহমান? নামটা শুনেও চিনতে পারলেন না?'

ভদ্রলোক তখনও সকৌতুকে হাসছেন। বললেন আবার, 'আমি দিল্লী থেকে এসেছি। গত বিশ বছর ধরে আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক।'

'মাই গড!'

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন আতিকুর রহমান। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা তাঁর। দিল্লীর প্রখ্যাত স্ট্যাম্প বিক্রেতা সুধীন গুপ্তকে তিনি চিনতে পারেননি এ বড় লজ্জার কথা। ভদ্রলোককে কখনও দেখেননি তিনি ঠিক, কিন্তু নামটার সাথে সত্যি বিশ বছর ধরে তিনি পরিচিত।

'বসুন, বসুন, সুধীন বাবু, আপনিই তাহলে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি আমার প্রায় আট লাখ টাকা হজম করেছেন!'

হাহ্ হাহ্ হাহ্ হাহ্ করে হেসে উঠলেন সুধীন বাবু। বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। আট লাখ টাকার স্ট্যাম্প বিক্রি করেছি আমরা আপনার কাছে।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'আপনার সাথে দেখা হলো, সৌভাগ্য বটে! তা ঢাকায় হঠাৎ কি মনে করে?'

'কেনাকাটা করতে এসেছি।'

'বলেন কি! দিল্লী থেকে এসেছেন স্ট্যাম্প কিনতে—ঢাকায়?'

সুধীন বাবু বললেন, 'বিশেষ একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় কেনার সুযোগটা পেয়েছি! জানি না যা কিনতে চাই তা কিনতে পারব কিনা। আসলে, ব্যাপার কি জানেন, নিজের জন্যে নয়, কিনতে এসেছি এক কোটিপতি কালেক্টরের পক্ষ থেকে।'

মুখটা ধীরে ধীরে পাংশু বর্ণ ধারণ করছে আতিকুর রহমানের।

'কি···নির্দিষ্ট কোন স্ট্যাম্প···?'

সুধীন বাবু হেসে উঠলেন, 'আপনিও একজন কালেক্টর, তাই ভেবেছিলাম কেনার কাজটা না সেরে আপনাকেও বলব না কি কিনতে এসেছি। কিন্তু লুকোচুরি করা উচিত নয় আপনার সাথে—বলেই ফেলি। আমি বিশ্ববিখ্যাত কেপ ট্রায়াংগুলারটা কিনতে এসেছি। আশি লক্ষ টাকার প্রস্তাব দিয়েছেন এক ভদ্রলোক। এক লক্ষ টাকা আমি পাব। আরও কমে যদি কিনতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। সত্তরে কিনতে পারলে দশ লাখ টাকাই পাব আমি।'

মাথা ঘুরছে আতিকুর রহমানের। ভীষণ অসুস্থ বোধ করছেন তিনি হঠাৎ। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মৃদু, খসখসে কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'ওটা যে নকল নয় তা জানলেন কিভাবে?'

'বারে! আমরাই তো বিক্রি করেছিলাম কেপ ট্রায়াংগুলার মি. ইব্রাহিমের কাছে। সত্তর লাখ টাকা ধরা হয়েছিল দাম। নগদ দিয়েছিলেন তিনি মাত্র পঁচিশ লাখ। বাকি টাকার বদলে দিয়েছিলেন অনেক স্ট্যাম্প—পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্প। ওটা যে আসল কেপ ট্রায়াংগুলার তা আমরা জানব না তো জানবে কে? গত ত্রিশ বছর ধরে আমরা ব্যবসা করছি, আজ পর্যন্ত একটা নকল

স্ট্যাম্প কারও কাছে বিক্রি করিনি। ফেরারীর কাছ থেকে কেপ ট্রায়াংগুলার কিনেছিলেন আমার বাবা, ১৯২২ সালে। নিলামটা হয়েছিল প্যারিসে। আমি তখন ছোট। আচ্ছা, মি. রহমান, একটা নকল কেপ ট্রায়াংগুলার আপনি বছর পাঁচেক আগে কিনেছিলেন, তাই না? খবরটা আমরা পাই আমাদের নিউইয়র্কের প্রতিনিধির কাছ থেকে। এখনও রেখেছেন সেটা? নাকি বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'এত কথাও জানেন আপনি!'

কথা বলছেন বটে আতিকুর রহমান, কিন্তু মনে মনে দ্রুত ভাবছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এই লোক তাঁর জন্যে মৃত্যুদূত—সাক্ষাৎ যম। একে বাঁচতে দেয়া চলবে না। এ লোক বেঁচে থাকলে তিনি মরবেন।

খুন করবেন তিনি।

'মি. ইব্রাহিমের কালেকশন দেখেছেন ইতিমধ্যে?'

সুধীন বাবু বললেন, 'না। এখনও সৌভাগ্য হয়নি। মিসেস রুবিনা বললেন মি. সিম্পসনের সাথে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগ হয়েছে ভদ্রলোকের সাথে কিন্তু তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে আলোচনা হয়নি। আগামীকাল তাঁর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'তাহলে তো আজ আপনার হাতে প্রচুর সময় রয়েছে। রাতে ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। আসবেন। সেই সুযোগে আমার কালেকশনটাও দেখে নেবেন।'

'চমৎকার, চমৎকার! আপনার কালেকশন না দেখে দিল্লী ফিরে যাব সেটা ভাবতেও পারি না। অবশ্যই আসব।'

'কোন্ হোটেলে উঠেছেন?'

'ইন্টারকনে।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'ঠিক ছটায় গাড়ি নিয়ে যাব আমি, সাথে করে নিয়ে আসব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ। এখনকার মত তাহলে উঠি, মি. রহমান?'

আতিকুর রহমান বললেন, 'ছ'টার সময় তৈরি থাকবেন কিন্তু!'

'নির্ঘাৎ।'

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সুধীন বাবু।

মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন আতিকুর রহমান। খুন করতেই হবে, আর কোন উপায় নেই। প্রশ্ন হলো, কিভাবে?

ভাবছেন তিনি। খুন করে কি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় না নিজেকে? চুরি করেছেন তিনি কেপ ট্রায়াংগুলার সেটা ভয়ের ব্যাপার নয়, ভয়ের ব্যাপার হলো, তিনি চুরি করেছেন এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে পুলিশ ধরে নেবে তিনিই খুন করেছেন ইব্রাহিম খলিলকে, ওই স্ট্যাম্পের লোভে। পুলিশের জেরার উত্তরে কি বলবেন তিনি? কিভাবে প্রমাণ করবেন স্ট্যাম্পটা তিনি চুরি করেছেন ইব্রাহিম খলিল খুন হবার পর, আগে নয়?

ভেবে দেখলেন, না প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

খুনই করতে হবে সুধীন বাবুকে। ফিরে আসছে সেই প্রশ্ন, কিভাবে?

গাড়িতে তুলবেন তিনি সুধীন বাবুকে ছ'টার সময়। ঢাকার পথঘাট চেনা নেই তার। গাড়ি নিয়ে যাবেন তিনি রেলক্রসিংয়ের দিকে। ছ'টায় কমলাপুর স্টেশন থেকে একটা মেল ট্রেন ছাড়ে। বিদিশা রেলক্রসিং পেরোবে ট্রেন ছ'টা পাঁচ মিনিটে।

ইন্টারকন থেকে বিদিশা রেলক্রসিং পাঁচ মিনিটেরই পথ। সুন্দর পরিকল্পনা ভাবলেন তিনি। গাড়ির বাঁ দিকে বসবে সুধীন বাবু। বাঁ দিকের দরজাটা যাতে খুলতে না পারে বিপদ টের পেয়ে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। টাইমিংটা হতে হবে নিখুঁত। ট্রেন রেলক্রসিংয়ের সীমানায় পৌঁছুবে, তাঁর গাড়িও রেলক্রসিংয়ের উপর উঠে যাবে,—এক মুহূর্তের এদিক ওদিক হলে চলবে না। শেষমুহূর্তে ডান দিকের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বেন তিনি। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হবে ট্রেনের সাথে গাড়ির।

সবাই বলবে এটা একটা দুর্ঘটনা। ব্রেক ফেল করেছিল—তাই ঘটেছে।

কিন্তু টাইমিং যদি ঠিক না থাকে? যদি লেট হয় ট্রেন আসতে?

বিকল্প পথটাও বের করে ফেললেন তিনি। বিদিশা রেলক্রসিং-এর পরই রাস্তার দু'ধারে গভীর নিচু ধানীজমি। নাক ঘুরিয়ে দেবেন তিনি গাড়ির। লাফিয়ে পড়বেন নিজে। প্রায় খাড়া ঢালু মাটির উপর দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে নেমে যাবে গাড়িটা, ধানী জমির কিনারায় কৃত্রিম খালে পড়ে ডুবে যাবে সাথে সাথে।

বিড়বিড় করে বললেন আপন মনে, 'নিখুঁত—কেউ ধরতে পারবে না ব্যাপারটা।'

ছয়

সময়মত রওনা হয়ে গেলেন আতিকুর রহমান গাড়ি নিয়ে ইন্টারকনের উদ্দেশে। নির্জন এক রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করালেন তিনি। রেঞ্চ বের করে চারদিকটা দেখে নিলেন। লোকজন, গাড়িঘোড়া যে নেই তা নয়। তবে সব বেশ দূরে দূরে। তাছাড়া তিনি যা করবেন তা কেউ দেখলেও কিছু আসে যায় না। লোকে ভাববে, মেরামত করছেন গাড়ির কোন ত্রুটি।

কয়েকটা আঘাতেই উদ্দেশ্য পূরণ হলো। বাঁ দিকের দরজার হাতলটা এমনভাবে বেঁকে গেল যে সেটা শত চেষ্টাতেও ঘুরবে না। না বাইরে থেকে, না ভিতর থেকে।

ঠিক ছ'টার সময় গাড়ি থামালেন আবার তিনি, এবার ইন্টারকনের ভিতর। করিডরে এইমাত্র এসে পৌঁছুছেন সুধীন বাবু, গাড়িটাকে দেখে নেমে এলেন তিনি।

আতিকুর রহমান তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। বললেন, 'সুধীন বাবু, আপনাকে উঠতে হবে এদিকের দরজা দিয়ে। হুইলের নিচে দিয়ে গিয়ে বসতে হবে ওদিকের সীটে। একটা ট্রাক আর একটু হলে খুনই করে ফেলেছিল আমাকে! ভাগ্য ভাল যে গাড়ির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। হাতলটা একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে।'

সুধীন বাবু আফসোস করলেন, 'এমন দামী গাড়ি, খুঁত সৃষ্টি করে দিয়ে গেল!'

'কি আর করা বলুন! নাম্বারটাও টুকে নিতে পারিনি। ঝড়ের বেগে চলে গেল।'

সুধীন বাবু উঠলেন। বাঁ দিকের সীটে গিয়ে বসলেন তিনি। আতিকুর রহমান সন্তুষ্ট হলেন। ফাঁদে আটকা পড়েছে সুধীন বাবু। হুইলের বাধা অতিক্রম করে এদিকের দরজার কাছে পৌঁছুতে সুধীন বাবুর প্রচুর সময় লাগবে। তার আগেই যা ঘটবার ঘটে যাবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। স্পীড কমিয়ে দিলেন বেশ খানিক। রিস্টওয়াচের কাঁটা বলছে ছ'টা বেজে দু'মিনিট হয়েছে।

বিদিশা রেলক্রসিংয়ে পৌঁছুতে হবে ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায়। অর্থাৎ এখন থেকে দুই মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের মাথায়।

সময় বয়ে যাচ্ছে। সুধীন বাবু খুবই রসিক ব্যক্তি। নিজের কথাতেই হাহ্ হাহ্ করে হাসছেন তিনি। হাসছেন আতিকুর রহমানও।

ঠিক ছয়টা পাঁচ মিনিটের মাথায় পৌঁছুলেন তিনি বিদিশা রেল-ক্রসিংয়ের কাছে। গতি একেবারে ন্যূনতমে নামিয়ে এনেছেন। কিন্তু বৃথাই এত পরিকল্পনা।

কমলাপুর স্টেশনের দিক থেকে ট্রেন কেন, কিছুই আসছে না লাইনের উপর দিয়ে।

ট্রেন লেট।

করার কিছু নেই। রেলক্রসিং অতিক্রম করে গেল গাড়ি। বিকল্প উপায়টার কথা ভাবতে লাগলেন আতিকুর রহমান। রাস্তার দুই ধারে নিচু ধানখেত দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম খালটাও।

এদিকটায় খালের গভীরতা কম। আরও সামনে কোথাও ঘটাতে হবে ঘটনাটা। সামনে ধানখেত আরও অনেক বেশি নিচুতে।

কথা বলছেন সুধীন বাবু। কথা আতিকুর রহমানও বলছেন। বিপদটা ঘটতে শুরু করলে যেন প্রস্তুত হতে না পারেন তার জন্যে তিনি সুধীন বাবুর মনটা আগে থেকেই অন্যদিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা পাচ্ছেন।

'কেপ ট্রায়াংগুলার যে কোন কালেক্টরের কাছে জীবনের চেয়ে মূল্যবান, আমি তো তাই মনে করি,' বললেন সুধীন বাবু।

আতিকুর রহমান বললেন, 'ওটা আসলে একটা কথার কথা, তাই না? সত্যিই কি কেউ জীবনের বিনিময়ে কেপ ট্রায়াংগুলার চাইবে? সে যদি নিজেই বেঁচে না থাকে, কি হবে কেপ ট্রায়াংগুলার দিয়ে?'

সুধীন বাবু বললেন, 'আপনার কথাই ঠিক, মানি। জানেন, মি. রহমান, ইব্রাহিম সাহেবের কালেকশনে একটা স্ট্যাম্প দেখে বড় লোভ হয়েছে···।'

অকস্মাৎ মাঝপথে থেমে গেলেন সুধীন বাবু। যে কথা তিনি আতিকুর রহমানকে জানাতে চাননি তাই জানিয়ে ফেলেছেন ভুলক্রমে···।

এদিকে রাস্তা থেকে গাড়ি সরে গেছে। আতিকুর রহমান লাফ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে গেছেন। আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, প্রায় খাড়া খাদের কিনারায় সামনের চাকা দুটো পৌঁছে যাবে।

কিন্তু সুধীন বাবুর শেষ অসমাপ্ত কথাটা আতিকুর রহমান ঠিকই শুনেছেন। এক

সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েকটা কথা ভেবে নিলেন তিনি। ইব্রাহিম সাহেবের কালেকশন ইতিমধ্যে দেখেছেন সুধীন বাবু। তার মানে, কেপ ট্রায়াংগুলার যে চুরি গেছে তা তিনি জানেন। শুধু তাই নয়, চোর যে কে তাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। আরও কয়েকটা কথা ভাবলেন তিনি। সুধীন বাবু হয়তো আসলে দিল্লী থেকে আসেননি। ইনি হয়তো খোদ মি. শহীদ খান, ছদ্মবেশে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন, কথা আদায় করার জন্যে—এ লোককে খুন করা চলবে না। পুলিশ স্বীকার করবে না এটা অ্যাক্সিডেন্ট। তারা পরিষ্কার ধরে নেবে, এটা খুন।

প্রাণপণে ব্রেক কষলেন আতিকুর রহমান। আস্তেই ছুটছিল গাড়ি, লাফ দেবার সুবিধার্থেই আস্তে চালাচ্ছিলেন তিনি। দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি, কিন্তু সামনের চাকা দুটো খাদের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে। একটু এদিক ওদিক হলেই গড়িয়ে পড়তে পারে নিচে।

দূরে দূরে লোকজন, সবাই লক্ষ করল। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, ভাগ্যের জোরে রক্ষা পেয়ে গেছে, ভাবল সবাই।

'কি যে ভাবছিলাম, লক্ষই করিনি গাড়ি খাদের দিকে যাচ্ছে?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সুধীন বাবু বললেন, 'সময় মত ব্রেক কষেছিলেন বলে এ যাত্রা প্রাণটা রক্ষা পেল।

গাড়ি ব্যাক করতে গিয়ে মুশকিলে পড়লেন আতিকুর রহমান। সামনের চাকা দুটো আটকে গেছে কাটা গাছের গুঁড়িতে, উঠছে উপর দিকে।

'বসুন আপনি, নেমে দেখি কি অবস্থা।'

নিচে নেমে দাঁড়াতেই লক্ষ করলেন থরথর করে কাঁপছে পা দুটো। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন—আঁৎকে উঠলেন হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে। মাথা ঘুরছে তাঁর···তাই কি? চাকা দুটো নড়ছে, নেমে যাচ্ছে একটু একটু করে—তারপর দ্রুত বেগে—না! না! না!

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন আতিকুর রহমান। চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাটা। কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না তিনি। গাড়ির ভিতর তাকালেন। পলকের জন্যে দেখতে পেলেন সুধীন বাবুকে। আতঙ্কিত, ফাঁদে পড়া জন্তুর মত দিশে হারিয়ে পথ খুঁজছেন বেরুবার।

পরমুহূর্তে নেমে গেল গাড়িটা। শব্দ উঠে আসছে—ক্রমশ সরে যাচ্ছে শব্দটা। এক পা এগিয়ে দেখলেন গাড়িটা পড়ছে ডিগবাজি খেতে খেতে—।

কয়েক সেকেণ্ডের মাত্র ব্যাপার। ঘটে গেল ঘটনাটা। গাড়িটা ডুবে গেছে খালের পানিতে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আতিকুর রহমান। অনেক লোক জড় হলো। সুধীন বাবু কিন্তু বেরিয়ে এলেন না পানির ভিতর থেকে।

সাত

'এক গ্লাস পানি দে, টোটা! আর—আর শোন্, তোর বিবিসাহেবাকে ছুটে গিয়ে

ডেকে নিয়ে আয়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন আতিকুর রহমান।

ড্রয়িংরুমেই পায়চারি করতে শুরু করলেন তিনি। উপরে ওঠার সময় নেই, দেরি হয়ে যাবে তাহলে। পালাতে হবে তাঁকে—এখুনি!

পানি নিয়ে এল টোটা।

'টোটা। শোন—একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে—আমাকে পালাতে হবে—টোটা—তোর বিবিসাহেবাকে ডেকে আন!'

'কি হয়েছে, হুজুর?' অতি শান্ত গলা টোটার।

'অ্যাক্সিডেন্ট—না, সত্যি বলছি—'

কথা শেষ করলেন না আতিকুর রহমান, পাশের রুমের দরজার সামনে পাগলের মত ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন। স্ট্যাম্পটা সরাতে হবে! নষ্ট করে ফেলতে হবে কেপ ট্রায়াংগুলারটাকে।

দরজার কবাট উন্মুক্ত করে ভিতরে ঢুকতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি।

মি. সিম্পসন বসে আছেন রুমের ভিতর, একটি চেয়ারে।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মি. রহমান, কেন আমি এখানে অপেক্ষা করছি?' উঠে দাঁড়িয়ে রূঢ় কণ্ঠে বললেন মি. সিম্পসন। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন আতিকুর রহমানের মুখোমুখি। তাঁর হাতে চক্‌চক্ করছে কাল্লো রিভলভারটা বৈদ্যুতিক আলোয়।

অভিনয় করার চেষ্টা করে লাভ নেই।

'মি. সিম্পসন, আপনি হয়তো ভাবছেন আমি ইব্রাহিম সাহেবকে খুন করেছি। বিশ্বাস করুন, আমি করিনি। স্বীকার করছি, অন্য একটা অপরাধ করেছি আমি। চুরি করেছি কেপ ট্রায়াংগুলার। আসলটা নিয়ে রেখে এসেছি নকলটা। কিন্তু সেটা ইব্রাহিম সাহেব খুন হবার পরে। তিনি খুন হবার পর—শুনতে পাচ্ছেন আমি কি বলছি? তিনি খুন হবার পর আমি চুরি করেছি। শনিবার রাতে—হ্যাঁ, শনিবার রাতে ওটা চুরি করেছি আমি। বৃহস্পতিবারে খুন হয়েছেন ইব্রাহিম সাহেব, তাই না? শুক্রবার দিন প্রথম তাঁর বাড়িতে আপনার ফোন পেয়ে যাই আমি। শনিবার রাতে চুরি করি স্ট্যাম্পটা। এই অপরাধের জন্য যে কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু খুন আমি করিনি।'

রীতিমত চিৎকার করে, উন্মাদের মত হাত নেড়ে কথাগুলো বললেন আতিকুর রহমান। হাপরের মত ওঠানামা করছে তাঁর বুক।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট। চলুন, থানায় যেতে হবে আপনাকে। আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করছি।'

'টোটা! টোটা এদিকে আয়!' চিৎকার করে উঠলেন আতিকুর রহমান।

টোটা দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিল, যায়নি সে তার বিবিসাহেবকে খবর দিতে।

রুমের ভিতর ঢুকে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল সে।

চিৎকার করে আতিকুর রহমান বললেন, 'টোটা! তুই মি. সিম্পসনকে বল! তুই দেখেছিস! তুই কী-হোল দিয়ে সে-রাতে দেখেছিস। বল দেখিসনি? আমি পানি

দিয়ে ভিজিয়ে একটা স্ট্যাম্প অ্যালবামে রেখেছিলাম, তার আগে আনন্দে কেঁদেও ছিলাম আমি—সব দেখেছিলি তুই! বল! বল মি. সিম্পসনকে, সেদিন কি বার ছিল? বল শনিবার ছিল কিনা?'

এতদিন পর, এইবার সুযোগ এসেছে, ভাবছে টোটা। প্রতিশোধ নেবে সে। বলল, 'মি, সিম্পসনকে আগেই আমি বলেছি। শনিবার নয়, আপনি বৃহস্পতির রাতে স্ট্যাম্পটা অ্যালবামে রেখেছেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে।'

মাথায় যেন গোটা আকাশটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আতিকুর রহমানের। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা! টোটা মিথ্যে কথা বলছে! ও আমাকে ঘৃণা করে, মি. সিম্পসন! ফর গডস্ সেক্, বিলিভ মি। টোটাকে মারধোর করি, তাই ও আমাকে ঘৃণা করে, তাই ও প্রতিশোধ নেবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে···।'

'মিথ্যে কথা কেন বলব, হুজুর। আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি, বৃহস্পতিবারেই আপনি অ্যালবামে একটা স্ট্যাম্প রাখেন। আপনাকে কাঁদতেও দেখেছি আমি।'

'মি. সিম্পসন। মি. সিম্পসন, আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না—প্লীজ! আমি খুন করিনি, বিশ্বাস করুন! মনে নেই আপনার, আমি ফোন পেয়ে ইব্রাহিম সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছিলাম···আপনার সাথে যখন দেখা হলো বলিনি কি আপনাকে ভুল ঠিকানায় গিয়েছিলাম প্রথমে? আমি যদি তাঁকে খুন করে থাকি, তাঁর বাড়ি চিনতে ভুল হবে কেন আমার? বলুন? ওটা একটা প্রমাণ নয় যে আমি খুন করিনি তাঁকে?'

'আপনি খুবই চতুর লোক, মি. রহমান। ভুল ঠিকানায় আপনি ইচ্ছে করে গিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার দরকার হবে ভেবে। সুধীন বাবু, যিনি কিনা ঢাকায় এর আগে কখনও আসেননি, কই, তিনি তো ভুল করেননি? সরাসরি তিনি মি. ইব্রাহিমের বাড়িতে পৌঁছান। ভাল কথা। কোথায় তিনি?'

'আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে খানিক আগে। সুধীন বাবু গাড়িতে ছিলেন···তিনি···তিনি মারা গেছেন। খাদে গাড়ি—।'

'মারা গেছেন?'

এবার মি. সিম্পসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সুধীন বাবু মারা গেছেন? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনার? কোথায়?'

'বিদিশা রোডে···।'

মি. সিম্পসন আতিকুর রহমানের মাথা লক্ষ্য করে রিভলভার ধরলেন এবার, বললেন, 'ইন্টারকন থেকে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসার কথা সুধীন বাবুকে, তাই না? সরাসরি রাস্তা আছে। আপনি বিদিশা রোডে গিয়েছিলেন কেন? গাড়িটাকে খাদে ফেলে দেবার জন্যে, তাই না? সুধীন বাবুকে খুন করার জন্যে, তাই না?'

আতিকুর রহমান প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'মি. সিম্পসন, আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি খুন করিনি। ইব্রাহিম সাহেবকেও না, সুধীন বাবুকেও না···।'

'ওসব কথা থাক। আপনাকে এই মুহূর্তে থানায় যেতে হবে, মি. রহমান।'

ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন আতিকুর রহমান, 'আমি সত্যিই খুন করিনি। আপনি দয়া করে একজন উকিলের সাথে কথা বলতে দিন অন্তত আমাকে, থানায় নিয়ে

যাবার আগে। কিংবা আপনি অন্তত মি. শহীদ খানের সাথে কথা বলতে দিন আমাকে। হ্যাঁ, শহীদ খান, তিনিই একমাত্র আমাকে রক্ষা করতে পারবেন। শুনেছি, নির্দোষ লোককে তিনি শাস্তি পেতে দেন না…।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'যার সাথেই কথা বলুন, থানায় আপনাকে যেতেই হবে। শহীদ আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না…।'

'তাঁকে আমি সব সত্যি কথা বলব। আপনি দয়া করে একটা সুযোগ দিন তাঁর সাথে কথা বলার।'

'বেশ। ফোন করুন।'

ড্রয়িংরুমে ফিরে এলেন ওঁরা। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন আতিকুর রহমান।

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল শহীদের কণ্ঠস্বর, 'শহীদ খান স্পীকিং…।'

আতিকুর রহমান বললেন, 'মি. শহীদ, আমাকে বাঁচান!

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে, মি. রহমান?'

'মি. শহীদ, ইব্রাহিম সাহেব এবং সুধীন বাবুকে খুন করেছি আমি এই অভিযোগে মি. সিম্পসন আমাকে অ্যারেস্ট করতে চাইছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ওদের কাউকে খুন করিনি। আমার হাতে প্রমাণ নেই, আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছি না, কিন্তু খুন আমি করিনি। একজন নির্দোষ মানুষ আমি, মি. শহীদ, অথচ খুনের অভিযোগে আমার বিচার হবে। আপনি কি, মানবতার খাতিরে, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না?'

শহীদ কথা বলল না অনেকক্ষণ।

'মি. শহীদ?' কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে ডাকলেন আতিকুর রহমান।

একটিমাত্র প্রশ্ন করল শহীদ, 'সত্যি আপনি নির্দোষ? সত্যি ওদের কাউকে আপনি খুন করেননি?'

'সত্যি আমি নির্দোষ। ওঁদের কাউকে আমি খুন করিনি। সুধীন বাবুকে খুন করব, একথা ভেবেছিলাম। খুন করব ভেবেছিলাম, কারণ, কেপ ট্রায়াংগুলার চুরি করেছি আমি এটা একমাত্র তিনিই প্রমাণ করতে পারতেন, তাই। কিন্তু ভাবলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমি খুন করিনি। তিনি রোড অ্যাক্সিডেন্টেই নিহত হয়েছেন, বিদিশা রোডে…।'

শহীদ বলল, 'আপনি যদি নির্দোষ হন, মি. রহমান, আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারবই। নির্দোষ কোন লোক শাস্তি পাক—এ আমি হতে দিই না। আপনি মি. সিম্পসনকে বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে বলুন, আমি আসছি।'

আট

বিশ মিনিট নয়, প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর এল শহীদ। ড্রয়িংরুমে ঢুকে ও দেখল আতিকুর রহমান মাথা নিচু করে বসে আছেন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। মি. সিম্পসন হাত পাঁচেক দূরে একটা চেয়ারে বসে আছেন রিভলভার হাতে নিয়ে।

সেটা আতিকুর রহমানের দিকে তুলে ধরা।

দু'জনেই মুখ তুলে তাকালেন।

মি. সিম্পসন বললেন, 'শহীদ, মি. রহমান নির্দোষ তা প্রমাণ করতে পারছেন না, শুধু বলছেন আমি খুন করিনি। সুধীন বাবুকে খুন করেছেন—এতে তো সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। ইব্রাহিম সাহেবকেও খুন করেছেন। তাঁকে খুন করার মোটিভ একমাত্র ওঁরই আছে। কেপ ট্রায়াংগুলারটা চুরি করাই ছিল মোটিভ। ওঁর চাকর টোটাও বলছে, বৃহস্পতিবার রাতে স্ট্যাম্পটা…'

'ও মিথ্যে কথা বলছে। আমাকে ও ঘৃণা করে মারধোর করি বলে…।'

শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন, আমি চেষ্টা করব মি. রহমানকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, তিনি সত্যি নির্দোষ।'

'শহীদ! কি বলছ তুমি!'

শহীদ বলল, 'কিছু প্রমাণও আমার হাতে আছে।'

'প্রমাণ আছে!'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, মি. সিম্পসন। ইব্রাহিম সাহেবের হত্যাকারী যে মি. রহমান নন তার প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি আজ সন্ধ্যার পরপরই। ইব্রাহিম সাহেবকে খুন করেছে তাঁর ছেলে, আশরাফুল খলিল। ইব্রাহিম সাহেব তাঁর এই পুত্র সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর রাখতেন না। ছেলেটি তার মায়ের কাছে, বস্তিতে থেকে মানুষ হয়েছে।'

'শহীদ, তুমি কি কুখ্যাত আশরাফ গুণ্ডার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। আশরাফ গুণ্ডাই ইব্রাহিম সাহেবের সেই ছেলে। বস্তিতে মানুষ সে, গুণ্ডা হয়েছে। তার মা মারা যাবার আগে বাবার পরিচয় জানিয়ে যায়। বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে খুন করে।'

'এসব কথা তুমি জানলে কিভাবে?'

'খুব সহজেই। আশরাফ গুণ্ডা তার বন্ধুকে সব কথা বলেছে। আমি তার সন্ধান পাইনি, কিন্তু তার বন্ধুর খোঁজ পাই। ভয় দেখিয়ে, কৌশলে তার কাছে থেকে সব কথা আদায় করেছি আমি। আশরাফ গুণ্ডা পালিয়েছে। সম্ভবত, ঢাকায় নেই সে।'

'মি. শহীদ! মি. শহীদ, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব! আপনি যে এত মহৎ, এত মানবদরদী—'

শহীদ বলল, 'এর মধ্যে মহত্ত্বের কিছু নেই, মি. রহমান। আপনি নির্দোষ, সুতরাং আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু সুধীন বাবুকে নিশ্চয়ই আপনি খুন করেছেন, মি. রহমান।'

শহীদ বলল, 'না। সুধীন বাবুকেও তিনি খুন করেননি। আমি এখানে আসার আগে বিদিশা রোড ঘুরে এসেছি। গাড়িটা খালে পড়ে রয়েছে। লাশটাও স্থানীয় লোকেরা গাড়ির ভিতর থেকে অনেক কষ্টে বের করেছে। অনেকেই ঘটনাটা ঘটার সময় দেখেছে। তারা কি বলছে জানেন? তারা বলছে, ঘটনাটা সম্পূর্ণ একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা!'

মি. সিম্পসন বোবা হয়ে রইলেন!

শহীদ বলল, 'মি রহমান, খুন আপনি করেননি, সত্যি। কিন্তু স্ট্যাম্পটা চুরি করেছেন। এরজন্য অবশ্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।'

আতিকুর রহমান বলে উঠলেন, 'সে শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।'

শহীদ বলল, 'তবে, আমি মি. সিম্পসনকে অনুরোধ করব, তিনি যেন আপনাকে গ্রেফতার না করেন। আপনি একটা অপরাধ করেছেন সত্যি, কিন্তু সেজন্যে ইতিমধ্যে যে মানসিক কষ্ট পেয়েছেন তা শাস্তি হিসেবে কম নয়। তাছাড়া আপনি এখন অনুতপ্তও বটে।'

মি. সিম্পসন একটু যেন হাসলেন। বললেন, 'তোমার অনুরোধ রাখব আমি তা জেনেই অনুরোধ করছ—বেশ। কেপ ট্রায়াংগুলার ফিরিয়ে দিন আমাকে, মি. রহমান। আপনাকে আমি গ্রেফতার করছি না।'

'গ্রেফতার ওকে করতেই হবে। ও একটা খুনী, গ্রেফতার করবেন না মানে?'

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল সুদর্শন, সুবেশী এক তরুণ যুবক। যুবকটি প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা। দামী স্যুট পরনে তার। মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

'কে!'

'কে আপনি?'

মি. সিম্পসন, শহীদ এবং আতিকুর রহমান একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন।

'আমার পরিচয় পরে জানলেও চলবে। আগে ওই শয়তানটার অপরাধের কাহিনী শুনুন। মিসেস শেফালী, ভিতরে আসুন।'

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল শেফালী, তার স্বামী আবদুস শুকুর এবং সকলের পিছনে মিস্টার স্যানন ডি. কস্টা।

'ডি. কস্টা! আপনি এখানে!' মি. সিম্পসন ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন।

ডি. কস্টা শেফালী এবং আবদুস শুকুরকে দেখিয়ে বলল, 'এনারা হামার ক্লায়েন্ট। ইহাডের একটা কেসের সমাডান বাহির করার ডিউটিটে হামি নিয়োজিট। হামার সহকারী মি. উল্কার মুখে হাপনারা বাকী হিসটোরী শুনুন।'

সুদর্শন যুবক, ডি. কস্টা যার নাম বলল মি. উল্কা, সে বলতে শুরু করল, 'মি. সিম্পসন, আপনি আমাকে না চিনলেও, আপনাকে আমি চিনি। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, এখুনি ওই শয়তান আতিকুর রহমানকে গ্রেফতার করুন।'

'তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?' মি. সিম্পসন একটু বিরক্তির সাথেই জানতে চাইলেন।

যুবক বলল, 'অভিযোগ? ওই শয়তান তার প্রথম স্ত্রীকে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে খুন করেছে। অভিযোগ শুধু নয়, প্রমাণও হাতে আছে আমার। আপনি একবার এখুনি এই বাড়ির পিছনের সুইমিং পুলে যান, নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন। সুইমিং পুলের নিচে লাশটা লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। আমার বস্ মি. ডি. কস্টা কৌশলে ক'দিন আগে সুইমিং পুল থেকে পানি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেন। আজ ঘন্টা খানেক আগে, লাশটা আবিষ্কার করি আমি। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ওই শয়তান রটায় যে তার স্ত্রী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সবাই সেটা মেনে

নিয়েছিল। কিন্তু ওর স্ত্রীর বোনের মেয়ে ওই মিসেস শেফালী পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তার নিরুদ্দিষ্ট খালার কাছ থেকে নিয়মিত মাসিক পাঁচশো করে টাকা পাচ্ছিল। এটা একটা সন্দেহের ব্যাপার, তাই না? যিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন তিনি টাকা পাঠাচ্ছেন, অথচ স্নেহের পাত্রী বোনঝির সাথে দেখা করছেন না—অবাক লাগে না? কেসটার দায়িত্ব মি. ডি. কস্টাকে দেন মিসেস শেফালী। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর খালার ঠিকানা। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, টাকা মিসেস শেফালীর খালা-আম্মা নয়, পাঠাচ্ছে এই শয়তান আতিকুর রহমান। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, মিসেস শেফালীর খালা-আম্মা নিখোঁজ হবার পরপরই ওই শয়তান রহমান তার বাড়িতে সুইমিং পুল তৈরি করে। দু'য়ে দু'য়ে চারের মতই ব্যাপারটা সহজ বলে মনে হলো। পানি তোলার ব্যবস্থা হলো পুল থেকে—তারপরের ঘটনা তো প্রথমেই বলেছি।'

আর কেউ না চিনতে পারলেও যুবককে শহীদের চিনতে ভুল হয়নি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ও শুধু।

মি. সিম্পসন বললেন, 'সত্যি লাশ আছে?'

'চলুন নিজের চোখে দেখবেন।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন আতিকুর রহমান, 'না-না। না-না! না…!'

জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লেন তিনি কার্পেটের উপর।

দুই মিনিট পর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সবাই ড্রয়িংরুম থেকে। সবাই চলেছে সুইমিং পুলের দিকে। আতিকুর রহমানের পাহারায় রইল আবদুস শুকুর, টোটা এবং মিসেস শেফালী।

ওরা সুইমিং পুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তলাটা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে একটা গভীর গহ্বর। একটা কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে গহ্বরের পাশেই।

মি. সিম্পসন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন যুবকের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোথায় সে! কর্পূরের মত উবে গেছে যেন যুবকটি।

'কে ও? গেল কোথায় হঠাৎ?'

শহীদ মুচকি হেসে বলল, 'চিনতে পারেননি?'

'তার মানে? ও কি পরিচিত কেউ?'

'খুবই পরিচিত। মি. সিম্পসন, আপনাকে অপরাধী ধরতে যে সাহায্য করে গেল সে স্বয়ং কুয়াশা!'

'হোয়াট। কোথায় সে?'

শহীদ বলল, 'গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু জানতে চাইছেন কেন? সে তো আপনাকে সাহায্যই করল, তাই না?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ, ত ঠিক। সেজন্যে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওর অপরাধ তাতে করে কমেনি একবিন্দু। কোন্ দিকে গেল বলো তো!'

'আট দিকের যে কোন একদিকে গেছে। কে জানে কোন্ দিকে গেছে!'

মি. সিম্পসন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে আমি ঘায়েল করবই!'

কথা বলল না শহীদ। আপন মনে হাসল শুধু।

কুয়াশা ৬৫

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৭৭

এক

পাড়াটা শুধু ভদ্রই নয়, অভিজাতও। পিচ দিয়ে মোড়া প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশে ছবির মত সুন্দর সুন্দর বাড়ি। রাজপ্রাসাদ নয়, তবে রাজপ্রাসাদের আধুনিক এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন প্রতিটি বাড়ি। কোন কোন বাড়ির সামনে ছোট ছোট বাগান। হলুদ, লাল এবং বেগুনি ফুল ফুটে রয়েছে। রঙিন প্রজাপতি উড়ছে কয়েকটা। রাস্তার কোথাও একটি নেড়ী কুত্তা, নোংরা বস্তীর ছেলেমেয়ে, একটি ছেঁড়া কাগজের টুকরো বা এতটুকু আবর্জনা নেই। গোটা এলাকাটাই এমনি পরিষ্কার।

কোমর সমান উঁচু লোহার গেটের ভিতর বাগান বা মাঠ দেখা যায়। যন্ত্র দিয়ে সুন্দরভাবে কাটা ঘাসওয়ালা মাঠ। ঝকঝক তকতক করছে চারদিক।

পাড়াটা নিস্তব্ধ। কোথাও শোরগোল নেই, চেঁচামেচি নেই। পাড়ার সর্ব দক্ষিণের বাড়িটা একতলা। সবচেয়ে নিস্তব্ধ ওই বাড়িটাই।

বাড়িটা মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌসের। মোফাজ্জল হায়দার একজন ব্যবসায়ী। তিনি একটি ইনভেস্টিং কোম্পানীর মালিক। এই মুহূর্তে মোফাজ্জল সাহেব অফিসে আছেন। বাড়িতে আছে তাঁর স্ত্রী শাহানা ফেরদৌস, একা। সেজন্যেই বাড়িটা অমন নিস্তব্ধ।

সোমবার।

বেলা এখন দুটো। স্নান এবং মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে শাহানা। আজ ভোর থেকেই খাটা-খাটনি শুরু হয়েছিল। চাকরানী কলির-মা এবং সে নিজে, দু'জনেই এক মিনিট বিশ্রাম নেয়নি। প্রতিটি কামরা ধুয়ে মুছে সাফ করতে হয়েছে, তৈজসপত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হয়েছে মিটসেফে। লণ্ডীতে পাঠাতে হয়েছে বেড-কভার থেকে শুরু করে প্যান্ট-শার্ট, দরজা-জানালার পর্দা, সোফার কভার, মায় রুমাল এবং বালিশের কভার পর্যন্ত। সাড়ে বারোটার সময় কলির মাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে শাহানা। পনেরো দিন সে আর আসবে না এ বাড়িতে। দরকারও নেই তার আসার। শাহানা আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন পর ফিরবে চট্টগ্রামে, সেদিনই আসবে আবার কলির-মা। এই ক'দিন মোফাজ্জল সাহেব হোটেলেই খাওয়া দাওয়া সারবেন।

ওয়ালক্লকের ঢং-ঢং শুনে বিছানা ছাড়ল শাহানা। কামরাগুলো আর একবার

দেখে নেয়া দরকার। স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে কিচেনে গেল। সেখান থেকে ফিরে এল বেডরূমে। বেডরূম থেকে ড্রয়িংরূমে। কোন জিনিস স্পর্শ করতে হলো না। সব ঠিক আছে। তার অনুপস্থিতিতে স্বামীর যা যা দরকার সবই হাতের কাছে রেখে যাবার ব্যবস্থা করেছে শাহানা। ড্রয়ার খুললেই লণ্ড্রীর বিল পাবে। চাবির গোছাও আছে জায়গা মত। বড় কালো ট্রাঙ্কটা বেডরূমের ভিতর খাটের নিচে রাখা হয়েছে খালি করে।

ড্রেসিংরূমে ঢুকল শাহানা। তেপয়ের উপর একটা সুটকেস এবং একটা লেদার ব্যাগ খোলা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। শাহানার কাপড়চোপড়, কসমেটিকস্ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দুটোই ঠাসা। স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পনেরো দিনের জন্যে ঢাকায় যাচ্ছে সে—ছুটি উপভোগ করতে। পনেরো দিনের জন্যে যা যা দরকার সবই সে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিল শাহানা। দশ-টাকার নোটের বাণ্ডিল দুটো দেখে নিয়ে আলতোভাবে আবার একই জায়গায় নামিয়ে রাখল সেটা। বসল গদি-আঁটা টুলে। আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসি ফুটল না তার মুখে। কি যেন চিন্তা করে মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল ঝাপসা।

শাহানার দুই চোখের কোণে পানি জমল। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। তাড়াতাড়ি ফর্সা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বিদেশী পাউডারের কৌটাটা।

চট্টগ্রামের মঞ্চ-জগতের নামকরা নায়িকা ছিল শাহানা। মাত্র এক বছর হয়েছে বিয়ে হলো তার। বিয়ের পরপরই অভিনয় ছেড়ে দিয়েছে সে।

রূপসী হিসেবে খ্যাতি আছে শাহানার। বেশ লম্বা সে। গায়ের রঙ দুধে আলতায়।

সাজগোজ করতে করতে আকাশ পাতাল অনেক কিছু ভাবছিল শাহানা। স্বামী হিসেবে মোফাজ্জল সাহেব খুবই ভাল। তার সবেচেয়ে বড় গুণ, তিনি কোন সমস্যাকেই বড় বলে মনে করেন না। সমস্যা দেখা দিলে ঠাণ্ডা মাথায় তিনি তার সমাধান বের করে ফেলেন।

বিয়ের পরদিনের ঘটানাটা মনে পড়ে শাহানার। কথায় কথায় মোফাজ্জল সাহেব তাকে বলেছিলেন, 'দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয় কেন, জানো?'

'কেন হয়?'

পটলচেরা চোখ তুলে সকৌতুকে জানতে চেয়েছিল শাহানা।

'সহনশীলতা, সমঝোতা, সহানুভূতি এইসব জিনিসের অভাব থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু এসবের চেয়েও বড় কারণ কি, জানো?'

'কি?'

'চিরদিন স্বামী-স্ত্রী কাছাকাছি থাকলেও অশান্তি দেখা দেয়। আমার বিশ্বাস, স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর অথবা স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামীর কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যাওয়া দরকার। বছরে অন্তত একবার পরস্পরের কাছ থেকে দু'জনে দূরে থাকলে পরস্পরের প্রতি টান বাড়ে, ভালবাসা উথলে ওঠে।'

স্বামীর কথা শুনে হেসে উঠেছিল শাহানা খিলখিল করে।

'হেসো না। কথাটা সত্যি। আমি ঠিক করেছি প্রতি বছর আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে সরে থাকব। এক বছর তুমি চলে যাবে, এই ধরো দিন পনেরোর জন্য ঢাকায় গিয়ে থাকবে। পরের বছর আমি যাব।'

শাহানা বলেছিল, 'কিন্তু ঢাকায় গিয়ে থাকব কোথায়? ঢাকা কেমন শহর তাই আমি জানি না। আত্মীয় বলতে একমাত্র মামা ছিলেন, তিনিও বাবার সাথে শিকার করতে গিয়ে নৌকাডুবীতে মারা গেছেন। মামী-মা আছেন, তিনি অন্ধ। মামাতো ভাইটিকে জীবনে দেখিনি। তাছাড়া ওদের সাথে আমার কোন যোগাযোগও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, মামা নৌকাডুবীতে মারা যাবার পর মামাতো ভাইটি যে চিঠি পাঠিয়েছিল বাবার কাছে, তাতে তারা পরিষ্কার সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে মামার মৃত্যুর জন্য বাবাই দায়ী। বাবা দশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন মামার কাছ থেকে। সেই টাকা দেবার ভয়ে বাবা নাকি মামাকে ডুবিয়ে মারেন। বাবা এই চিঠি পাবার মাস তিনেক পর মারা যান। দেনাটা পরিশোধ করা হয়নি। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মামাতো ভাইটি সেই টাকার দাবি করে আবার একটা চিঠি লেখে। কিন্তু সে চিঠির উত্তর আমি দিইনি। দশ হাজার টাকা আমি পাব কোথায়। বাবা তো বাড়িটা ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি।'

মোফাজ্জল সাহেব বলেছিলেন, 'শ্বশুরের ঋণ শোধ করা আমারই দায়িত্ব, তাঁর কোন পুত্র সন্তান যখন নেই। ঠিক আছে, আমাদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকীর পরপরই তুমি ঢাকায় পনেরো দিনের জন্যে যাবে। টাকাটা তখনই দেয়া হবে ওদেরকে। সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে নিতে আর কোন অসুবিধে হবে না বোধ হয়।'

'মনে হয় না। ওরা খুব অভাবগ্রস্ত তা ঠিক। দশ হাজার টাকা পেলে খুবই খুশি হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা খুব গোঁয়ার টাইপের। বাবা যে মামার মৃত্যুর জন্য দায়ী এই কথাটা ওরা ভুলবে না।'

'সেক্ষেত্রে···হোটেলে থাকবে তুমি। আজকাল ঢাকার বড় বড় হোটেলে মেয়েরা একা থাকে। দুই সপ্তাহ বৈ তো নয়।'

শাহানা বলেছিল, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

কথাটা ভুলেই গিয়েছিল ওরা। মনে পড়ে গেছে হঠাৎ গতকাল। গতকাল ওদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকী ছিল।

কথাটা মনে পড়ে মোফাজ্জল সাহেবের। কেন যেন, অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং চিন্তিত হয়ে ওঠেন তিনি। কয়েক ঘন্টা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, স্ত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ শলা-পরামর্শ করেন। সবদিক ভেবে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন, আগামীকালই অর্থাৎ আজই শাহানাকে ঢাকায় যেতে হবে। ঢাকায় গিয়ে শাহানা প্রথমে মামী-মা এবং মামাতো ভাইয়ের সাথে দেখা করবে। চেষ্টা করবে সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে তুলতে। সফল হলে ভাল, তা নয়তো শাহানা প্রথম শ্রেণীর কোন হোটেলে উঠবে। পনেরো দিন থাকবে শাহানা ঢাকায়। নগদ টাকা নিয়ে যাবে দুই হাজার। চেক বইও থাকবে সাথে।

আড়াইটার সময় ড্রেসিংরুম থেকে বেরুল শাহানা। নীল পরীর মত দেখাচ্ছে তাকে। নীল শিফনের উপর সোনালী জরির কাজ করা। ম্যাচ করা নীল ব্লাউজ। হাইহিল খড়ম, সেটাও নীল রঙের।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে সোফায় বসল সে। ফোনের রিসিভারটা ক্রেডল থেকে তুলে নিয়ে ডায়াল করল।

এইবার নিয়ে তিনবার ফোন করল শাহানা আজ ঢাকায়। ইকবাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে সে।

এইবার সফল হলো শাহানা, ইকবালকে পাওয়া গেল।

কথা বলতে শুরু করল সে।

এক সময় নক্ হলো দরজায়। চমকে উঠে ঘাড় বাঁকা করে ওয়ালক্লকের দিকে তাকাল শাহানা। দুটো বেজে চল্লিশ মিনিট হয়েছে মাত্র। কে এল আবার এমন সময়?

চাপা স্বরে দ্রুত কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল শাহানা। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'দরজা খোলো, শাহানা।'

মোফাজ্জল সাহেবের কণ্ঠস্বর। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল শাহানা, ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'এখনই চলে এলে যে? আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'স্থির থাকতে পারছিলাম না অফিসে। একা একা কি করছ ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই চলে এলাম। কিন্তু···ছি, শাহানা, ভয় পেলে চলবে কেন?'

শাহানা স্বামীর একটা হাত ধরে বলল, 'না, মানে ঠিক ভয় পাইনি···বোঝোই তো!'

মোফাজ্জল সাহেব জোর করে হাসলেন, 'ভয় করার কিছু নেই, শাহানা। তুমি ঢাকায় গিয়ে আমার কথা ভেবে এতটুকু দুশ্চিন্তা কোরো না। এদিকটা আমি ঠিক সামলে নেব। তুমি মোটেই মন খারাপ করে থাকবে না। যা খুশি তাই করবে তুমি ওখানে। সিনেমায় যাবে, থিয়েটার দেখবে, পার্কে বেড়াবে, মোট কথা দিনগুলো কাটাবে হৈ-চৈ করে, আমোদ-ফুর্তি করে।'

'এই যা!'

'কি হলো?'

শাহানা ঘুরে দাঁড়াল স্বামীর দিকে পিছন ফিরে, 'ব্লাউজের বোতামটা খুলে গেল—লাগিয়ে দাও তো।'

টিপ বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'ভাবছি ঢাকায় তো আমি থাকব না, কে তোমার বোতাম লাগাবে সেখানে?'

শাহানা মুচকি হেসে জবাব দিল, 'লোকের অভাব আছে নাকি ঢাকায়? ব্লাউজের বোতাম লাগাতে হলে লোকটাকে স্বামী হতেই হবে এমন তো কোন কথা

নেই।'

মোফাজ্জল সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন।

কিন্তু শাহানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, 'এ ধরনের কথা আর কখনও বোলো না, ফেরদৌস। ঠাট্টা করেও না। তুমি খুব ভাল করেই জানো কি ধরনের মেয়ে আমি।'

মোফাজ্জল সাহেব স্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় একটু যেন নুয়ে পড়লেন। দুই হাত দিয়ে শাহানার দুই কাঁধ ধরে তাকে নিজের বুকের উপর টেনে নিলেন। শাহানা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'মন খারাপ কোরো না, শাহানা। তোমার মনটা হালকা করার জন্যে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছি আমি। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা কতটুকু তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! যাত্রার সময় এসব কথা থাকল। তোমার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নিয়েছ তো?'

মাথা তুলে তাকাল শাহানা, 'নিয়েছি। প্লেন তো চারটের সময়, না?'

পকেট থেকে সুগন্ধ মাখানো রুমাল বের করে স্ত্রীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ।'

শাহানা বলল, 'যত কথাই বলি তোমার জন্যে মনটা খুব খারাপ থাকবে। মাথা খাও আমার, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কোরো। আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি ঢাকায় নিরাপদেই থাকব।'

মোফাজ্জল সাহেব পকেট থেকে বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বের করে লাইটার জ্বাললেন। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, শাহানা। পরস্পরের জন্য দুশ্চিন্তা আমরা করবই। যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধান বের করার মত বুদ্ধি আমাদের আছে, তাই না? সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। আমি? আমি খুব ফুর্তির মধ্যেই সময় কাটাব। ক্লাবে যাব, পরিমিত ড্রিঙ্ক করব, সন্ধ্যার আগে টেবিল-টেনিস খেলব, রাতে শুয়ে শুয়ে হ্যাডলি চেজের থ্রিলার পড়ব। কথা দাও, তুমিও ঢাকায় আমোদ-ফুর্তি করবে।'

'কথা দিলাম। কিন্তু, ফেরদৌস, খুব সাবধানে থেকো, লক্ষ্মী। বেশি ড্রিঙ্ক কোরো না, কেমন? গাড়ি চালাবার সময় তোমার জ্ঞান থাকে না। মাথা খাবে, স্পীড্ যদি চল্লিশের ওপরে যায়!'

মোফাজ্জল সাহেব হাসলেন, 'এই ক'দিন তোমাকে কাছে পাব না—এটাই দুঃখ। যাক, দেখতে দেখতে কেটে যাবে দিনগুলো।'

শাহানা স্বামীর শার্টের একটা বোতাম আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, 'মামার বাড়ি বা হোটেলে যেখানেই থাকি, ফোন করব তোমাকে আজই। অফিসে থেকো সন্ধ্যার সময়টা।'

মোফাজ্জল সাহেব স্ত্রীর গালে আলতোভাবে টোকা মারলেন। বললেন, 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ কিছু মনে হয়নি তোমার?'

'কি মনে হবে?'

'আজ তোমার রূপ যেন আগুনের মত জ্বলছে। বিশ্বাস করো…।'

শাহানা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আবার তার বুকে মুখ লুকাল।

ঢাকা এয়ারপোর্টের উপরে মেঘমুক্ত, নির্মল আকাশ। পশ্চিম দিগন্ত রেখা ছুঁই-ছুঁই করছে প্রকাণ্ড লাল সূর্য। পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। আকাশের সুদূর প্রান্তে ক্ষুদ্র চকচকে রূপালী পাখির মত দেখা গেল একটি বিমানকে। ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে সেটা।

কোমর সমান রেলিং দিয়ে ঘেরা টারমাকের বাইরে, এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল নারী-পুরুষ। এরা সবাই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছে। এদের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ী ইকবাল চৌধুরীও রয়েছে। অ্যাশ কালারের ট্রপিক্যাল স্যুট পরনে তার। চেহারা তীক্ষ্ণ। লম্বায় প্রায় ছয়ফুট। ভীড়ের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পায়চারি করছে সে। বিষণ্ণ এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। আধঘন্টা আগে সে এক হোটেলের বারে বসে মদ খেয়েছে। চোখ দুটো তাই লালচে। হাতের ৫৫৫ ফিলটার টিপড্ সিগারেটে টান দিচ্ছে সে ঘন ঘন।

চট্টগ্রাম থেকে আগত বিমানটি ল্যাণ্ড করল। টারমাক ধরে ছুটতে ছুটতে একসময় থেমে দাঁড়াল সেটা। টেকনিশিয়ান এবং কর্মীরা এগোল। সিঁড়ি লাগানো হলো। খুলে গেল বিমানের পেটের কাছের দরজা। এয়ারহোস্টেস সহাস্যে বাইরে বেরিয়ে এল। একপাশে দাঁড়াল সে। দরজার মুখে এবার দেখা গেল যাত্রীদের। একে একে নামছে সবাই। প্রথম চার পাঁচজনের মধ্যেই দেখা গেল মিসেস ফেরদৌস অর্থাৎ শাহানাকে। নীল পরীর মত দেখাচ্ছে তাকে। সন্ধানী চোখে তাকাল সে অপেক্ষারত ভীড়টার দিকে। ইকবাল চৌধুরীকে দেখেই চিনল সে। মুখের হাসিটা বিস্তৃত হলো আরও। হাত নাড়ল সে।

ইকবাল চৌধুরী পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাথরের মূর্তি যেন একটা। ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠল তার। শাহানাকে দেখা মাত্র তার ভিতর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মাত্র বছর দেড়েক আগের কথা। শাহানা ছিল ইকবাল চৌধুরীর জীবন-মরণ। প্রাণ দিয়ে ভালবাসত সে ওকে। তার ব্যক্তিগত চরিত্র যাই হোক, শাহানার প্রতি ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। কিন্তু শাহানা তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইচ্ছা করলে জোর করে শাহানাকে বিয়ে করতে পারত ইকবাল চৌধুরী। সে ক্ষমতা তার ছিল। চট্টগ্রাম শহরের অভিজাত মহলে প্লেবয় এবং বেপরোয়া বলে খ্যাতি ছিল তার। কিন্তু শাহানাকে সে এমন গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে যে শাহানার কোন ক্ষতি করার কথা সে ভাবতেই পারেনি। জোর করে আর যাই হোক, ভালবাসা আদায় করা যায় না। এটা ইকবাল চৌধুরী বুঝেছিল। শাহানার প্রতি নির্ভেজাল ভালবাসা ছিল বলেই সে চেয়েছিল, ও সুখী হোক। অন্য কাউকে বিয়ে করে যদি ও সুখী হয় তবে তাই হোক, এই ভেবেছিল সে। শাহানা তাকে বলেছিল, 'তোমাকে আমি কোনদিন ভালবাসিনি। আমি যাকে ভালবাসি তাকেই বিয়ে করব।'

ইকবাল চৌধুরী বলেছিল, 'বেশ। তাই হোক। তুমি সুখী হও!'

মাত্র এই ক'টি কথা বলে চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করে সে। যোগ দেয় বাবার ইনডেন্টিং ব্যবসাতে। তার বাবা আশফাক চৌধুরী অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছিলেন ছেলেকে কাজ-কারবারের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অবসর নিতে। কিন্তু ইকবাল নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিতে চায়নি। প্রচুর টাকা ওড়াত সে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করত, মদ খেত এবং জুয়া খেলত। ব্যবসায় মন দেবার কথা সে কোনদিন ভাবেনি। কিন্তু প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সে সোজা চলে আসে ঢাকায়। এক মাসের মধ্যে বাবার কাছ থেকে সব দায়িত্ব বুঝে নেয়। আশফাক চৌধুরী ছেলের সুমতি ফিরেছে দেখে খুশি হন, সিদ্ধান্ত নেন এই সুযোগে হজব্রত পালন করবেন। ছেলেকে প্রচুর উপদেশ দিয়ে তিনি হজ করতে চলে যান। এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মক্কা শরীফেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইকবাল ব্যবসা করতে গিয়ে দেখতে পায় নিজের ইচ্ছা এবং রুচি মত বেঁচে থাকতে হলে যে পরিমাণ টাকা তার দরকার তা ব্যবসা থেকে আসছে না। অনেক ভেবেচিন্তে প্রচুর টাকা রোজগারের রাস্তা বের করে সে একটা। মাস পাঁচেকের মধ্যে অগাধ টাকার মালিক বনে যায়। বর্তমানে সে দেশের যুবক-ধনীদের মধ্যে অন্যতম একজন। সকাল নেই দুপুর নেই প্রচুর বিদেশী মদ খায় সে; বড় বড় হোটেলে রুম ভাড়া নিয়ে থাকে। বাড়ি আছে বটে কিন্তু সেখানে তাকে কোনদিনই পাওয়া যায় না। নিয়মিত ফ্ল্যাশ খেলে এবং প্রচুর হারে। অসংখ্য বান্ধবী, কলগার্লের সাথে যোগাযোগ তার। তাদের পিছনে পানির মত টাকা খরচ করে। তাদেরকে নিয়ে হৈ-চৈ করে অভিজাত হোটেলে।

কিন্তু শাহানাকে আজও ভুলতে পারেনি ইকবাল চৌধুরী। আজও শাহানাকে সে ভালবাসে। তার দৃষ্টিতে শাহানার সাথে আর কারও তুলনা হয় না। যে-সব মেয়েদের সঙ্গে সে মেলামেশা করে তারাও সুন্দরী, কিন্তু তাদেরকে ভালবাসে না ইকবাল চৌধুরী, তাদের সাথে নিতান্তই স্ফূর্তির এবং টাকার সম্পর্ক। ভাল সে এখনও শাহানাকেই বাসে।

ইকবাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জীবনে সে বিয়ে করবে না। শাহানা তাকে ভুলে গেলেও সে শাহানাকে ভুলবে না, চিরকাল তাকে মনে মনে ভালবেসে যাবে। শাহানা যদি কোনদিন কোন ব্যাপারে বিপদে পড়ে সাহায্য চায়, সে তার সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করবে।

সেজন্যেই শাহানার ফোন পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু ফোনে কথা বলার সময় সে বুঝতে পেরেছিল শাহানা বিপদে পড়েনি। বেশ সুখেই আছে সে। কিন্তু একটা পরিবর্তন লক্ষ করে সে ফোনে কথা বলার সময়। শাহানাকে খুব ভাল করেই চেনে সে। শান্ত, ভাবাবেগবর্জিত, ভদ্র একটি মেয়ে সে। কিন্তু ফোনে কথা বলার সময় পরিবর্তনটা লক্ষ করে ইকবাল। শাহানা কেমন যেন বদলে গেছে বলে মনে হয়েছে তার। খিলখিল করে হেসেছে সে ফোনে কথা বলার সময়। আবদারের সুরে কথা বলেছে। ইঙ্গিত দিয়েছে, ঢাকায় এসে সে ইকবালের সঙ্গ পেতে চায়, ঘনিষ্ঠ হতে চায়!

ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে ইকবালকে। শাহানা তরল প্রকৃতির মেয়ে ছিল না কোনদিন। হঠাৎ এমন বদলে গেল কিভাবে ও?

সশরীরে শাহানাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে পরিবর্তনটুকু পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করল ইকবাল। আশ্চর্য বটে! সব কিছুই সম্পূর্ণ বদলে গেছে শাহানার। দৃঢ় পদক্ষেপে, ধীর ভঙ্গিতে হাঁটত শাহানা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার হাঁটা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সে। কিশোরী মেয়ের মত চঞ্চল, অস্থির পায়ে প্রায় ছুটে আসছে শাহানা। হাসিটা ঠোঁটেই থাকত। কিন্তু এখন সারা মুখে ছড়ানো রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে ছিল স্থিরতা, গাম্ভীর্য। তার বদলে সেই চোখেই লঘু কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। পোশাকেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পিঠ-কাটা অতি ক্ষুদ্র ব্লাউজ শাহানার গায়ে, দেহ-আবৃত করার চেয়ে অনাবৃতই করেছে বেশি।

ইকবাল বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শাহানার এই আমূল পরিবর্তন বিশ্বাস্য ঠেকছে না তার চোখে।

মুখোমুখি এসে দাঁড়াল শাহানা। সকৌতুকে পা থেকে মাথা অবধি দেখে মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ভুরু নাচাল, ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন, 'খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে! চিনতে পারছ না নাকি?'

ইকবাল বলল, 'অনেক বদলে গেছ তুমি, শাহানা। না চিনতে পারারই কথা। তা একা কেন? তোমার স্বামী…?'

বাঁ হাতটা শূন্যে নেড়ে শাহানা ঠোঁট বাঁকাল, 'তার সময় কোথায়? হি অল্‌সো হ্যাজ দ্য মডার্ন আইডিয়া দ্যাট ম্যারেড কাপলস্ শ্যুড স্পেণ্ড দেয়ার ভ্যাকেশনস্ সেপ্যারেট্‌লি। দিন পনেরোর জন্যে প্র্যাক্‌টিক্যালি তালাক দিয়েছে সে আমাকে। আমি…কি বলব—অল এ্যালোন্ ইন এ স্ট্রেঞ্জ প্লেস!'

ইকবাল বলল, 'কোথায় উঠবে? কোন আত্মীয়ের বাড়িতে?'

শাহানা বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, চলো লাউঞ্জে গিয়ে বসি। হ্যাঁ, মামার বাড়িতে উঠব। কিন্তু ওখানে বোধহয় থাকতে পারব না। চাইও না থাকতে। ঢাকায় ঘরকুনো হয়ে থাকতে আসিনি। বুঝতেই পারছ, বিবাহিত মেয়েরা জীবনে এরকম সুযোগ সচরাচর পায় না। সুযোগ যখন এসেছে, তার সদ্ব্যবহার করব না কেন?'

শাহানার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ইকবাল বলল, 'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।'

শাহানা অবাক কণ্ঠে বলে উঠল, 'মাই গড্, ইকবাল! তুমি দেখছি ভোঁতা হয়ে গেছ। সুযোগের সদ্ব্যবহার করব একথার মানে বুঝলে না?'

ইকবাল উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে।

'বুঝিয়ে বলব?' আড়চোখে তাকাল শাহানা ইকবালের মুখের দিকে, 'ঢাকায় এর আগে কখনও আসিনি আমি। এই প্রথম। থাকব বড় কোন হোটেলে। কিংবা, তোমার কোন আপত্তি না থাকলে, তোমার বাড়িতেই উঠব। দর্শনীয় সব জায়গা দেখতে হবে আমাকে। মনের যতগুলো ইচ্ছা আছে সব পূরণ করব। মনের ইচ্ছা মানে, অবচেতন মনের গোপন ইচ্ছাগুলোর কথা বলছি আমি। শুনেছি ঢাকার মেয়েরা নাইট ক্লাবে রাতও কাটায়। কেউ কেউ নাকি মদ-গাঁজা খায়, জুয়া খেলে।

আমিও এই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। স্বামী অর্থাৎ শাসনকর্তা যখন নেই—ভয় কিসের? কথা হলো, আমাকে তুমি কতটুকু সাহায্য করতে পারো তাই বলো, ইকবাল। ওহ্ গড! আসল কথাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি! বিয়ে করেছ নিশ্চয়ই?'

ইকবাল অবিশ্বাসভরা চোখে দেখছিল শাহানাকে। মাথা নেড়ে যন্ত্রের মত বলল সে, 'না।'

আনন্দে হেসে উঠল শাহানা, 'ফাইন! তবে তো কোন সমস্যাই নেই। থাকো কোথায় তুমি? তোমার বাড়িতে না হয়…।'

ইকবাল বলল, 'না।'

তার কণ্ঠস্বর একটু কঠিনই শোনাল।

'কোন অসুবিধে আছে বুঝি? সেক্ষেত্রে, হোটেলেই উঠব আমি। কিন্তু ইকবাল, তোমার সঙ্গ কিন্তু চাই-ই আমার—প্লীজ! অচেনা শহর, একা—শখ-সাধ মেটাতে হলে তোমার মত একজন বন্ধু দরকার আমার…।'

লাউঞ্জে গিয়ে সোফায় বসল ওরা। চারদিকে নর-নারীর সমাগম। ঢুকছে, বেরুচ্ছে, বসছে, কথা বলছে। পুরুষদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হলো, লাউঞ্জে শাহানা প্রবেশ করার সাথে সাথে। অসাধারণ সুন্দরী ও, তার উপর নিজের রূপ শাড়ি-ব্লাউজের বাইরে প্রকাশ করার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই ওর।

শাহানা বলল, 'ব্যাগ-ব্যাগেজগুলো কাউন্টারে আসতে মিনিট পনেরো সময় লাগবে। ওগুলো নিয়ে আমি মামার বাড়ি যাব। লক্ষ্মীবাজার—চেনো তুমি এলাকাটা? ওখানেই মামার বাড়ি। মিনিট কয়েক থাকব ওখানে মাত্র—তারপর হোটেলে উঠব। থাকছ তো আমার সাথে?'

'হোটেলে?'

শাহানা উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, 'আমার সাথে হোটেলে তুমি থাকলে তো কথাই নেই। ইচ্ছা করলে, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নাম লেখাতে পারি আমরা হোটেলে…'

এই প্রথম ইকবাল রীতিমত রূঢ় গলায় কথা বলল, 'তুমি অনেক নিচে নেমে গেছ, শাহানা। এতটা কল্পনা করা যায় না। তুমি বিবাহিতা, স্বামী সাথে নেই বলে এমন কুৎসিত চিন্তা-ভাবনা করবে—ছি!'

এতটুকু লজ্জিত হলো না শাহানা সকৌতুকে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার বলো তো ইকবাল! আমার তো মনে হচ্ছে, তুমিই পুরোপুরি বদলে গেছ! আজকাল নামাজ-টামাজও ধরেছ নাকি?'

ইকবাল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। শাহানার ব্যবহারে, কথাবার্তায় সে যে শুধু স্তম্ভিত হয়েছে তাই নয়, মানসিক আঘাতও পেয়েছে ভীষণ রকম।

হঠাৎ শাহানার তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সে। 'পরিষ্কার করে একটা কথার জবাব দাও আমাকে, ইকবাল। তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে চাও না?'

ইকবাল শাহানার চোখে চোখ রেখে অস্ফুটে জানতে চাইল, 'কি সাহায্য চাও তুমি?'

'হোটেলে উঠব আমি। এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। শহর দেখব, নাইট ক্লাবে যাব,মদ খাব, জুয়া খেলব—এইসব কাজে তোমাকে সঙ্গী হিসেবে দরকার আমার। তুমি যদি না চাও—থাক। ঢাকা শহর চিনি না বটে কিন্তু চিনে নিতে কতক্ষণ? দেখতে আমি আগের চেয়েও ভাল হয়েছি, আমার স্বামীর বন্ধুরা বলে কথাটা। তা যদি সত্যি হয়, পুরুষ বন্ধু যোগাড় করে নিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমার। তোমার ওপর আমি জোর খাটাতে চাই না।'

ইকবাল ভেবে চিন্তে বলল, 'কিন্তু আমি খুব ঝামেলায় আছি ইদানীং, শাহানা। ব্যবসার ব্যাপারে বিপদে পড়েছি। এই মুহূর্তে জরুরী একটা কাজে এক জায়গায় যাবার কথা আমার। তবু, ঠিক আছে, যতটুকু সম্ভব তোমাকে সাহায্য করব আমি। সাহায্য করব, মানে—কথাটার ভুল অর্থ কোরো না। তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আজও তোমাকে আমি ভালবাসি, শাহানা।'

'থ্যাঙ্কিউ, ইকবাল!'

ইকবাল বলে চলল, 'তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক। তোমার ভাব-গতিক দেখে ভয় হচ্ছে আমার। এটা দেশের রাজধানী—এখানের পরিবেশ অন্যরকম। তুমি সুন্দরী এবং একা—পদে পদে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। একদল লোক আছে যারা এই শহরে ওঁৎ পেতে আছে সব সময়। তোমার মত মেয়েদেরকে তারা প্রথম সুযোগেই কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। সুতরাং খুব সাবধান, শাহানা। তুমি যেভাবে চলাফেরা করতে চাইছ তা সম্ভব নয়…।'

'দেখো ইকবাল, উপদেশ দিয়ো না আমাকে। অকারণে ভয় দেখালেই ভয় পাওয়ার পাত্রী নই আমি। ঢাকায় এর আগে আসিনি বটে কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঢাকা সম্পর্কে কোন খবরই আমি রাখি না। ঢাকার নাইট-ক্লাবগুলোয় মেয়েরা যায়—অস্বীকার করতে পারো? বার-গুলোয় মেয়েরাও মদ খায়—অস্বীকার করতে পারো?'

'অস্বীকার তো করছি না। কিন্তু ওই ধরনের কাজ যারা করে তারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। তাছাড়া তাদের মান-ইজ্জতের ভয় নেই। তাদের পিছনে তেমন ক্ষমতাবান লোকজন থাকে…।'

শাহানা বলে উঠল, 'নগণ্য সংখ্যকদের মধ্যে আমি একজন হলে ক্ষতি কি? ক্ষমতাবান লোকজন—সেইরকম লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেব আমি। তাছাড়া তুমিই বা কম কিসে? শুনেছি, বিরাট ধনী ব্যবসায়ী এখন তুমি। সমাজের সর্বস্তরে তোমার অবাধ যাতায়াত।'

'মিথ্যে শোনোনি। কিন্তু আমি তোমাকে নষ্ট হতে দেখতে চাই না।'

শাহানা সহজ গলাতেই বলে উঠল, 'আমি নষ্ট হতে যাচ্ছি একথা কে বলল তোমাকে? এমন গেঁয়োদের মত কথা বলছ—ভাবাই যায় না। পনেরো দিন ছুটি কাটাতে এসেছি—আমোদ-ফূর্তি করব না? বিবাহিতা বটে—কিন্তু আমি তো আর ঘোমটা দেয়া বউ নই। স্বামী যখন একা ছাড়তে পেরেছে তখন নিশ্চয়ই সে মনে মনে ভাল করেই জানে, পুরুষ মানুষদের সঙ্গ পাবার জন্য সব সুযোগই নেব আমি।

আর যাই হোক, বোকা নয় সে। আশ্চর্য হচ্ছি এই কথা ভেবে যে আমার স্বামী যে স্বাধীনতা দিতে পেরেছে আমাকে, তুমি আমার স্বামী না হয়েও সে-স্বাধীনতা দিতে রাজি নও। এতটা রক্ষণশীল তুমি তা আমার জানা ছিল না।'

ইকবাল বলল, 'তোমার প্রতি তোমার স্বামীর কতটুকু ভালবাসা আছে সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে, শাহানা। একটা প্রশ্ন করছি, সত্যি কথা বলবে, তোমাদের মধ্যে কি ঝগড়া হয়েছে?'

'কী আশ্চর্য! ঝগড়া হবে কেন! তুমি একটা বোরিং…!'

লাউঞ্জে ধীরে ধীরে বাড়ছে ভিড়। রিস্টওয়াচ দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ইকবাল। তাকাল দরজার দিকে। ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতর।

গত কয়েকদিন হলো, ছায়ার মত অনুসরণ করছে ইকবালকে দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক লোক। প্রতিবার পোশাক এবং চেহারা বদল করে লোকটা, কিন্তু ইকবাল তাকে দেখলেই চিনতে পারে। কে লোকটা? পুলিশ বিভাগের ডিটেকটিভ? কখনও গাড়ি নিয়ে, কখনও ভিড়ের মধ্যে, কখনও বারের ভিতর কোণার টেবিলে বসে লোকটা তার উপর নজর রাখছে। কখনও সে ছদ্মবেশ নেয় শিখ ব্যবসায়ীর, কখনও কালো শেরোয়ানী পরে…। এইমাত্র ইকবাল চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাতেই দেখল সেই লোকটা কালো স্যুট পরে তার দিকে চেয়ে আছে গভীর দৃষ্টিতে, তার চোখ দুটোয় যেন যাদু আছে, অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পায় তাকালেই…। চোখাচোখি হতেই স্যাঁৎ করে সরে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল ইকবাল, 'চলো, দেখে আসি তোমার মালপত্তর কাউন্টারে এসেছে কিনা। জরুরী কাজের কথা বলছিলাম না? দেরী তো হয়েই গেছে। তবু না গেলেই নয়।'

শাহানাও উঠল, 'কিন্তু আমাকে…।'

'তোমার মামার বাড়িতে পৌঁছে দেব, চলো।'

শাহানা বলল, 'তারপর? মামার বাড়িতে দশ মিনিটের বেশি থাকব না আমি। হোটেলে…।'

'তুমি অপেক্ষা করবে, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরব তোমার মামার বাড়িতে। ওখান থেকে হোটেলে যাব।'

শাহানা হাই-হিলের শব্দ তুলে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'গুড। তবে তোমার অনেক সময় নষ্ট করছি, তাই না? কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে আমি বঞ্চিত করব না। তুমি কতটুকু হজম করতে পারবে সেটাই হলো প্রশ্ন।'

নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল শব্দ করে শাহানা। লাউঞ্জে উপস্থিত পুরুষের দল পিছন থেকে লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। সকলেই বুঝতে পারছে, যুবতী যে-ই হোক, দেহ-প্রদর্শন করার প্রচণ্ড একটা ইচ্ছা কাজ করছে তার মধ্যে।

দুই

পুরানো শহরের নোংরা একটা গলি। গলি নয়, উপগলি বলাই ভাল। গা ঘেঁষাঘেঁষি

করে ছোট ছোট বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিল ভাঙা, প্লাস্টার-ওঠা, শ্যাওলা-ধরা। গলির ড্রেনটাই ডাস্টবিনের কাজে ব্যবহার করা হয়। তরি-তরকারির খোসা, বাচ্চাদের মল, ছেঁড়া কাগজ, নোংরা কাপড়ের টুকরো—স্তূপীকৃত হয়ে আছে ড্রেনের উপর। হাজার হাজার মাছির সমাবেশ চারদিকে। উলঙ্গ-প্রায় বাচ্চাদের চিৎকার, কান্না, ছুটোছুটির আওয়াজে কান পাতা দায়। উপগলিটার শেষ মাথায় ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। আর সব বাড়ির দরজা খোলা থাকলেও, ওই বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে।

দেড় কাঠা জমির উপর বাড়িটা। ছোট ছোট দু'টি মাত্র কামরা। কামরা দুটোয় আসবাবপত্র একেবারে নেই বললেই চলে। বাড়ির কর্তা মুনীর হোসেন কেরানীর চাকরি করতেন। রিটায়ার করেছিলেন তিনি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি থেকে তিনি মোট হাজার দশেক টাকা পেয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল, দশ হাজার টাকা দিয়ে ছোটখাট একটা ব্যবসা করে ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শেখাবেন, মানুষ করবেন। কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। টাকাটা তিনি ভগ্নীপতি আজিজুল হককে ধার দিয়েছিলেন। সে টাকা ফিরে পাবার আগেই হকের সাথে শিকার করতে গিয়ে নৌকাডুবীতে মারা যান।

বছর তিনেক হলো মারা গেছেন মুনীর সাহেব। তখন তার বড় ছেলে বুলবুল ক্লাস নাইনের ছাত্র। কতই বা বয়েস, বড়জোর সতেরো। অর্থাৎ বুলবুলের বর্তমান বয়স একুশ।

মুনীর সাহেবের মৃত্যু গোটা সংসারটাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। বুলবুলের প্রৌঢ়া জননী আগেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি নিঃশব্দে কেঁদেছেন শুধু। শোক প্রকাশ করা ছাড়া করার কিছু ছিল না তাঁর। বুলবুল ছাড়াও আরও দুই সন্তানের জননী তিনি। তাদের একজনের বয়স সাত, অপরজনের দশ। সবাই স্কুলের ছাত্র। জননীর সামান্য যে গহনা ছিল তাই বিক্রি করে বুলবুল পড়াশোনা চালিয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে তার কাঁধে। কাগজের ঠোঙা তৈরি করে মুদীর দোকানগুলোয় বিক্রি করে যে দু'পয়সা রোজগার করে সে, তাই দিয়ে সংসার চালাতে থাকে। গত বছর বুলবুল ম্যাট্রিক পাস করেছে। অনেক চেষ্টা-তদবির করে বাবারই অফিসে একটা কেরানীর চাকরি যোগাড় করেছে সে। রাত্রে কলেজেও যায়। ছোট ভাইগুলোর পড়াশোনার খরচও সে বহন করছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। বুলবুল খানিক আগে ফিরেছে অফিস থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রামও নেয়নি সে, ছোট ভাইদেরকে পড়াতে বসেছে।

নড়বড়ে একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন অন্ধ জননী। চোখ দুটো বন্ধ তার। কিন্তু তিনি যে ঘুমাননি তা বোঝা যাচ্ছে তার ঠোঁট জোড়া নড়ছে দেখে। বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন তিনি।

বুলবুল ছোট ভাইটিকে ধমক মারছিল, 'পিটু, কাঁদবি না বলে দিচ্ছি। স্কুলে তো যাসইনি, আর অঙ্কগুলোও করে রাখিসনি। লেখাপড়া করতে ভাল লাগে না বুঝি?'

অন্ধ জননী চৌকির উপর থেকে বললেন, 'দুপুরে আজ ও খায়নি। ওকে একটু

বোঝা তো বাবা!'

'দুপুরে খায়নি? কেন মা?'

প্রৌঢ়া চৌকির উপর উঠে বসলেন, 'শুধু ডাল দিয়ে ভাত—বলে, আমি খেতে পারব না!'

বুলবুল মেঝের মাদুরের উপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে হেলান দেয়, কথা বলে না। পিটুর দুই চোখ পানিতে ভরে যায়। মাথাটা নামাতে নামাতে একেবারে খোলা বইটার কাছে নামিয়ে ফেলে সে। লজ্জায়, অভিমানে মাথা তুলতে পারে না।

আড়চোখে মেজো ভাইটি দেখে পিটুকে, বুড়ো আঙুলের নখ্ খুঁটতে থাকে সে। পিটুকে উপর রাগ হয় তার, মায়াও হয়।

'মাসের আজ বাইশ তারিখ। টাকা পড়ে আছে মাত্র এগারোটা। চাল কেনাই হবে না, বাজার হবে কোত্থেকে?' বুলবুল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কথাটা বলে।

অন্ধ জননী বলেন, 'তোকে সে কথা ভাবতে হবে না। চললে চলবে, না চললে উপোষ থাকবে সবাই। যে শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেতে পারবে না, সে খাবে না।'

এটা রাগের কথা। ছোট ছেলে পিটুর প্রতি মায়ের স্নেহ-ভালবাসা সবচেয়ে বেশি; সবাইকে বোঝানো যায়, কিন্তু পিটুকে বোঝানো যায় না। প্রায়ই সে এই রকম জেদ ধরে। মায়ের মন, দুঃখ পান তিনি।

কিন্তু বড় ছেলের কথাটাও তাঁকে ভাবতে হয়। হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে যা রোজগার করে তা দিয়ে সংসার চলে না। ওরই বা কত বয়েস। ওর বাবা বেঁচে থাকলে ও-ই কত বায়না ধরত, এটা খাব না ওটা খাব না বলত।

প্রৌঢ়া হঠাৎ বলেন, 'তোকে এত করে বলছি, আর একটা চিঠি লেখ শাহানাকে, কিন্তু তুই কেন যে···।'

বুলবুল বিরক্তির সাথে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'মা, ওসব কথা আমাকে বোলো না। চিঠি লিখলেই বা কি হবে? ভুল করেছিলেম বাবা নিজেই। ওই দশ হাজার টাকাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। কেন তিনি ফুফাকে ধার দিয়েছিলেন?'

'বিপদ পড়লে ধার মানুষ মানুষকে দেয় না? কে জানত ওই টাকা দিতে হবে বলে তোর ফুফা তোর বাবাকে ষড়যন্ত্র করে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে!'

'মা আবার তুমি সেই কথা তুলছ! ফুফা বাবাকে ডুবিয়ে মেরেছে তার কোন প্রমাণ নেই। আর যদি তাই সত্যি হয়ে থাকে, তাহলেও এখন আর কিছু করার নেই আমাদের। ফুফা বেঁচে থাকলে অন্তত টাকাটা ফেরত পাবার চেষ্টা করা যেত···।'

'কিন্তু তার মেয়ে তো বেঁচে আছে। শাহানা বেশ ভাল পয়সাই রোজগার করত, তারপর তার বিয়েও হয়েছে বড়লোকের সাথে। একটা চিঠি লিখে দেখই না···।'

'চিঠি কি লিখিনি? কি উত্তর দিয়েছিল মনে নেই তোমার?'

অন্ধ জননী বললেন, 'তখন শাহানার বিয়ে হয়নি। মেয়েছেলে, অত টাকা তখন

পাবেই বা কোথায়? শুনেছি, ওর স্বামী মস্ত বড়লোক। তুই শাহানার স্বামীকে একটা চিঠি লেখ।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মা? দশ হাজার টাকা—চাট্টিখানি কথা নাকি! শ্বশুরের ঋণ জামাই কেন শোধ করতে যাবে? যত বড়লোকই সে হোক…'

দরজার কড়া নড়ে উঠতে বুলবুল কথাটা শেষ করতে পারল না। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করার চেষ্টা করল সে, কে আসতে পারে? উঠে দাঁড়িয়ে স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলাতে গলাতে মেজো ভাইটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসে আছিস কেন। পড়াটা মুখস্থ কর, আমি আসছি।'

গায়ে শার্টটা গলিয়ে দরজা পেরিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল বুলবুল। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। এটা ওর নিজের কামরা। পিটুকে নিয়ে রাত্রে শোয় ও। একটি চৌকি, একটি টেবিল, একটি চেয়ার, একটি বুক-কেস এই হলো আসবাবপত্র। দরজা খুলে উঠনে নামল ও। বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়াল, খিল খুলতে খুলতে জানতে চাইল, 'কে?'

দরজার কবাট উন্মুক্ত হতেই আবছা আলোয় বুলবুল নীল শাড়ি পরা অপূর্ব সুন্দরী একটি যুবতীকে দেখতে পেল। কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ও। মেয়েটি হাসছে, যেন কতদিনের পরিচয় তার সাথে।

'মাফ করবেন, কাকে চান…মানে…।'

যুবতী সহাস্যে বলল, 'এটা মুনীর হোসেন সাহেবের বাড়ি না?'

বুলবুল বলল, 'জ্বী। আমি তাঁর ছেলে…।'

'বুলবুল! তার মানে তুমি বুলবুল—মাগো! আমি ভেবেছিলাম তুমি ছোট ছেলে হবে, কিন্তু তুমি দেখছি রীতিমত মর্দ-যোয়ান!'

যুবতী ঘাড় বাঁকা করে পাশে তাকাল, কার উদ্দেশ্যে যেন বলল, 'তুমি যাও। আধঘন্টা পর আসছ আবার, তাই না?'

বুলবুল দরজার বাইরে মাথাটা গলিয়ে অন্ধকারে দেখল একজন লোক ফিরে যাচ্ছে, চেহারাটা ভাল করে লক্ষ করার সুযোগ হলো না তার। যুবতী তাকাল ওর দিকে। বলল, 'আমাকে তুমি চিনতে পারোনি, বুলবুল। চেনবার কথাও না। আমি শাহানা।'

কথা শেষ করে হঠাৎ শাহানা পা বাড়িয়ে দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। বুলবুল একপাশে সরে পথ করে দেবার সময়ও পেল না। সেন্টের মিষ্টি গন্ধ পেল সে। প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা লেগে গেল দু'জনের।

লজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুলবুল। কিন্তু শাহানার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মধুর শব্দে হেসে উঠল সে, বুলবুলের একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল, বলল, 'কই, চলো। মামী-মা কোথায়?'

সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে যেন বুলবুলের। এমন অপূর্ব সুন্দরী একটি যুবতীর শরীরের স্পর্শ পেয়ে কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে সে। শাহানার কথায় সংবিৎ ফিরল তার। বলল, 'আসুন!'

'আপনি কেন, তুমি বললেই তো হয়! লম্বা-চওড়া তাগড়া পুরুষ মানুষ

তুমি…।'

নিজের কথায় আবার হেসে উঠল শাহানা। পা বাড়াল বুলবুলের সাথে সাথে।

সামনের কামরায় ঢুকে শাহানা দাঁড়াল। বুলবুল দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা!'

'কে এসেছে রে, বুলবুল?' অন্ধ জননী চৌকির উপর থেকে জানতে চাইলেন।

বুলবুল দরজা পেরিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল, শাহানা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে, বলল, 'মামী-মা!'

'কে?' প্রৌঢ়া যেন চমকে উঠলেন।

শাহানা হাই-হিলের খটখট শব্দ তুলে চৌকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ভ্যানিটি ব্যাগটা রাখল চৌকির উপর, দুই হাত দিয়ে মামী-মার পা ছুঁয়ে সালাম করল, বলল, 'মামী-মা, আমি শাহানা।'

অন্ধ প্রৌঢ়া নিরুত্তর। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন তিনি।

শাহানা বসল চৌকির উপর। বলল, 'মামী-মা, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

প্রৌঢ়া এতটুকু নড়লেন না। তাঁর ঠোঁট জোড়া নড়ল শুধু কথা বলার সময়। একটি একটি করে শব্দ উচ্চারণ করলেন তিনি। গলার স্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল, 'চিনতে পারব না কেন? তা এতদিন পর কি মনে করে এসেছ তুমি? একাই এসেছ, না স্বামীকে নিয়ে এসেছ?'

শাহানা মামী-মার হাত দুটো ধরে বলল, 'একাই এসেছি মামী-মা। আপনার জামাইয়ের সময় কোথায়? ওই পাঠাল আমাকে। আত্মীয়স্বজন বলতে আমার তো আর কেউ নেই আপনারা ছাড়া। তাই এলাম। সম্পর্কটা তো প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছিল…।'

প্রৌঢ়া হাত দুটো নিজের কোলের উপর টেনে নিলেন, 'সম্পর্ক আর থাকে কিভাবে! তোমার বাবাই তো শেষ করে দিয়ে গেছে।'

'মা, ওসব কথা থাক না…।'

বুলবুল মেঝেতে দাঁড়িয়ে কেন যেন ঘামছিল, এতক্ষণে মুখ খুলল সে। পিটু এবং লিটু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে শাহানার দিকে। কারও চোখে পলক পড়ছে না। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি দেখছে যেন তারা।

শাহানা হাসতে হাসতেই বলে উঠল, 'বাবাও বেঁচে নেই, মামাও বেঁচে নেই। তাদের কথা তুলে আর লাভ কি, মামী-মা! বাবা কি করেছিলেন, না করেছিলেন আমি জানিও না। বাবা যদি কোন দোষ করেও থাকেন, আপনি আমাকে সেজন্যে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না।'

অন্ধ প্রৌঢ়া মুখ তুলে কি যেন ভাবছেন। মৃত স্বামীর কথা ভাবছেন হয়তো, মানসপটে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন স্বামীর চেহারা। দু'চোখ ভরা পানি নিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার বাবাকে কোনদিনই ভাল লোক বলে মনে হয়নি আমার। দয়া-মায়া ছিল না তার। আমি দেখিনি বটে কিন্তু মনে মনে ঠিক জানি, বুলবুলের বাবাকে সে ডুবিয়ে মেরেছে…।'

'মা!' বুলবুল চেঁচিয়ে উঠল।

প্রৌঢ়া হঠাৎ খেপে উঠলেন, 'থাম তুই, বুলবুল। আজ তোর বাবা থাকলে সংসারের অবস্থা এমন করুণ হত না! কে দায়ী, বল তো আমাকে? উত্তর দিতে পারিস আমাকে, কেন এমন ঘটল?'

বুলবুল প্রতিবাদ করল, 'ফুফা বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী, এটা তোমার একটা সন্দেহ। তাছাড়া ফুফা বেঁচেও নেই। সে-কথা তুলে লাভই বা কি। শাহানা আপা নিশ্চয়ই দায়ী নন। জীবনে এই প্রথম তিনি এসেছেন আমাদের বাড়িতে, তাকে এসব কথা শোনাবার কোন মানে হয়?'

শাহানা বলল, 'মামী-মা, আমি আপনার মানসিক অবস্থাটা বুঝি। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়, মামী-মা। টাকা শোধ দিতে হবে বলে বাবা মামাকে ডুবিয়ে মারবেন—আমার বাবা তেমন পাষণ্ড ছিলেন না। টাকা তিনি ঠিকই শোধ দিতেন কিন্তু ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না বলে পারছিলেন না। তারপর তো তিনি নিজেই হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেলেন। দেনার কথাটা ভেবে তিনি রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না, এ তো আমি নিজেই দেখেছি। টাকা দেবার ইচ্ছা না থাকলে কেউ এমন দুশ্চিন্তায় ভোগে না। সে যাই হোক, মনের সন্দেহটা দূর করুন, মামী-মা। টাকার কথা যদি বলেন, একসাথে সবটা না পারলেও, আপনার জামাই কিছু কিছু করে টাকা শোধ দেবেন আপনাদেরকে। আপনাদের কাছে আমার আসার সেটাও একটা কারণ। এবার হাজার তিনেক টাকা আমি দিয়ে যাব। মাস দু'য়েক পর আবার পাঠাব কিছু…।'

প্রৌঢ়া জানতে চাইলেন, 'তুমি কি টাকা দিতেই এসেছ ঢাকায়?'

'এসেছি আপনাদের কাছে বেড়াতে। আপনাদেরকে দেখতে। বাবার দেনা তো আমাকে শোধ করতেই হবে, সেটা বড় কথা নয়…।'

'টাকাটাই আমাদের কাছে বড় কথা, শাহানা। তুমি বেড়াতে এসেছ আমাদের কাছে, ভাল কথা, কিন্তু এখানে তুমি থাকবে কোথায়? দুটো ছোট ছোট কামরা, দেখছই তো! বিছানাপত্রও নেই…'

জননীকে থামিয়ে দিয়ে বুলবুল বলে উঠল, 'সে ব্যবস্থা একটা হবেই যাহোক। শাহানা আপা এসেছেন, আর কোথায় উঠবেনই বা?'

প্রৌঢ়া কঠিন গলায় বললেন, 'কিন্তু ব্যবস্থা হবে বললেই তো আর হলো না। কোথায় শোবে ও?'

মোটকথা, প্রৌঢ়া চাইছেন না শাহানা এ বাড়িতে থাকুক। শাহানার বাবা তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী—এটা তার সন্দেহ নয়, দৃঢ় বিশ্বাস। তার স্বামীকে যে লোক হত্যা করেছে তার মেয়েকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেবার কথা ভাবতেই পারছেন না।

শাহানা বলল, 'অসুবিধে হলে কি আর করা। আমি না হয় কোন হোটেলেই উঠব।'

বুলবুল মুখ খুলল, 'কিন্তু…'

সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল এমন সময়।

শাহানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওই আমার দেওর এসেছে। মামী-মা, আজ

তাহলে আমি উঠি। কাল আসব, কেমন? বুঝতে পারছি, আমার ওপর খুশি নন আপনি। কাল কিন্তু আপনাকে আমি হাসি খুশি দেখতে চাই। যাই ঘটে থাকুক, আমাকে আপনি পর বা শত্রু বলে মনে করতে পারবেন না। টাকার চেকটা আমি কালই দেব, কেমন?'

প্রৌঢ়ার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। যেমন বসেছিলেন তিনি তেমনি বসে রইলেন।

'বুলবুল, পৌঁছে দাও ভাই আমাকে!' কথাটা বলে শাহানা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একশো টাকার একটা কড়কড়ে নোট বের করে পিটুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'লক্ষ্মী সোনা ভাইরা, তোমাদের কে হই আমি বলো তো? আমি তোমাদের শাহানা আপা, বুঝলে! কাল তোমাদের জন্যে অনেক কিছু আনব। আজ এই টাকাটা রাখো, মিষ্টি কিনে খাবে।'

পিটু তাকাল লিটুর দিকে। লিটু চোখ নামিয়ে নিল।

'নাও, লজ্জা কি! বড় বোনের কাছ থেকে নিতে হয়।' কথাটা বলে পিটুর হাতে গুঁজে দিল নোটটা শাহানা, সিধে হয়ে দাঁড়াল, পা বাড়াল দরজার দিকে, 'চলি, কেমন, মামী-মা?'

শাহানার পিছু পিছু অন্ধকার উঠনে বেরিয়ে এল বুলবুল। শাহানা দাঁড়িয়ে পড়তে সে-ও দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে বুলবুল শাহানার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল গালে। মুখোমুখি, প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে শাহানা।

বুলবুলের প্রায় কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলে উঠল শাহানা, 'আমার দূর-সম্পর্কের দেওর লোকটা, লোক হিসেবে ভাল নয়। আমার পিছনে ফেউয়ের মত লেগে আছে। কিন্তু উপায় নেই, ওর সাহায্য নিয়েই হোটেলে উঠতে হবে আমাকে। একা মেয়েমানুষ আমি, কতরকম বিপদ ঘটতে পারে, তাই না? তাই ওকে দরকার। হোটেলে উঠে ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু ভাবছি, সময়টা কাটে কিভাবে! এই তো মাত্র সন্ধ্যা। বুলবুল, যাবে নাকি একবার আজ রাতে আমার হোটেলে?'

সেন্টের মিষ্টি গন্ধে চারদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। চাপাস্বরে বলে উঠল সে, 'কিন্তু...'

'কিন্তু নয়। ক্যাপিটাল হোটেলে উঠব আমি। রিসেপশনিস্টকে বলে রাখব। জিজ্ঞেস করলেই আমার রুম নাম্বার বলে দেবে। এক কাজ করো, মামী-মাকে বলে যেয়ো কোন বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাবে আজ, কেমন? তুমি আর আমি—হোটেলে থাকব—অনেক গল্প হবে—কি বলো?'

বুলবুল ঘামছে। ঠিক আছে—এই শব্দ দুটো উচ্চারণ করার ইচ্ছা থাকলেও, লজ্জায় শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে পারছে না সে।

'বলো, বুলবুল। লজ্জার কি আছে? গল্প করে সারাটা রাত কাটিয়ে দেব, দারুণ হবে, তাই না? বডি বিল্ডারের মত শরীর তোমার, রাত জাগলে কোন ক্ষতি হবে না। সে-কথাই রইল, কেমন?'

বুলবুল হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারল না। শাহানা তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে

ছেড়ে দিল, দ্রুত পা বাড়িয়ে এগোল দরজার দিকে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল বুলবুল, পা বাড়াবার শক্তিও যেন নেই তার মধ্যে। শাহানা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরে। মিষ্টি শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে।

শাহানা হাসছে।

গলির শেষ মাথায় বড় রাস্তার উপর ইকবালের সাদা ফোক্সওয়াগেন দাঁড়িয়ে ছিল। কথা বলতে বলতে গাড়িতে এসে উঠল ওরা। কথা বলছিল শাহানাই বেশি, ইকবাল হুঁ-হ্যাঁ করছিল শুধু।

'কি ব্যাপার, কিছু ভাবছ যেন?'

ইকবাল গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল, বলল, 'ক্যাপিটাল হোটেলে খানিক আগে ফোন করে তোমার জন্য একটা স্যুইট রির্জাভ করেছি। হোটেলের সামনে নামিয়ে দেব আমি তোমাকে। রিসেপশনিস্টকে গিয়ে বললেই সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

কথা বলতে বলতে ভিউ মিররের দিকে চেয়ে আছে ইকবাল। রাস্তার একপাশে একটা ক্রীম কালারের টয়োটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে ফোক্সওয়াগেনের পিছন পিছন আসছে, দেখতে পাচ্ছে সে। কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার।

'তুমি সাথে থাকছ না নাকি?' শাহানা জানতে চাইল।

'যে-কাজে গিয়েছিলাম সেটা হয়নি। আবার যেতে হবে। আধঘন্টা পর দেখা করব তোমার সাথে। আমি হোটেলের ককটেল লাউঞ্জ থেকে ফোন করব, তুমি নেমে এসো।'

শাহানা খুশি হয়ে উঠল। মাথাটা কাত করে ইকবালের কাঁধে রাখল সে, বলল, 'চমৎকার! জীবনে কখনও বারে ঢুকে ড্রিঙ্ক করিনি। দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হবে, কি বলো! ভাল কথা, তোমার গাড়ি···থাক, দরকার নেই—তুমি বরং আমাকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও। রেন্ট-এ কার-এর কি যেন একটা ব্যবস্থা আছে না? পারবে?'

সংপেক্ষে জানাল ইকবাল। 'হোটেল রিসেপশনিস্টকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবে।'

শাহানা প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? আমাকে নিয়ে যাবে না?'

'বাড়িই আছে শুধু, কেউ সেখানে থাকে না। আমিও না। হোটেলে হোটেলেই থাকি।'

'আজ রাতে আমার সাথে থাকবে?'

ইকবাল জবাব দিল না।

'কিছু বলো।'

'না।'

শাহানা শব্দ করে হেসে উঠল, 'কেন, বদনাম হবে এই ভয়ে?'

ইকবালকে গম্ভীর দেখাল, 'হ্যাঁ। তবে আমার নয়, তোমার বদনাম হবে, এই ভয়ে।'

শাহানা বলল, 'আমার বদনাম? ফুর্তি করব বলেই তো এসেছি ঢাকায়! সুযোগ পেলে কে না মজা লোটে, বলো?'

ইকবাল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এ কোন্ শাহানা? মনে মনে প্রশ্ন করল নিজেকে। শান্ত, ভদ্র, বিদুষী, নম্র শাহানা এমন ভয়ঙ্কর রকম বদলে গেল কিভাবে?

'শাহানা, কয়েকটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। একবার বলেছি, আজও তোমাকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি কেন তা জানো? তোমাকে আমি ভাল মেয়ে বলে জানি, তাই। ভালবাসি বলেই আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক। আমি তোমাকে ভাল মেয়ে বলে দেখে এসেছি, সেই ভাবেই দেখতে চাই। তোমার কোন ক্ষতি যেন আমার দ্বারা না হয়। তুমি এমন বদলে যাবে, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি এমন সব ইঙ্গিত দিচ্ছ, এমন সব প্রস্তাব দিচ্ছ—রীতিমত ভয় পাচ্ছি আমি। জানি না, তোমার আসল উদ্দেশ্য কি। তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছ কিনা তাও বুঝতে পারছি না। সে যাই হোক, আমার দৃষ্টিতে তুমি যেমন ভাল আছ তেমনি ভাল হিসেবেই থাকো তুমি, এই আমি চাই।'

'ভাল, ভালবাসা—এসবের কোন অর্থ নেই, ইকবাল। কিছু মনে কোরো না, তোমার সাধুভাব দেখে হাসি পাচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে ন্যাকামি করছ। যাক, সোজা কথার সোজা উত্তর দাও। ঢাকায় যে ক'দিন থাকব, সঙ্গ দেবে আমাকে?'

ইকবাল বলল, 'যদি না দিই?'

'সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে খুঁজে বের করতে হবে আমার,' বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলল শাহানা।

ইকবাল বলল, 'ঠিক আছে। আমি তোমাকে সঙ্গ দেব। কিন্তু···কিন্তু শুধু দিনের বেলা।'

'বেশ তো, রাত কাটাতে বলব না। রাতের জন্য আমি না হয় অন্য কাউকে খুঁজে নেব।' কথাটা বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল শাহানা।

ইকবাল এরপর আর কথা বলল না।

গাড়ি প্রথম শ্রেণীর অভিজাত হোটেল ক্যাপিটালের সামনে দাঁড়াল। শাহানা নামতে নামতে বলল, 'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু! তোমার দেরি দেখলে, বলা যায় না, আমি হয়তো অন্য কাউকে পাকড়াও করে ফেলব আবার!'

শাহানা নিচে নেমে গেটের মুখে দাঁড়াল। পোর্টারকে ইঙ্গিতে ডেকে, গাড়ির ব্যাকডোর খুলে দিল। পোর্টার সালাম দিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে সুটকেস এবং লেদার ব্যাগটা বের করে আনল।

ইকবাল বলল, 'বড় জোর চল্লিশ মিনিট, তার বেশি দেরি হবে না।'

শাহানা পোর্টারকে অনুসরণ করল। গাড়ি ছেড়ে দিল ইকবাল। ভিউ মিররে তাকাল সে, দেখল ক্রীম কালারের টয়োটা আবার ছুটতে শুরু করল।

টয়োটার ড্রাইভিং সীটে দীর্ঘ, সুঠাম-দেহী এক লোক বসে রয়েছে। তার পরনে অদ্ভুত ধরনের পোশাক। অনেকটা যেন আলখেল্লা ধরনের। ঠিক বুঝতে পারল না

ইকবাল। মনে মনে শঙ্কিত বোধ করছে সে। রহস্যটা কি? কে ওই লোক? পুলিশ বা ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের হোমরাচোমরাদের কেউ নয়, নিঃসন্দেহে। তারা কেউ তার উপর অসন্তুষ্ট নয়। বড় অফিসাররা সবাই তার বন্ধু-শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তাহলে—কে ওই রহস্যময় লোক? কেন সে তার উপর প্রায় দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে? লোকটা যে নিজেকে খুব একটা আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে তাও নয়।

রহস্যটা ভেদ হচ্ছে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। জানা দরকার লোকটা কে, কেন সে··· এদিকে শাহানার ব্যাপারটাও কিছু বুঝতে পারছে না সে। কিভাবে, কেন এমন বিদঘুটে ভাবে বদলে গেল শাহানা? সবটাই আসলে হাসি-তামাশা, নাকি শাহানাকে চিনতে ভুল করেছিল সে? শাহানা কি আসলে চরিত্রহীনা মেয়ে ছিল বরাবর? হয়তো তাই। হয়তো সে চিনতে পারেনি শাহানাকে। তাই যদি হয়, শাহানার প্রতি তার এতটুকু ভালবাসা থাকা উচিত নয়। একটা মেয়েকে পাওয়া যাবে না জেনেও তাকে ভালবাসে সে, সেই মেয়ে যদি চরিত্রহীনা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে··· না, শাহানা তাকে এক অর্থে ঠকিয়েছে। শাহানা নিজের আসল রূপটা লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন—এটা তার অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি পাওয়া উচিত তার···

রিসেপশনে ঢুকে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল শাহানা। রিসেপশনিস্ট যুবকটির বয়স অল্প, সুদর্শন এবং পোশাকে-কথাবার্তায় স্মার্ট। শাহানাকে দেখেই আন্তরিকভাবে হাসল সে।

শাহানা বলল, 'আমার এক বন্ধু খানিক আগে ফোন করেছিলেন। মিসেস শাহানার নামে তিনি একটা স্যুইট রিজার্ভ করেছেন।'

'এক মিনিট!'

যুবক রিসেপশনিস্ট রেজিস্টার বুকটা খুলে রিজার্ভেশন কার্ডগুলো দেখতে শুরু করল, এক মুহূর্ত পরই সে মুখ তুলল, 'পেয়েছি। আপনিই মিসেস শাহানা?'

'জ্বী।'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'ফিফথ্ ফ্লোরের কর্ণারের স্যুইটটা দেয়া হয়েছে আপনাকে। আপনার স্যুইট থেকে আপনি ঢাকার প্রায় সবটা দেখতে পাবেন। আপনি একা, মিসেস শাহানা? দু'সপ্তাহের জন্য, তাই না?'

রেজিস্টার খাতাটার পাতা উল্টো, সেটা বাড়িয়ে দিল রিসেপশনিস্ট। গোল্ড-ক্যাপ পাইলট পেন এগিয়ে দিল।

কলমটা নিয়ে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে লিখতে শাহানা মুখ না তুলেই মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি একা। স্বামী ভদ্রলোক চার বছরে অন্তত একবার একা একা কিছু দিন দূরে কোথাও থাকি। ডু ইউ থিঙ্ক ইটস্ সাচ্ আ গুড আইডিয়া?'

'আই অ্যাম এ ব্যাচেলর মাইসেলফ্, মিসেস শাহানা। বাট্ ইফ আই ওয়্যার ম্যারেড টু সামওয়ান লাইক ইউ···আই জাস্ট ডোন্ট নো। ইওর ফার্স্ট ভিজিট টু ঢাকা?'

শাহানা মুখ তুলল, 'হ্যাঁ। অর্ধপরিচিত এক বন্ধু ছাড়া আর কাউকে চিনি না এখানে।'

রিসেপশনিস্ট যুবক শাহানার গলার মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তাতে কি! আমাদের রাজধানীতে সম্ভাব্য বন্ধুর সংখ্যা কম নয়।'

'তাই নাকি! ইটস্ আ গুড নিউজ ফর মি! ভাল কথা, রেন্ট-এ-কার থেকে একটা গাড়ি চাই আমার। এখুনি। সম্ভব?'

'সম্ভব। আধঘণ্টার মধ্যেই পাবেন।'

হিসেব করে টাকার অঙ্কটা বলল রিসেপশনিস্ট। শাহানা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে টাকা বের করে গুণল। তারপর বাড়িয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল রিসেপশনিস্ট।

'থ্যাঙ্কিউ।'

রিসেপশনিস্ট একজন বেলবয়কে ডেকে সুটকেস এবং ব্যাগটা নিয়ে শাহানার সাথে যেতে বলল। চাবি নিয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল শাহানা। বেলবয় তাকে অনুসরণ করল। এলিভেটরের কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শাহানা রিসেপশনিস্ট যুবকের দিকে। ছোকরা চেয়ে রয়েছে। মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিল তার দিকে শাহানা। তারপর এলিভেটরে ঢুকল।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, উঠতে শুরু করল উপরে। চোখ তুলে একবার তাকাল বেলবয়, চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল সে।

'নাম কি তোমার?'

'আবদুল হক।'

শাহানা বলল, 'ফুটবল খেলো নাকি?'

লজ্জা পেল আবদুল হক। প্রশ্নটা করার কারণ তার শক্ত-সমর্থ, পেটা লোহার মত শরীর। মাথা নিচু করেই জবাব দিল সে, 'জ্বী। হোটেলের ক্লাবে খেলি।'

এলিভেটর ছয়তলায় উঠে থামল। দরজা খুলে যেতে আগে নামল আবদুল হক, পিছন পিছন শাহানা। বাহাত্তর নম্বর স্যুইটটা করিডরের শেষ প্রান্তে। লাল, নরম কার্পেটের উপর দিয়ে স্যুইটের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শাহানা। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। সীটিং রুম অতিক্রম করে পা রাখল বেডরুমে।

'ভিতরে ঢুকে ওগুলো রেখে যাও।'

আবদুল হক ঢুকল ভিতরে। নামিয়ে রাখল সুটকেস আর লেদার ব্যাগ। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই শাহানার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল সে, তাকাল। দেখল শাহানা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

'এটা রাখো।'

'জ্বী! মানে, আপনি হয়তো ভুল করছেন ম্যাডাম, একশো টাকা···।'

এগিয়ে এল শাহানা, আবদুল হকের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বলল, 'ভুল করছি না। নাও তুমি এটা। কেন দিচ্ছি জানো? আচ্ছা বলছি, আগে ধরো।'

হাত বাড়াল আবদুল হক। শাহানা তার হাতে গুঁজে দিল টাকাটা। বলল,

'এই টাকার বিনিময়ে একটা কাজ করাব তোমাকে দিয়ে।'

'কি কাজ ম্যাডাম?'

'কাজটার কথা পরে বলব। আচ্ছা, তোমার ডিউটি কখন শেষ হবে?'

'রাত বারোটায়।'

শাহানা কি যেন চিন্তা করল বলল, 'গুড। কোথায় শোও তুমি? রাতে কি বাড়ি ফিরে যাও?'

'না, ম্যাডাম। হোটেলের কোয়ার্টার আছে পাশেই···।'

'রাতে, মানে শেষ রাতের দিকে, আসতে পারবে কি? আমি ভোর, এই ধরো ঠিক চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে চাই। তুমি দরজায় কলিংবেল টিপে আমার ঘুম ভাঙাতে পারবে না?'

আবদুল হক বলল, 'এখানে তো অ্যালার্মসহ ঘড়ি আছে, ম্যাডাম। তাছাড়া ভোর রাতের দিকে অন্য বেলবয়ের ডিউটি থাকবে, তাকে আমি বলে গেলে সে আপনাকে ঠিক চারটের সময়···'

শাহানা বলে উঠল, 'দূর বোকা। অন্য বেলবয়কে তো দরকার নেই আমার। দরকার তোমাকে। তুমি ঠিক চারটের সময় আসতে পারবে কিনা তাই বলো। টাকাটা তো সেজন্যেই দিলাম। ভয় নেই, কেউ জানবে না।'

আবদুল হক কি বলবে ভেবে পেল না।

শাহানা বুঝিয়ে বলার সুরে বলল, 'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, বুঝলে? সেজন্যেই আসতে বলছি। সবাই সুযোগ পায় না। আমি তোমাকে সুযোগটা দিতে চাই। কেউ জানবে না।'

'আসব, ম্যাডাম,' ঘামতে ঘামতে প্রায় অস্ফুটে বলল আবদুল হক।

'এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। আচ্ছা, এবার যাও তুমি। কাউকে বোলো না কিন্তু!'

দ্রুত বেরিয়ে গেল আবদুল হক।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে আপনমনে হাসল শাহানা। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাত্রির ঢাকা শহর, চারদিকে নানা রঙের বিভিন্ন আকৃতির আলো, গাড়ির হেডলাইট ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। গুনগুন করতে করতে বেডরুমে ঢুকল সে। বসল একটা আরাম কেদারায়, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফোনটা।

ডায়াল করতেই অপরপ্রান্ত থেকে মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো!'

'ফেরদৌস, আমি তোমার শাহানা, ক্যাপিটাল হোটেলের ছয়তলার বাহাত্তর নম্বর স্যুইট থেকে বলছি। দারুণ থ্রিল অনুভব করছি ঢাকায় পা দিয়েই, বুঝলে। একা হওয়ার এই মজা! তোমার অবস্থা কি? নিশ্চয়ই খুব বোরিং ফীল্ করছ?'

মোফাজ্জেল সাহেব বললেন, 'বোরিং ফীল্ করার সময় এখনও আসেনি। তোমার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করছিলাম এতক্ষণ। ভালয় ভালয় পৌঁছেছ শুনে স্বস্তি পেলাম। কোন সমস্যা নেই তো? তোমার মামার বাড়ি গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম। মামী-মা আমার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছেন। আগামীকাল যাব আমি, বলে এসেছি। তিন হাজার টাকার চেক দিয়ে আসব।'

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'তা তো অবশ্যই দেবে। ঝগড়া-টগড়া কোরো না, কেমন? আর শোনো, খুব সাবধানে চলাফেরা কোরো। তোমার সাথে আমি নেই, একথাটা ভুলে যেয়ো না। বিপদে-আপদে পড়লে সাথে সাথে ফোন করবে, কেমন? অবশ্য তোমাকে আমি নীরস সময় কাটাতে বলছি না। হ্যাভ ফান, ডারলিং। দু'দিন পর আবার ফোন কোরো, কেমন?'

'আই উইল, ডারলিং। অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ ফান, টু। গুডনাইট!'

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল শাহানা। খানিকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করল সে। তারপর উঠল।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে স্নান করল সে। বিশ মিনিট পর ড্রেসিংরুম থেকে যখন বেরুল তখন আগুনের মত জ্বলছে তার রূপ। লাল শিফন পরেছে, সেই সাথে লাল ব্লাউজ। বাঁ হাতের কনিষ্ঠায় হীরের আঙটিটা ছাড়া বাকি সবই লাল।

ফোন এল আরও পনেরো মিনিট পর।

ইকবালের ফোন, 'ককটেল লাউঞ্জে চলে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।'

'ওয়াণ্ডারফুল! থ্যাঙ্কস্, ইকবাল!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল শাহানা। প্রায় সাথে সাথে আবার ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল ফোনের বেল। রিসিভার তুলতেই রিসেপশনিস্টের গলা ভেসে এল, 'মিসেস শাহানা, আপনার গাড়ি হোটেলের গেটে পৌঁছে গেছে। লাল টয়োটা।'

'অদ্ভুত! আমিও লাল শাড়ি পরেছি। থ্যাঙ্কিউ!'

তিন মিনিট পর করিডরে বেরুল শাহানা। দরজায় তালা দিয়ে পা বাড়াল। নিচে নেমে রিসেপশনিস্ট যুবকের সাথে কথা বলল একমিনিট, তারপর বাইরে বেরিয়ে এল।

পোর্টারের কাছ থেকে লাল টয়োটার চাবি নিয়ে শাহানা জানতে চাইল, 'গ্যারেজটা কোন্‌দিকে?'

'ব্যাক সাইডে, ম্যাডাম। ইচ্ছা করলে আপনি নিজেই গাড়ি রাখতে বা নিতে পারবেন। কোন চার্জ লাগবে না। গেটের কাছেও গাড়ি রেখে যেতে পারেন, আমরা রেখে আসব গ্যারেজে, দরকারের সময় চাইলেই আবার এনে দেব—চার্জ হবে এই নিয়মে। রাতের বেলা অ্যাটেণ্ড্যান্ট থাকে না গ্যারেজে, গাড়ির জানালা দরজা লক আপ্ করতে ভুলবেন না, ম্যাডাম!'

ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়াল শাহানা ককটেল লাউঞ্জের দিকে।

তিন

রাত আটটা।

ককটেল লাউঞ্জে সে-সময় একজন মাত্র বারটেণ্ডার উপস্থিত। বারের ভিতর লোকজন খুব কম। তিন চারটে কেবিনের দরজা বন্ধ দেখা যাচ্ছে ভিতর থেকে,

বাকি সবগুলো খালি। ছড়ানো-ছিটানো টেবিল চেয়ারগুলোও অধিকাংশ শূন্য। সর্বমোট পনেরো-বিশজন নর-নারী বসে আছে। তারাও ডিনারের জন্য উঠব উঠব করছে।

বারটেণ্ডার সুকুমার সেন খবরের কাগজ পড়ছিল কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে। কাউন্টারের এ-পাশে গদিমোড়া কয়েকটা টুল, একটি ছাড়া সবগুলোই খালি। রোগা-পাতলা চওড়া কার্নিশ-ওয়ালা হ্যাট পরা এক লোক বসে বসে রেকর্ডপ্লেয়ার থেকে নিক্ষিপ্ত মিউজিকের তালে তালে পা দোলাচ্ছে, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে কাউন্টারের উপর রাখা হুইস্কির গ্লাসে। কখনও বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে লাউঞ্জের প্রবেশ পথের দিকে। তার ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে দীর্ঘ এবং মোটা একটা বার্মিজ চুরুট জ্বলছে। চুরুটের গন্ধে চারদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

হাইহিলের শব্দে মুখ তুলল বারটেণ্ডার সুকুমার। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। লাল পরীর মত সুন্দরী এক যুবতী ঢুকছে লাউঞ্জে।

লাউঞ্জে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল শাহানা। গ্রীবা উঁচু করে চারদিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, ইকবাল কোথাও নেই। একজন ওয়েটার দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখল সে।

'ম্যাডাম, মি. ইকবাল জরুরী একটা কাজে কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে গেছেন। আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন তিনি। ওই কর্নারের টেবিলটা…'

শাহানা দৃঢ় পায়ে এগোতে শুরু করল আবার, বলল, 'কাউন্টারের সামনে বসলে ক্ষতি কি! মি. ইকবাল ফিরলে টেবিলে যাব।'

'ঠিক আছে, ম্যাডাম।'

সবিনয়ে সম্মতি জানাল ওয়েটার। দ্রুত পায়ে শাহানাকে ছাড়িয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সুকুমারের উদ্দেশে নিচু গলায় বলল, 'ম্যাডামের সঙ্গী ভদ্রলোক খানিক পর আসবেন। কি একটা কাজে বাইরে গেছেন তিনি। ম্যাডামের সুবিধে অসুবিধে লক্ষ রাখবেন, স্যার!'

শাহানা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে র‍্যাকে সজ্জিত বিভিন্ন নাম এবং প্রকারের মদের বোতলগুলো দেখতে দেখতে মৃদু হাসল।

'বসুন, ম্যাডাম। দেব কিছু?' সুকুমার সমীহভরে জানতে চাইল। শাহানার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। বারে চাকরি করতে করতে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছে সে। কিন্তু নবাগতা এই যুবতীকে দেখামাত্র সে স্বীকার না করে পারল না, এর মত সুন্দরী মেয়ে এর আগে চোখে পড়েনি তার।

শাহানা শব্দ করে হাসল। বসল সে উঁচু একটা টুলে। ভ্যানিটি ব্যাগটা কাউন্টারের উপর রাখল। দুই হাতের কনুই কাউন্টারে রেখে দুই হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সাথে খাপে খাপে মিলিয়ে তার উপর থুতনি রাখল, বলল, 'বাড়িতে এসবে দু'একবার চুমুক দিয়েছি বটে, কিন্তু…খুব একটা অভ্যাস নেই। হালকা কিছু…।'

'শ্যাম্পেন। আপনার জন্য শ্যাম্পেনই উপযুক্ত।'

শাহানা বলল, 'আমার বন্ধু, হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না। বাট আই ফীল্ টু-নাইট কল্‌স্ ফর ইট। আমি একটু···মানে, জাস্ট স্লাইটলি, বেসামাল হতে চাই। বুঝতেই পারছেন···ঠিক আছে, শ্যাম্পেনই দিন। তারপর না হয় হুইস্কি বা আর কিছুর কথা ভাবা যাবে···'

'এই দিচ্ছি।'

কথাটা বলে সুকুমার ঘুরে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু শাহানা কথা বলে উঠল আবার, 'একটা কথা। ঢাকায় আমি এই প্রথম। কিছুই জানা নেই। প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে যাবে কিনা জানি না, তবু প্রশ্ন করে ব্যাপারটা জেনে নিতে চাই আমি! একা একটা বারে বসে ড্রিঙ্ক করা, মেয়েদের জন্যে এটা কি আপত্তিকর?'

'অফকোর্স নট্, ম্যাডাম! এটা ঢাকা, তার চেয়ে বড় কথা এটা ক্যাপিটাল! এখানে মেয়েদের ব্যাপারে ও ধরনের কোন প্রেজুডিস নেই।'

শাহানা হাসল গালে টোল ফেলে। পটলচেরা চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল তার, 'তাহলে আরও একটা প্রশ্ন করি। মেয়েদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য ঢাকায় কি কি ব্যবস্থা আছে? আই মীন, পুরুষরা যেমন মদ খায়, নাইট ক্লাবে যায়, ফ্ল্যাশ খেলে, ড্রাইভ করে, নাচে, নীলছবি দেখে—মেয়েরাও কি ঠিক সেইভাবে এসব করতে পারে?'

'কেন পারবে না! তবে এটা নির্ভর করে একজন মেয়ের রুচি এবং ইচ্ছার উপর। সব জায়গায় হয়তো পারে না, কিন্তু রাজধানীতে পুরুষরা যা করে মেয়েরাও তা অনায়াসে করতে পারে। আপনি চাইলে সবই করতে পারেন। হোয়াই নট জাস্ট হ্যাভ ফান?'

শাহানা নিচু গলায় বলল, 'আই ওয়ান্ট টু। অ্যাম নট শিওর দ্যাট আই নো হাউ। বাট আই ডু বিলীভ্ দিস শ্যাম্পেন ইজ গোয়িং টু হেলপ্। হ্যাভ ইউ গট সিগারেটস্?'

'ওহ্, শিওর।'

সুকুমার এক প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট শেলফ্ থেকে তুলে কাউন্টারের উপর রাখল। প্যাকেট খুলে শাহানা একটা ফিলটার টিপড্ সিগারেট ঠোঁটে তুলল। সুকুমার লাইটারটা খুঁজছে।

শাহানার পাশে বসা রোগা-পাতলা অ্যাঙলো লোকটা সুযোগটা গ্রহণ করল, নিজের গ্যাস লাইটার জ্বেলে বাড়িয়ে দিল সেটা শাহানার দিকে।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল শাহানা। বলল, 'থ্যাঙ্কস্!'

হ্যাট পরা লোকটা লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে মুচকি হাসল, বলল, 'ইটস্ আ প্লেজার। হাপনি একা বেড়াইটে আসিয়াছেন, মিস···?'

শাহানা সহাস্যে বলল, 'মিসেস, মিসেস শাহানা! হ্যাঁ একাই এসেছি। ব্যাপার কি জানেন, আমার স্বামী ভদ্রলোকের ইচ্ছা, বছরে অন্তত একবার আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কিছু দিনের জন্য দূরে থাকব। তাতে নাকি দাম্পত্য জীবন আরও মধুর হবে।'

অ্যাঙলো লোকটা, অর্থাৎ, প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার স্যানন ডি. কস্টা বলল, 'হামি হাপনার স্বোয়ামীকে সমর্ঠন করি।'

শাহানা বলল, 'কিন্তু, সমস্যাটা একবার ভেবে দেখুন। তিনি হুকুম জারী করেছেন ঢাকায় আমাকে সম্ভাব্য সবরকম আমোদ-ফুর্তি করে সময় কাটাতে হবে। এদিকে নীরস এক বন্ধু ছাড়া আর কাউকে চিনি না...'

সুকুমার কাউন্টারে একটা ট্রে রাখল। তাতে শ্যাম্পেনের বোতল এবং একটা গ্লাস। গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল সুকুমার। বলল, 'নাউ ইউ ক্যান স্টার্ট!'

গ্লাসে চুমুক দিল শাহানা।

পিছন থেকে ইকবালের কণ্ঠস্বর ভেসে এল সেই সময়, 'আমরা টেবিলে বসতে পারি, তাই না, শাহানা?'

'অফকোর্স!'

টুল থেকে নামল শাহানা, সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়েটারকে দিয়ে ট্রেটা টেবিলে পাঠিয়ে দিন।'

ইকবালের একটা হাত ধরল শাহানা, দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল কর্নারের একটা টেবিলের দিকে।

সুকুমার এবং ডি. কস্টা পিছন থেকে চেয়ে রইল ওদের দিকে। সুকুমার দেখছে শাহানাকে। কিন্তু ডি. কস্টা শাহানাকে নয়, দেখছে ইকবালকে।

মুখোমুখি বসে শাহানা বলল, 'তোমার আচরণ খুব রহস্যময় লাগছে আমার কাছে, ইকবাল! খানিক পর পরই কিছুক্ষণের জন্য কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

ইকবাল বলল, 'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ব্যবসা সংক্রান্ত। তাই...'

শাহানা জানতে চাইল, 'সমস্যাটা মিটবে কখন?'

'সহজে মিটবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে ওটা নিয়ে আজ আর মাথা ঘামাচ্ছি না আমি।'

ওয়েটার ট্রে দিয়ে গেল। ইকবাল হুইস্কির অর্ডার দিল নিজের জন্য।

শাহানা পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'এখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ব। ডিনার পরে খাব, কেমন?'

'কোথায় যেতে চাও এরপর?'

শাহানা বলল, 'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে। অবশ্যই কোন নাইট-ক্লাবে, তাই না?'

ইকবাল কি যেন ভাবছে, জবাব দিল না।

শাহানা আবার বলল, 'যেখানে মদ খেয়ে মাতলামি করব আমি। যেখানে জুয়া খেলে প্রচুর জিতব কিংবা হারব।'

ইকবাল বলল, 'মান-সম্মানের কথাটা একবার ভেবে দেখবে না?'

'মান-সম্মান? কার? তোমার, না আমার?'

ইকবাল বলল, 'আমি পুরুষমানুষ। মদ খাওয়া বা জুয়া খেলা আমার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তুমি মেয়ে। তোমার মান-সম্মানের কথাই বলছি আমি।'

শাহানা হঠাৎ শব্দ করে হাসল। বলল, 'মান-সম্মানের ভয় আমারও আছে,

ইকবাল। কিন্তু ঢাকায় ভয় করব কাকে? স্বামী বেচারা তো চট্টগ্রামে কাজে ব্যস্ত—তার কানে কোন কথা যাবার ভয় নেই। সুতরাং ফুর্তি করার এমন সুযোগটা ছাড়ব কেন?'

ইকবাল বলল, 'কিন্তু তোমার মান-সম্মানের মূল্য আমার কাছেও আছে।'

'তুমি আমার স্বামী নও। প্রাক্তন প্রেমিক। তোমাকে আমি সুযোগ দিচ্ছি আমাকে নিয়ে ফুর্তি করার। সুযোগটা তুমি নিতে চাইছ না কেন?'

ইকবাল বলল, 'তোমাকে আমি ভাল মেয়ে হিসেবে জানি। সেই জানাটা মিথ্যে প্রমাণিত হোক তা আমি চাই না।'

শাহানা বলল, 'যেটা মিথ্যে সেটা মিথ্যেই। সত্য হলো, আমি বৈচিত্র্যের পূজারিনী! নতুনত্ব চাই জীবনে। এতে করে তুমি যদি আমাকে খারাপ মেয়ে বলে মনে করো, আমার আপত্তি নেই। ধরে নাও, আমি ভাল মেয়ে নই।'

ইকবাল চুপ করে রইল। অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে।

ওয়েটার হুইস্কি দিয়ে গেল। নিঃশব্দে পান করতে লাগল ওরা।

একসময় ইকবাল নিজেই বলল, 'বেশ। তুমি ভাল মেয়ে নও, এটাই সত্যি বলে জানব আজ থেকে! চলো, কোথায় যাবে? জুয়া খেলবে, মদ খাবে—আমার কোন আপত্তি নেই।'

'এই তো পুরুষমানুষের মত কথা! ধন্যবাদ। চলো, ফ্ল্যাশ খেলব।'

উঠল ওরা। বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ককটেল লাউঞ্জ থেকে। ইকবাল গাড়ি রেখে এসেছে। ভাড়া করা লাল টয়োটায় চড়ে রাজপথে বেরুল ওরা।

এবার ক্রীম কালারের টয়োটা নয়, কালো রঙের একটা মরিস অনুসরণ শুরু করল ওদের গাড়িকে।

চার

সোমবার ঢাকায় এসেছিল শাহানা। তারপর কেটে গেছে একে একে কয়েকটা দিন। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র—চারদিন গত হয়েছে। আজ শনিবার। সবে মাত্র ভোর হয়েছে। আজ নিয়ে পাঁচদিন।

নতুন দিনের আলো ফুটছে ঢাকার বুকে। সূর্য এখনও ওঠেনি, তবে এই উঠল বলে। ক্যাপিটাল হোটেলের সামনেটা সারাদিন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত যানবাহনের ভিড়ে গিজ গিজ করলেও এই মুহূর্তে গোটা এলাকাটা ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে। প্রশস্ত কংক্রীটের রাস্তার উপর শুধু কয়েকজন ঝাড়ুদার ইতস্তত ঝাঁট দিচ্ছে। এমন সময় যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল, দেখা গেল ঝকঝকে একটা গাঢ় বাদামী রঙের ডাটসন ওয়ানটোয়েনটি ওয়াই গাড়ি সবেগে ছুটে আসছে। ঝাড়ুদাররা সরে গেল একপাশে। ডাটসন সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাপিটাল হোটেলের গেটের সামনে। মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌস নামল গাড়ি থেকে হাতে একটা লেদার ব্যাগ নিয়ে।

ভোর বলেই গেটে এই সময় পোর্টার বা গেটম্যান নেই। মোফাজ্জল সাহেব

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। মুখের চেহারায় রাত্রি জাগরণের পরিষ্কার ছাপ। পরনের হালকা ধূসরঙের ট্রপিক্যাল স্যুটটা সিগারেটের ছাই লেগে জায়গায় জায়গায় নোংরা হয়ে গেছে। সারারাত্রি গাড়ি চালিয়েছেন তিনি, খাওয়া দাওয়াও হয়নি গত সন্ধ্যার পর থেকে।

প্রকাণ্ড রিসেপশন রুমে ঢুকে তিনি দেখলেন একজন ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ নেই। ক্লার্কটাও ঝিমুচ্ছে চেয়ারে বসে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে লেদার ব্যাগটা কার্পেটের উপর নামিয়ে রেখে বিরক্তির সাথে কথা বললেন তিনি, 'শুনছেন?'

চোখ মেলে তাকাল মধ্যবয়স্ক কেরানী। মোফাজ্জল সাহেবকে দেখে ধড়মড় করে সিধে হয়ে বসল।

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'আপনাদের এখানে মিসেস শাহানা আছেন! ওর স্যুইট নাম্বারটা বলুন।'

মিসেস শাহানা! ক্লার্ক উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। মিসেস শাহানা, মিসেস শাহানা···হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। রিপোর্টটা সম্ভবত ডিটেকটিভ অফিসারের সহকারী মাসুদুর রহমানের কাছে আছে। রিপোর্ট করা হয়েছে বলেই নামটা পরিচিত ঠেকছিল।

ইন্টারকমের সুইচ অন্ করে ক্লার্ক মাউথপীস মুখের সামনে তুলে বলল, 'মাসুদ সাহেব, দয়া করে রিসেপশনে আসুন একবার। এক ভদ্রলোক মিসেস শাহানার স্যুইট নাম্বার জানতে চাইছেন।'

সুইচ অফ্ করে রেজিস্টার বইটা টেনে নিল ক্লার্ক, পাতা উল্টে পরীক্ষা করল, তারপর মুখ তুলে তাকাল মোফাজ্জল সাহেবের দিকে, 'হ্যাঁ। মিসেস শাহানা আমাদের হোটেলে গত সোমবার সন্ধ্যায় উঠেছেন···।'

'স্যুইট নাম্বারটা জানতে চাই আমি!' মোফাজ্জল সাহেব অধৈর্য কণ্ঠে বললেন। পকেট থেকে ৫৫৫ মার্কা সিগারেটের প্যাকেট বের করে লাইটার জ্বালালেন তিনি, পদশব্দ শুনে তাকালেন পিছন দিকে। দেখলেন সুবেশী এক লোক দ্রুত এগিয়ে আসছে। তার পাশেই এসে দাঁড়াল লোকটা।

ক্লার্ক সংক্ষেপে বলল, 'ইনি।'

মোফাজ্জল সাহেব চটে উঠে কিছু যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু তিনি মুখ খোলার আগেই তার পাশে সদ্য এসে দাঁড়ানো মাসুদুর রহমান বলল, 'একমিনিট, স্যার। যদি কিছু মনে না করেন, আপনি মিসেস শাহানার স্যুইট নাম্বার জানতে চাইছেন কেন, বলবেন কি?'

ঝট্ করে মাথা নেড়ে মাসুদুর রহমানের দিকে তাকালেন মোফাজ্জল সাহেব, চোখ দুটো কুঁচকে উঠল তার। অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কে আপনি? আমার স্ত্রীর স্যুইট নাম্বার আমি জানতে চাইব না?'

মাসুদুর রহমান এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমি ক্যাপিটালের সহকারী সিকিউরিটি অফিসার। আপনি মিসেস শাহানার স্বামী, বলতে চাইছেন?'

রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মোফাজ্জল সাহেবের গলা উচ্চকিত হয়ে উঠল, 'জ্বী-হ্যাঁ! আমি তাই বলতে চাইছি। আমি মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌস,

মিসেস শাহানার স্বামী। আর কিছু জানবার আছে আপনার?

মাসুদুর রহমান বিনীতভাবে হাসল এবার। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মি. ফেরদৌস। আমার দায়িত্ব গেস্টদের প্রাইভেসী রক্ষা করা। মিসেস শাহানা জানেন আপনার আসার কথা আছে?'

'না। দেখুন সহকারী সিকিউরিটি অফিসার সাহেব, সারারাত আমি গাড়ি চালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে এখানে আসছি। আমি খুবই ক্লান্ত। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। এখুনি আমাকে স্নান করতে হবে, দাড়ি কামাতে হবে, ঘুমুতে হবে। দয়া করে, ফর গডস্ সেক্, স্যুইট নাম্বারটা আমাকে জানাবেন কি?'

মাসুদুর রহমানের চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটল না। সে শান্তভাবেই জানতে চাইল, 'মাফ করবেন, আপনি যে ভদ্রমহিলার স্বামী তা প্রমাণ করার জন্য পরিচয়পত্র দেখাতে পারবেন?'

'মাই গড! শাহানার স্বামী আমি তা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। কি বলছেন আপনি?'

মাসুদুর রহমান এবার হাসল, বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি নিজেই ভেবে দেখুন না, কেউ বলল আমি অমুক ভদ্রমহিলার স্বামী আর আমরা সাথে সাথে তাকে সেই ভদ্রমহিলার স্যুইটে প্রবেশ করার অনুমতি দিলাম—এটা কি উচিত? গেস্টদের প্রাইভেসী এবং সিকিউরিটি, দুটোর দিকেই লক্ষ রাখতে হয় আমাদের।'

'তা ঠিক। যে-কেউ চাইলেই নাম্বার দেয়া উচিত নয়।' মোফাজ্জল সাহেব শান্ত হলেন। যুক্তিটা অনুধাবন করতে পেরেছেন তিনি এতক্ষণে। কোটের ভিতরের পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড এবং চট্টগ্রামস্থ একটা নাইট ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলেন মাসুদুর রহমানের দিকে, 'এগুলোয় প্রমাণ হয় কিছু?'

কার্ড দুটো পরীক্ষা করে মাসুদুর রহমান বলল, 'ঠিকই আছে, মি. ফেরদৌস। করিম সাহেব, চাবি আছে?'

ক্লার্ক বলল, 'এক্সট্রা একটা আছে। মিসেস শাহানা হোটেলে আসার পর রিসেপশনে চাবি জমা রাখেননি।'

মাসুদুর রহমান ক্লার্কের হাত থেকে অতিরিক্ত চাবিটা নিয়ে মোফাজ্জল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার সাথে যাচ্ছি আমি—চলুন।'

কথাটা বলে কার্পেটের উপর থেকে লেদার ব্যাগটা তুলে নিল সে। মোফাজ্জল সাহেব বলে উঠলেন, 'ওটা আমাকে দিন।'

'আমিই নিচ্ছি—চলুন।'

মোফাজ্জল সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। মাসুদুর রহমানকে অনুসরণ করে এলিভেটরে চড়লেন তিনি। এলিভেটর ছয় তলায় থামতে তিনি নামলেন আগে। পিছন থেকে মাসুদুর রহমান বলল, 'বাহাত্তর নাম্বার স্যুইট।'

কার্পেট বিছানো করিডর ধরে লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন মোফাজ্জল সাহেব। সর্বশেষ স্যুইটের দরজার সামনে দ্রুত নক্ করলেন।

ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না।

আবার, এবার আরও জোরে নক্ করলেন মোফাজ্জল সাহেব। তারপর জোর গলায় ডাকলেন, 'শাহানা! শাহানা দরজা খোলো!'

মাসুদুর রহমান পাশে এসে দাঁড়াল, বলল, 'চাবি নিন। দরজাটা খুলুন।'

চিন্তিত দেখাল মোফাজ্জল সাহেবকে। বলল, 'ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্তা শাহানা। ঘুমও ওর খুব পাতলা টুক্ করে শব্দ হলেই ঘুম ভেঙে যায়। দিন দেখি চাবিটা।'

মাসুদুর রহমানের বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে চাবি নিয়ে কী-হোলে ঢোকালেন মোফাজ্জল সাহেব, তালা খুলে দরজার কবাট দুটো উন্মুক্ত করে ভিতরে তাকালেন।

সাদা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল এক পলকে মোফাজ্জল সাহেবের মুখের চেহারা। পাথরের মূর্তির মত খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দরজার ওপাশে সীটিংরুম, সীটিংরুমের অপর দরজাটা খোলা, সেই খোলা দরজা পথে দেখা যাচ্ছে বেডরুম। বেডরুমের বিছানাটা শূন্য। লাগেজ র‍্যাকটাও দেখা যাচ্ছে, সেটাও শূন্য। র‍্যাকের নিচে সুটকেস এবং লেদার ব্যাগটা রয়েছে। কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র সবই রয়েছে ভিতরে, বের করা হয়নি। কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর অস্ফুটে মোফাজ্জল সাহেব উচ্চারণ করলেন, 'শাহানা!'

পা বাড়িয়ে সীটিংরুমে ঢুকলেন তিনি। যন্ত্রচালিতের মত বেডরুমের দরজার দিকে পা বাড়ালেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন দোর-গোড়ায়। তারপর সবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন মাসুদুর রহমানের দিকে। ভাঙা, ভীত গলায় বললেন, 'কোথায় ও? কোথায় আমার স্ত্রী? কি ঘটেছে আপনাদের এই হোটেলে?'

ঝট্ করে এরপর তাকালেন মোফাজ্জল সাহেব বাথরুমের দরজার দিকে। প্রায় ছুটলেন তিনি সেদিকে। সশব্দে দরজার কবাট উন্মুক্ত করে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'শাহানা!'

'শান্ত হোন, মি. ফেরদৌস। ওই সোফাটায় বসুন। আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলার আছে···।'

মোফাজ্জল সাহেব নড়তে পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তিনি মাসুদুর রহমানের দিকে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ঘটেছে? কোন বিপদ—শাহানা কি···কি হয়েছে শাহানার? খুলে বলুন আমাকে, প্লীজ, কি হয়েছে আমার স্ত্রীর?'

মাসুদুর রহমান এগিয়ে এসে মোফাজ্জল সাহেবের কাঁধে হাত রাখল, 'ভয় পাবার কিছুই নেই, মি. ফেরদৌস। দুশ্চিন্তা করবেন না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমি না জানলেও যতটা জানি বলছি। আসুন বসা যাক।'

টেনে নিয়ে এসে সোফায় বসাল মাসুদুর রহমান মোফাজ্জল সাহেবকে। বলল, 'আপনার স্ত্রী ঠিক কোথায় আছেন তা আমরা কেউ জানি না। তার মানে এই নয় যে তিনি কোন বিপদে পড়েছেন। তিনি সোমবার সন্ধ্যার সময় হোটেলে আসেন। আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের মত ছিলেন তিনি এই স্যুইটে, তারপর গাড়ি নিয়ে

বেরিয়ে যান। সে-রাতে আর তিনি ফিরে আসেননি। আমি বলতে চাইছি, তিনি সেই যে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন তারপর আর ফিরে আসেননি।'

মোফাজ্জল সাহেব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়ালেন। মাসুদুর রহমানও উঠে দাঁড়াল। মোফাজ্জল সাহেব পড়ে যাবার উপক্রম করতেই সে দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলল তাঁকে, আবার বসিয়ে দিল সোফায়, 'নার্ভাস হবেন না, মি. ফেরদৌস। আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি মনে করি…'

সিধে হয়ে সোফায় বসে ঠক্ ঠক্ করে রাগে কাঁপছেন মোফাজ্জল সাহেব, 'সেই সোমবার থেকেই আমার স্ত্রীর কোন খবর নেই অথচ তা আমাকে জানানো হয়নি। আপনারা মানুষ না গরু? কি ধরনের হোটেল এটা? কিছু একটা ঘটেছে, আপনারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন—মাই গড! এসব কি শুনছি আমি!'

মাসুদুর রহমান দুঃখ বোধ করল মোফাজ্জল সাহেবের জন্যে। নিজের চাকুরি জীবনের প্রতি চটে উঠল সে। নিরীহ, ভাল মানুষ একজন স্বামী, তাঁকে তাঁর স্ত্রীর নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে—গোটা ব্যাপারটাই অপ্রীতিকর। কিন্তু কর্তব্য কর্তব্যই।

'দেখুন, মি. ফেরদৌস, আমরা কিছুই লুকাচ্ছি না। আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। একজন ডাক্তারকে বরং ডেকে পাঠাই আমি।'

মোফাজ্জল সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠাট্টা করছেন নাকি? ডাক্তার নয়, আমি আমার স্ত্রীকে চাই! কোথায় সে? আপনার কথা যদি সত্যি হয়, সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে তার সন্ধান নেই একথা যদি সত্যি হয়—এই ক'দিন ঘাস কাটছিলেন নাকি আপনারা? আমাকে খবর দেননি কেন? পুলিশকে খবর দেননি কেন?'

মোফাজ্জল সাহেব আবার উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি শুরু করলেন তিনি, 'ওহ্ গড! শাহানা আজ পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ…তাকে খোঁজার কোন চেষ্টাই এরা করেনি! অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য! কোথায় পাঠিয়েছিলাম তাকে আমি…কেন পাঠিয়েছিলাম! এরা মানুষ না কি! আমি এখন…হায় খোদা! কি করব এখন আমি…'

'মি. ফেরদৌস, প্লীজ! একটু শান্ত হোন আপনি। মাথা ঠাণ্ডা করে সমস্যাটা একবার খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রী পাঁচ রাত বাইরে কাটিয়েছেন, অন্য কোথাও। আমাদের হোটেলে থাকার কথা ছিল তাঁর কিন্তু তা তিনি থাকেননি। হয়তো কোন আত্মীয়ের বাড়ি, কোন বন্ধু বা বান্ধবীর বাড়িতে আছেন…তিনি তো আর জানতেন না যে আপনি হঠাৎ ঢাকায় এসে পড়বেন।'

মোফাজ্জল সাহেব আচমকা পায়চারি থামিয়ে মাসুদুর রহমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লেন। পলকহীন চোখ দুটো অঙ্গারের টুকরোর মত জ্বলছে। মনে হলো, এই বুঝি কষে চড় মারবেন মাসুদুর রহমানের গালে।

মাসুদুর রহমানও নড়তে সাহস পেল না। কথা বললেই বিপদ ঘটবে, বুঝতে পারছে সে। পরস্পর পরস্পরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। দাঁতে দাঁত চেপে মোফাজ্জল সাহেব একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'নন্‌সেন্স!'

ছিটকে সরে গেলেন তিনি। অস্থিরভাবে কার্পেটের উপর পায়চারি শুরু করলেন। মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছেন। বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছেন।

বোবা মূর্তির মত দেখতে লাগল মাসুদুর রহমান মোফাজ্জল সাহেবের অসহায় অবস্থা।

একসময় দাঁড়ালেন তিনি, মাসুদুর রহমানের দিকে তাকালেন। মাসুদুর রহমান দেখল দুই চোখ ভরা পানি মোফাজ্জল সাহেবের। রুদ্ধ গলায় তিনি বললেন, 'সোমবার সন্ধ্যার পর ফোন করেছিল আমাকে শাহানা। ঢাকায় ওর একমাত্র আত্মীয়ের বাড়ি আছে, তাদের সাথে সম্পর্ক ভাল নয়। ফোনে সে আমাকে বলেছিল, ওদের বাড়িতে থাকা সম্ভব নয় বলে আমি হোটেলে উঠেছি। ঢাকার আর কাউকে চেনে না সে। হঠাৎ যদি কারও সাথে পরিচয় হয়েও থাকে, তার সাথে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কোন কারণে যদি হোটেল ত্যাগ করার দরকার হত, সবচেয়ে আগে সে ফোন করে আমার সাথে পরামর্শ করত। না-না! শাহানা নিজের ইচ্ছায় হোটেল ছেড়ে এতদিন বাইরে থাকতে পারে না—অসম্ভব!'

ধপ্ করে সোফায় বসে পড়লেন তিনি। দুই হাতে মুখ ঢাকলেন।

মাসুদুর রহমান বলল, 'সম্পূর্ণ ঘটনাটা আমি জানি না, তা ঠিক। আমার বস্, চীফ সিকিউরিটি অফিসার মি. আবদুস সামাদ তাঁর চেম্বারে আসবেন সকাল ন'টায়। তিনি হয়তো আরও তথ্য জানেন। ততক্ষণ আপনি স্থির হয়ে বিশ্রাম নিন, মি. ফেরদৌস। দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়লে এই পরিস্থিতিতে কোন লাভ নেই, তাই না?'

মোফাজ্জল সাহেবের ভারি দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠল। দুই হাতে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। অসহায় শিশুর মত ভেঙে পড়লেন অদম্য কান্নায়।

পাঁচ

সোফায় সিধে হয়ে বসে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসছে মহুয়া। ফোনের রিসিভারটা ওর কানে ঠেকানো। কামালের সাথে কথা বলছে ও।

শহীদ সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে ড্রয়িংরুমে এসে বসেছে। মহুয়ার মুখোমুখি সোফায় বসে সেদিনেরই একটা ইংরেজি দৈনিকের পাতায় চোখ বুলাচ্ছে।

হঠাৎ হেসে উঠল মহুয়া খিলখিল করে। বলল, 'তোমার কপালে বিয়ে নেই। শুধু তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে! তোমার বন্ধু বোধহয় বিয়েটা চায় না। সেই তো তারিখ বদলাচ্ছে বারবার। ইদানীং নাকি খুব কাজের চাপ, নতুন ব্যবসায় হাত দিয়েছে মাত্র—এসব আসলে অজুহাত। বোনটাকে তোমার মত একজন বেকার যুবকের হাতে দিতে চায় না সম্ভবত। আমি বলি কি, লীনাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও...'

অপরপ্রান্ত থেকে কামাল বলল, 'মহুয়াদি, মাথা কি তোমার খারাপ হয়ে গেছে! তুমিই না বললে শহীদ ড্রয়িংরুমে রয়েছে...'

'রয়েছেই তো! তাতে কি হলো? আমি বাবা সত্যি কথা সবার মুখের ওপরই বলি। তা যাক গে। তোমার সান্ধ্য-দৈনিক যোগফলের খবর কি? সারকুলেশন বাড়ল কিছু?'

কামাল বলল, 'বাড়ল কিছু মানে? জানো, চলতি মাসের এক তারিখ থেকে শুধু ঢাকার জন্য দৈনিক ছাপছি আমরা পনেরো হাজার।'

'সুখবর, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপদের দেখা পাবে অচিরেই, দেখে নিয়ো। যে-হারে অপরাধীদের নাম-ধাম ছবি ছাপছ...'

কামাল বলল, 'আমার পত্রিকার নীতিই হলো, ঢাকা শহরে ঘটে যাওয়া দৈনন্দিন অপরাধের সংবাদ প্রকাশ করা, অপরাধ দমনের পন্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা, আইনরক্ষক কর্তৃপক্ষকে উপদেশ দেয়া এবং অপরাধীদের পরিচয় প্রকাশ করে দেয়া।'

মহুয়া বলল, 'কয়লাকে যতই ধোও ময়লা তার দূর হয় না। তোমার আর তোমার বন্ধুর রক্তে আছে গোয়ার্তুমি। বিপদের মধ্যে এক সেকেণ্ড না থাকলে স্বস্তি পাও না। যাক এসব কথা নিয়ে বিয়ে হবার পর থেকে অনেক ঝগড়া করেছি, আর নয়। যা ইচ্ছা করো তোমরা...'

কলিংবেলের শব্দ হতে মহুয়া তাকাল শহীদের দিকে। শহীদ খবরের কাগজটা একপাশে রেখে তেপয়ের উপর থেকে পাইপ এবং টোবাকোর কৌটোটা তুলে নিল। পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, অর্থাৎ কোনে কার সাথে কথা বলা হচ্ছে জানতে চাইল ও।

ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে মহুয়া বলল, 'কামাল।'

শহীদ বলল, 'অনেকদিন হলো আসে না ও। খুব ব্যস্ত বুঝি পত্রিকা নিয়ে? আজ ওর প্রেসে একবার যাব।'

মহুয়া মুখ কালো করে বলল, 'খুবই ব্যস্ত। বলল, শহীদের পরামর্শটা আরও আগে গ্রহণ করা উচিত ছিল। তাহলে নাকি পত্রিকার সারকুলেশন পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছে যেত। এখন মাত্র পনেরো হাজার।'

লেবু ড্রয়িংরুমের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। 'দাদামণি, এ-এ-এক ভদ্-দ্-দ্রলোক...।'

'এক ভদ্রলোক এসেছেন। কি চান তিনি?'

'আ-আ প্-'

'আমাকে চান। কি নাম?'

'তা-তা-তা-তা-'

'তাজুদ্দিন?'

'না। তা-তা তো-তি-তিনি ব-ব-'

'তা বলেননি। ঠিক আছে, নিয়ে আয় সাথে করে। এই ভদ্রলোকই সম্ভবত খানিক আগে ফোন করেছিলেন।'

লেবু চলে যেতে মহুয়া উঠল সোফা ছেড়ে, জানতে চাইল, 'এই সকাল বেলা কে গো?'

শহীদ পাইপে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ নীল ধোঁয়া উদ্গীরণ করল, চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌস। ভদ্রলোক মারাত্মক কোন বিপদে পড়েছেন সম্ভবত। খানিক আগে ফোনে কথা বলার সময় ব্যাপারটা টের

পেয়েছি। ভদ্রলোকের গলা কাঁপছিল।

মহুয়া ড্রয়িংরুমের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মন্তব্য করল, 'বিপদে পড়লেই লোকে তোমার কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে আসে। কিন্তু তুমি যদি বিপদে পড়ো তাহলে তারা কি তোমাকে সাহায্য করতে আসবে?'

শহীদ উত্তর দেবার চেষ্টা না করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মচ্ মচ্ শব্দে জুতো পায়ে কেউ এগিয়ে আসছে বারান্দার উপর দিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে। দ্রুত, ব্যস্ত পদক্ষেপ—শব্দটা কান খাড়া করে শুনতে লাগল শহীদ। ড্রয়িংরুমের দরজার ঠিক বাইরে থামল সেই শব্দ। পর্দাটা দুলে উঠল, সরে গেল একপাশে, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন মোফাজ্জল সাহেব।

মোফাজ্জল সাহেবকে এক নজর দেখেই অনেক কিছু বুঝতে পারল শহীদ। চোখ দুটো লাল এবং ফোলা ফোলা দেখে সন্দেহ রইল না ওর, ভদ্রলোক খানিক আগে কেঁদেছেন। ভদ্রলোক সকালে দাড়ি কামাননি, স্নান করেননি, সম্ভবত নাস্তা করাও হয়ে ওঠেনি।

সোজা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন মোফাজ্জল সাহেব, 'মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌস, আমিই ফোন করেছিলাম। আপনি মি. শহীদ খান?'

করমর্দন করে শহীদ বলল, 'আমিই। বসুন, মি. ফেরদৌস। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

মুখোমুখি সোফায় বসে মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'ফোন গাইড দেখে প্রথমে আপনার নামটাই পেলাম। লেখা রয়েছে দেখলাম, আপনি প্রফেশনাল নন। তবু আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতে চাই না বলে সোজা আপনার কাছেই এসেছি। আপনি আমার কেস গ্রহণ করবেন কিনা ঠিক জানি না···।'

শহীদ পাইপে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিল। বলল, 'সব কেস আমি নিই না, সত্যি কথা। কিন্তু সেটা পরে বিবেচ্য। আপনার সমস্যাটা কি জানতে হবে আগে।'

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'আমার স্ত্রী হারিয়ে গেছেন। আজ পাঁচ দিন হলো তার কোন সন্ধান নেই। কেউ ব্যাপারটা নিয়ে এক সেকেণ্ডও মাথা ঘামায়নি। একদল গরু এমন ভয়ঙ্কর একটা ঘটনাকে গুরুত্বই দেয়নি। মি. শহীদ, ফর গডস্ সেক, আপনি যেভাবে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করুন। ওদেরকে আমি এখন কিছুই বলব না। শাহানার সন্ধান পাই, তারপর বলদগুলোকে আমি উচিত শিক্ষা দেব···।'

শহীদ বলল, 'বলদ বা গরু—কারা তারা?'

'ক্যাপিটাল হোটেলের চীফ্ সিকিউরিটি অফিসার, এক নম্বর গরু। সহকারী মাসুদুর রহমান, দুই নম্বর গরু। ভেবে দেখুন মি. শহীদ, আমার স্ত্রী ওদের হোটেল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন আজ পাঁচদিন হলো অথচ ওরা আমাকে বা পুলিশকে একটা খবর দেয়নি। কী নির্বোধ আচরণ ভাবুন একবার! ওদের নামে আমি কেস করব, বিলীভ মি···।'

শহীদ বলল, 'উত্তেজিত হবেন না, মি. ফেরদৌস। আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে ধীরে সুস্থে বলুন দেখি।'

মোফাজ্জল সাহেব সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। শহীদ লক্ষ করল ভদ্রলোকের হাত কাঁপছে।

'প্রথম থেকেই বলি।' কথাটা বলে কিভাবে শুরু করবেন ভেবে ইতস্তত করতে লাগলেন মোফাজ্জল সাহেব। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখ খুললেন, 'আজ এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে আমাদের। গত রবিবার দিন আমাদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকী পালন করেছি আমরা। বিয়ের এক দিন পরই আমি শাহানাকে বলেছিলাম, বছরে অন্তত একবার আমরা পরস্পরকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাব। আমার বক্তব্য ছিল এতে করে স্বামী স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বাড়বে।'

দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে ধরে মন্তব্য করল শহীদ, 'সুন্দর বক্তব্য।'

'কথাটা আমরা কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ল বিয়ে বার্ষিকীর দিন সকাল বেলা। ওর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আগামীকালই ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবে ও। সেদিনই প্লেনের টিকেট কাটা হলো। শাহানা, আমার স্ত্রী, অবশ্য ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু আমার উৎসাহ দেখে শেষ পর্যন্ত ও রাজি হয়। বুঝতেই পারছেন এই অঘটনের জন্য নিজেকেই আমি দায়ী বলে ভাবছি। খোদা না করুন, শাহানার যদি কিছু ঘটে থাকে—সারাজীবন দগ্ধাব আমি, ক্ষমা করতে পারব না নিজেকে...'

শহীদ বাধা দিল বলল, 'তারপরের ঘটনাগুলো বলুন।'

'ঠিক হয় শাহানা তার মামার বাড়িতে আসবে। মামা অবশ্য বেঁচে নেই। মামী-মা তাঁর তিন পুত্র-সন্তানকে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। আর্থিক অবস্থা তাঁদের ভাল নয়। শাহানার বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুরের সাথে ওদের সম্পর্কও ভাল ছিল না। আমার শ্বশুর মামা-শ্বশুরের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা লোন হিসেবে নিয়েছিলেন। সে-টাকা পরিশোধ করার আগেই তিনি মারা যান। তারও আগে মারা যান আমার মামা-শ্বশুর। মামা-শ্বশুর মারা যান একটা দুর্ঘটনায়। আমার শ্বশুরের সাথে তিনি শিকার করতে গিয়ে নৌকাডুবীতে মারা যান। এ ব্যাপারে শাহানার মামী-মার সন্দেহ, আমার শ্বশুর ধার করা টাকা মেরে দেবার জন্য তাঁর স্বামীকে ষড়যন্ত্র করে শিকার করতে নিয়ে যাবার নাম করে ডুবিয়ে মারেন।'

'হুঁ। বলে যান।'

একটু যেন গম্ভীরই দেখায় শহীদকে।

'এসব কথা আমি শুনেছি বিয়ের পর শাহানার মুখে। শোনার পর আমি বলেছিলাম, শ্বশুরের দেনাটা আমিই পরিশোধ করব। শ্বশুরের কোন পুত্রসন্তান বা কন্যাসন্তান, একমাত্র শাহানা ছাড়া কেউ নেই। গত রবিবার দিন শাহানাকে আমি বলি, আপাতত তিন হাজার টাকা তোমার মামী-মাকে দিয়ে এসো, পরে বাকিটা দেয়া যাবে। ঠিক হয় শাহানা ওর মামার বাড়িতেই প্রথমে উঠবে। সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে সে। কিন্তু সম্পর্কটা আবার জোড়া লাগবে কিনা সে ব্যাপারে আমার তো সন্দেহ ছিলই, শাহানারও সন্দেহ ছিল। সেজন্যে ঠিক করা হয়, মামী-মা যদি বিরূপ ব্যবহার করেন শাহানা তাহলে বড় কোন হোটেলে উঠবে।'

মোফাজ্জল সাহেব সিগারেট টানলেন কিছুক্ষণ। বলতে শুরু করলেন আবার, 'যাক, আমাদের সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হয়। সোমবার দিন বিকালের ফ্লাইটে ঢাকায় আসে শাহানা। সন্ধ্যার পর ঢাকা থেকে আমার চট্টগ্রাম অফিসে ফোন করে ও। বলে, মামী-মা ওর সাথে ভাল ব্যবহার করেননি, তাই সে ক্যাপিটাল হোটেলে উঠেছে।'

'তারপর? আপনি ঢাকায় এলেন কবে? কেন?'

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'ফোনে কথা হয়, দু'দিন পর আবার ফোন করে খবরাখবর দেবে শাহানা। কিন্তু ফোন সে করেনি। আমিও কাজের চাপে সময় পাইনি ওকে ফোন করার। গতকাল সকালে এক জুট মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে মেশিন পার্টস ইমপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে জরুরী পরামর্শ দেবার প্রয়োজন দেখা দেয় হঠাৎ। কয়েক কোটি টাকার মেশিন পার্টস ইমপোর্ট করার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল ভদ্রলোকের সাথে বেশ কিছুদিন থেকে। কমিশনের হার নিয়ে মত-বিরোধ চলছিল আমাদের সাথে। আকস্মিকভাবে আমরা বিদেশী মেশিন পার্টস ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে মূল্যহ্রাস সংক্রান্ত একটা নিউজ পাই। ফলে নতুন করে হিসেব কষে আমরা সিদ্ধান্ত নিই জুট মিল কর্তৃপক্ষের দেয়া কমিশনের হার কম হলেও আমরা কাজটা করে দেব, পার্টসের দাম কমেছে বলে আমাদের লাভের হার বাড়বে বৈ কমবে না। পরামর্শ করার জন্য গতকাল বারোটার দিকে আমি গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাই। মিলটা ফেনীতে। ওখানে আমি পৌছাই বিকেলে। কিন্তু মিলে পৌছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে পাইনি। তিনি অসুস্থ, ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি দিনাজপুরে চলে গেছেন। অন্যান্য অফিসারদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু কোন ফাইনাল সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয়নি। সে যাই হোক, ব্যর্থ হয়ে চট্টগ্রাম ফিরে যাবার জন্য গাড়িতে উঠি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় শাহানার কথা। একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিলে মন্দ হয় না। শাহানা অবাকও হবে, খুশিও হবে। এই কথা ভেবে আমি গাড়ি নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিই। কিন্তু দাউদকান্দিতে পৌছে দেখি ফেরী ডুবে গেছে। প্রচুর ভিড় যানবাহনের। নতুন ফেরী আসবে, তবে কখন আসবে তার কোন ঠিক নেই। এদিকে রাতও হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা ফেরীর জন্য অপেক্ষা করব, ঠিক করলাম। যাক, ফেরী পেলাম রাত দুটোর দিকে। ঢাকায় পৌছুলাম আমি পাঁচটার সময়।'

মোফাজ্জল সাহেব ড্রয়িংরুমের দরজার দিকে তাকালেন। লেবু ঢুকল ভিতরে। তার হাতে একটা ট্রে, তাতে নানা-রকম উপাদেয় খাবার সাজানো রয়েছে।

শহীদ বেশ একটু অবাক হলেও ওর মুখের চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। বলল, 'মি. ফেরদৌস, সম্ভবত ব্রেকফাস্টও সারা হয়নি আপনার। নিঃসঙ্কোচে সেরে ফেলুন। খেতে খেতে বলুন পরবর্তী ঘটনাটুকু।'

'আপনি!'

শহীদ বলল, 'আমি সেরেছি।'

মোফাজ্জল সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। লেবু তাঁর সামনের নিচু টেবিলে ট্রেটা রাখতে তিনি মাখন দেয়া রুটি তুলে নিলেন, কামড় দিলেন ছোট্ট করে।

বললেন, 'হোটেলে ঢুকে ক্লার্ককে আমার স্ত্রীর স্যুইট নাম্বার দিতে বললাম। উদ্ভট আরচণ করল লোকটা। নাম্বার না দিয়ে সে ইন্টারকমে হোটেলের সহকারী সিকিউরিটি অফিসারকে ডাকল। মোট কথা, হোটেলের সবাই আমার সাথে রহস্যময় ব্যবহার করতে শুরু করল। সহকারী সিকিউরিটি অফিসার আমার নাম-ধাম-পরিচয় জানতে চাইল। আমি যে শাহানার স্বামী তা প্রমাণ করতে বলল। রীতিমত অপমান বোধ করেছি আমি ওদের আচরণে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ছয়তলার বাহাত্তর নাম্বার স্যুইটে ঢুকলাম আমরা। এতক্ষণ লোকটা শাহানার নিখোঁজ সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলেনি। শাহানা স্যুইটের ভিতর নেই দেখে আমি স্বভাবতই ঘাবড়ে যাই। লোকটা তখন আমাকে জানায় যে শাহানা গত সোমবার দিন সন্ধ্যার সময় হোটেলে উঠেছিল ঠিক, কিন্তু খানিক পর সে বেরিয়ে যায়, তারপর আর ফেরেনি। আমি জানতে চাই, পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে কিনা। আমাকেই বা তারা খবর দেয়নি কেন। আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেনি তারা। তাদের ধারণা, শাহানা কোন বিপদে পড়েনি। কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সাথে কোথাও বেড়াতে গেছে। ভেবে দেখুন, মি. শহীদ, কি ধরনের নন্‌সেন্স লোকগুলো।'

শহীদ পাইপ থেকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'ওদের ব্যাখ্যাটা আপনার মনঃপূত হচ্ছে না, এই তো!'

'নিশ্চয়ই হচ্ছে না! আমার স্ত্রীকে আমি চিনি, মি. শহীদ। একটিমাত্র আত্মীয়-বাড়ি ছাড়া ঢাকায় কোথাও যাবার জায়গা নেই তার। বন্ধু-বান্ধব—কেউ নেই তার ঢাকায়। নতুন কারও সাথে পরিচয় হলেও তার সাথে পাঁচ-পাঁচটা দিন কাটাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওদের বক্তব্য শুনে আমার শরীরে আগুন ধরে গেছে, মি. শহীদ। ওদের ধারণা, আমার স্ত্রী ঢাকায় এসে পর-পুরুষদের সাথে যেচে পড়ে পরিচয় করে তাদের সাথে ফুর্তি করার জন্য বাইরে বাইরে রাত কাটাচ্ছে। অথচ, শাহানা···মি. শহীদ! প্লীজ ডু সামথিং ফর হার। আমার স্ত্রী বলে বলছি না, আমি জানি শাহানা অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্না, শিক্ষিতা এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্না মেয়ে। খারাপ কোন আচরণই তার দ্বারা সম্ভব নয়।'

শহীদ একটু চিন্তিতভাবেই বলল, 'কিন্তু ক্যাপিটাল হোটেলের চীফ সিকিউরিটি অফিসার আবদুস সামাদকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। সে যোগ্য লোকই, মি. ফেরদৌস। মিথ্যে অনুমান করার লোক সে নয়।'

মোফাজ্জল সাহেব হাতের সিদ্ধ ডিম প্লেটে নামিয়ে রেখে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেন, 'মি. শহীদ! আপনিও ওদের দলে! আপনিও ভাবছেন যে···?'

শহীদ বলল, 'আমি এখনও কিছু ভাবছি না। সামাদের ভুলও হতে পারে। সামাদের ব্যাপারটা কি জানেন, সে ক্যাপিটাল হোটেলের সিকিউরিটি চীফ। হোটেলের স্বার্থ দেখাই তার দায়িত্ব।'

'তিনি নিজেই কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে।'

শহীদ বলল, 'ওদের ওপর খেপছেন আপনি অকারণে। কারণটা বলি, শুনুন। ঢাকার বড় বড় হোটেলগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, কর্তৃপক্ষ গেস্টদের ব্যক্তিগত জীবন

সম্পর্কে মাথা ঘামায় না। গেস্টদের নিজস্ব ব্যাপারে এরা নাক গলায় না। গেস্টরাও এটা পছন্দ করেন না। এমন অনেক ধনী পুরুষ এবং নারী আছেন যাঁরা বড় বড় হোটেলে ওঠেন শুধু প্রাইভেসী বিঘ্নিত হবে না এই নিশ্চয়তা আছে বলে। ভেবে দেখুন, একজন পুরুষ গেস্ট কোন বড় হোটেলে উঠল। সে যদি পর পর কয়েক দিন হোটেলে না ফেরে তাহলে হোটেল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য কি হবে? খবর দেয়া যেতে পারে গেস্ট লোকটার বাড়িতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণত দেখা যায় গেস্ট লোকটা তার কোন প্রেমিকাকে নিয়ে ঢাকার বাইরে বেড়াতে গেছে। এদিকে তার খোঁজ নেই দেখে তার স্ত্রী পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে সেই গেস্টকে আবিষ্কার করল প্রেমিকার সাথে। ফলাফল কি বুঝতে পারছেন তো? স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গেল গেস্ট। তাদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হবার উপক্রম হলো। এরকম ক্ষেত্রে গেস্ট লোকটার কি ধারণা হবে হোটেলটা সম্পর্কে?'

মোফাজ্জল সাহেবের মুখ দিয়ে কথা বের হলো না। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হলো, খেপে গেছেন তিনি শহীদের উপর, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়িংরুম থেকে গট গট করে বেরিয়ে যাবেন তিনি।

কিন্তু সোফায় বসে বসেই তিনি বললেন, 'বুঝেছি। আমার স্ত্রীকে আপনারা কেউ চেনেন না, ওর সম্পর্কে আমার বক্তব্যও আপনারা কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নন।'

শহীদ বলল, 'ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু আবদুস সামাদের ধারণাটা যে অযৌক্তিক নয় তাই ব্যাখ্যা করে বললাম। আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে সে হয়তো ভুল করেছে। আপনার স্ত্রী সম্পর্কে আপনার স্টাডি যদি সত্যি হয়, তাহলে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে—সন্দেহ নেই। ভদ্রমহিলা বিপদে পড়েছেন...'

'বিপদে পড়েছে! মি. শহীদ, প্লীজ! যত টাকা লাগে দেব আমি, আপনি ওকে খুঁজে বের করুন...আচ্ছা, কি ধরনের বিপদে পড়তে পারে বলুন তো? আমি... আমি...'

শহীদ বলল, 'মুষড়ে পড়বেন না, মি. ফেরদৌস। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তাভাবনা করে এগোতে হবে আমাদেরকে...'

'আপনি কেসটা গ্রহণ করছেন তাহলে?'

'এখনও কথা দিচ্ছি না। খুব একটা ইন্টারেস্টিং কেস ছাড়া আমি নিজেকে জড়াই না। সেটা পরে জানা যাবে, তাই না? আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'বলুন,' গ্লাসের পানি এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বললেন মোফাজ্জল সাহেব।

'আপনার স্ত্রীর মামী-মার সাথে কথা বলেছেন?'

'গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। শাহানার মামাতো ভাইটির সাথে কথা হয়েছে। তাকে নাকি শাহানা প্রথম দিনই, রাত বারোটার সময়, হোটেলে একবার যেতে বলেছিল। গিয়েও ছিল সে। কিন্তু রিসেপশনে গিয়ে জানতে পারে শাহানা ফেরেনি। ফিরে আসে সে এরপর। পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে যাবার কথা ছিল শাহানার। বুঝতেই পারছেন, যায়নি ও।'

'আপনার কাছে আপনার স্ত্রীর কোন ফটো আছে?'

মোফাজ্জল সাহেব মানিব্যাগ বের করলেন কোটের পকেট থেকে। বললেন, 'আছে। দুটো ছিল। একটা সি.আই.ডি অফিসার মি. সিম্পসন চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু কেন যে নিলেন বুঝলাম না। আমি বলেছিলাম, খবরের কাগজে শাহানার ছবিসহ নিখোঁজ সংবাদটা ছাপার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু খুব ইন্টারস্টেড মনে হলো না তাঁকে।'

হাত বাড়িয়ে পাসপোর্ট সাইজের ফটোটা নিল শহীদ। শাহানা যে অপূর্ব সুন্দরী তা ছবি দেখেই বুঝতে পারল ও। সুন্দরী মেয়েদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

'পাবলিসিটিতে আপত্তি নেই আপনার তাহলে?' প্রশ্ন করল শহীদ।

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'মি. শহীদ, আমি আমার স্ত্রীর সন্ধান চাই। যে-কোন মূল্যে, যে-কোন পদ্ধতিতে শাহানাকে চাই আমি। আমার সম্মানের চেয়ে আমার স্ত্রী আমার কাছে প্রিয়। যা সত্য তা প্রকাশ পেলেও কিছু যায় আসে না। আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন তো? আমি শাহানাকে চিনি। ওকে বিশ্বাস করি। আমার সম্মান যাবে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করতে পারে না ও। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। আমি···আমি ভাবতে ভয় পাচ্ছি···ভয় পাচ্ছি···'

শহীদ বলে উঠল, 'ঠিক আছে। ছবিটা আজকের সান্ধ্য-দৈনিক যোগফলে ছাপা যেতে পারে। এবার কিছু তথ্য চাই আমি—আপনার এবং আপনার স্ত্রী সম্পর্কে।'

শহীদ পকেট থেকে একটা ছোট নোট বই বের করল, সাথে কলম।

'বলুন কি জানতে চান।'

'পুরো নামসহ আপনার স্থায়ী-অস্থায়ী ঠিকানা। আপনার ব্যবসা-কেন্দ্রের ঠিকানা। আপনাদের বয়স। ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত খবর। ক'জন চাকর-বাকর, তারা ফুল টাইম না পার্ট টাইম। এবং আপনার স্ত্রীর বিয়ের পূর্ব-ইতিহাস। প্রথমটা দিয়ে শুরু করা যাক। নাম ঠিকানা বলুন।'

প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন মোফাজ্জল সাহেব।

শহীদের প্রশ্নেরও সংখ্যা নেই। একটার পর একটা তথ্য জানতে চাইছে ও। সর্বশেষ প্রশ্নটা শুনে মোফাজ্জল সাহেব বিরক্তিই প্রকাশ করলেন। 'কিন্তু আমার স্ত্রী কোন্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে তা জেনে কি লাভ আপনার?'

শহীদ বলল, 'লাভ অলাভ আমার বোঝবার ব্যাপার। আপনি উত্তর দিন।'

'কিন্তু···।'

শহীদ বলল, 'ইচ্ছা করলে আপনি উত্তর না-ও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি নোট করব, মি. ফেরদৌস এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন।'

'না-না। উত্তর দিতে অস্বীকার করছি না আমি। লিখুন, বলছি।' স্কুলের নামটা বললেন মোফাজ্জল সাহেব।

শহীদ পরবর্তী প্রশ্ন করল, 'আপনার স্ত্রী কি চাকরি-বাকরি করতেন বিয়ের

আগে?'

'চাকরি ঠিক না। ও তো অভিনেত্রী ছিল। খুব সাকসেসফুল, সন্দেহ নেই। চট্টগ্রাম মঞ্চ জগতের রানী বলা হত ওকে। তবে বিয়ের পর অভিনয় ছেড়ে দিয়েছে।'

'কার ইচ্ছায়?'

'অবশ্যই নিজের।'

শহীদ বলল, 'দেখা যাচ্ছে আপনার স্ত্রীর বব্-কাটা চুল। কোথায় চুল কাটাতেন তিনি? মানে, হেয়ার ড্রেসারের নাম জানতে চাইছি।'

'মি. শহীদ...' আবার আপত্তি প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন মোফাজ্জল সাহেব।

শহীদ বলল, 'ইচ্ছা করলে উত্তর নাও দিতে পারেন।'

গম্ভীর হলেন মোফাজ্জল সাহেব। বললেন, 'ঠিক আছে। স্বীকার করছি আপনার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। যাই হোক, লিখুন।'

লিখে নিল শহীদ, তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনার স্ত্রীর সাথে কিভাবে পরিচয় হয় আপনার?'

'ওর অভিনীত নাটক দেখতে যাই। আমিই উপযাচক হয়ে পরিচয় করি। ওকে ভাল লাগে আমার। কিন্তু সে-কথা ওকে জানাইনি। মাঝেমধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করতাম। ওর বাড়িতেও নিমন্ত্রণ করত মাঝে মাঝে আমাকে। মাস দু'য়েক পর প্রস্তাবটা দিই। সাথে সাথে সম্মতি প্রকাশ করে ও। আমাকে ও-ও ভালবাসত পরিচয়ের প্রথম পর্যায় থেকেই।

'আপনার স্ত্রীর দৈহিক বর্ণনা প্রয়োজন।'

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'পঁচিশ বছর বয়স ওর। লম্বাই বলা যায়, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। একশো বিশ পাউণ্ডের মত ওজন। ফটোতেই তো দেখছেন, অসাধারণ সুন্দরী। সেটাই ভয়ের কারণ।'

'হুঁ। এবার আপনার স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবদের নাম ঠিকানা যদি দেন...'

'দেখুন, মি. শহীদ, আপনি যদি ভেবে থাকেন আমার স্ত্রী সম্পর্কে কোন তথ্য চেপে রাখতে চাইছি তাহলে মস্ত ভুল করবেন। শাহানা বিপদে পড়েছে, তার কোন হদিশ নেই—ঘটনাটার গুরুত্ব কতটুকু তা আমার চেয়ে আপনি বেশি বোঝেন না। ওকে আমি ফেরত চাই। সেজন্যেই আপনার সাহায্য নিতে এসেছি। আমি জানি ওর সম্পর্কে কোন তথ্য আপনার অজানা থাকলে ওকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে আপনার। সেটা আমার কাম্য নয়। আপনাকে একবার বলেছি, আবারও বলছি, ঢাকায় ওর কোন বন্ধুই নেই। দয়া করে কথাটা বিশ্বাস করুন।'

শহীদ বলল, 'বিশ্বাস করছি। কিন্তু আপনি যা জানেন তাই বলছেন। হয়তো আপনার স্ত্রী অন্যরকম জানেন। সে যাক...'

শহীদকে বাধা দিয়ে মোফাজ্জল সাহেব বললেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। কি বলতে চাইছেন আপনি? শাহানার বন্ধু আছে তা আমি জানি না? শাহানা সে-কথা আমার কাছে গোপন রেখেছে?'

শহীদ বলল, 'আপনি শিক্ষিত মানুষ, মি. ফেরদৌস। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আপনাকে জ্ঞান দান করা আমার সাজে না। কিন্তু একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি, সব সময় মানুষ নিজের স্ত্রীর সব কথা জানে না।'

মোফাজ্জল সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেল। মাথা নিচু করে গুম হয়ে বসে রইলেন তিনি।

'চট্টগ্রামে যারা আপনার স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ তাদের নাম ঠিকানাগুলো দিন।'

মোফাজ্জল সাহেব আর বাক-বিস্তার না করে চার পাঁচজন ভদ্রমহিলা এবং দু'জন ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা দিলেন। বললেন, 'এদের সাথে পরিচয় আছে শাহানার। এরা সবাই ওর এবং আমার—শুভানুধ্যায়ী। আর কারও নাম মনে পড়ছে না আমার এই মুহূর্তে। ব্যাপার কি জানেন, খুব বেশি লোকজনের সাথে মেলামেশা করি না আমরা। আমরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছি। এবং আমরা সুখী দম্পতি। কারও তরফ থেকেই ভালবাসার ভাঁটা পড়েনি। আমরা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি সব সময়, অন্য লোকের সাথে মেলামেশা করার সময় নেই।'

শহীদ পাইপে নতুন করে টোবাকো ভরতে ভরতে চিন্তা করছিল। ভদ্রলোককে দেখে, কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে স্ত্রীকে তিনি আদর্শ স্বামীর মতই ভালবাসেন। কিন্তু একটা ব্যাপার কেমন যেন সামান্য একটু বেখাপ্পা লাগছে। স্ত্রীকে তিনি একা সুদূর ঢাকায় পাঠিয়েছেন—এ থেকে বোঝা যায় স্ত্রীর স্বাধীনতা স্বীকার করেন তিনি। স্ত্রীকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করেন। কিন্তু ফেনী থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে ঢাকায় এসে স্ত্রীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করাটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে। ব্যাপারটার মধ্যে হয়তো কোন ঘোর-প্যাঁচ বা রহস্য নেই, তবু শহীদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা সামান্য হলেও, ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। বিশেষ করে ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য ছিল, স্ত্রীকে বছরে একবার দূরে পাঠিয়ে দেবেন দিন পনেরোর জন্যে, যাতে দাম্পত্য জীবন থেকে একঘেয়েমি, বৈচিত্র্যহীনতা দূর হয়, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে ওঠে। এইরকম পরিস্থিতিতে কেন তিনি স্ত্রীকে চমকে দেবার কথা ভাবলেন?

মোফাজ্জল সাহেব পকেট থেকে চেক বই বের করে জানতে চাইলেন, 'আপনার ফী সম্পর্কে আমার জানা নেই। কত টাকার চেক লিখব?'

শহীদ বলল, 'কেসের সমাধান হোক আগে, তারপর না হয় টাকার কথা ভাবা যাবে। সাধারণত আমি টাকা নিই না। একটি মাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে বা ক্ষেত্রে নিই। সে পরিস্থিতি দেখা দিলে আপনাকে আমি বলব।'

'সে কি কথা! আপনি বেগার খাটবেন কেন আমার জন্যে? না না, সেটা ভাল দেখায় না।'

শহীদ সোফা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, 'ফী আমি নিই না তার আরও একটা কারণ আছে, মি. ফেরদৌস। ফী যখন নিই তখন মোটা অঙ্কের নিই। আমার ডিমাণ্ড আপনি পূরণ করতে পারবেন না। সুতরাং, থাক।'

'একি বলছেন আপনি! সঙ্গত অঙ্কের মধ্যে হলে...'

শহীদ হাসতে হাসতে বলল, 'টাকার অঙ্কটা সঙ্গত আপনার কাছে মনে নাও হতে পারে, মি. ফেরদৌস।'

মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌস উঠে দাঁড়ালেন। শহীদের বাড়ানো হাতটা ধরে করমর্দন করলেন তিনি।

শহীদ বলল, 'ক্যাপিটালেই থাকছেন তো?'

'হ্যাঁ। শাহানার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও যাচ্ছি না…'

'ঠিক আছে। দরকার পড়লে যোগাযোগ করব আমি। গুড মর্নিং, মি. ফেরদৌস।'

'গুড মর্নিং।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন মোফাজ্জল সাহেব ড্রয়িংরুম থেকে। এক মুহূর্ত পর অপর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল মহুয়া।

শহীদ বলল, 'শুনেছ সব, না? কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝলাম না। ব্রেকফাস্ট পাঠিয়েছিলে কেন? এর আগে কোন ক্লায়েন্টকে তো তুমি এমন খাতির করোনি।'

মহুয়া সোফায় বসল। বলল, 'ভদ্রলোকের জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে আমার। তোমার কি মনে হলো বলো তো? স্ত্রীকে ভদ্রলোক প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছি আমি। চেহারাটা কেমন কালো হয়ে গেছে দেখেছ? বোঝাই যাচ্ছিল খাওয়াদাওয়া করার কথাও মনে নেই, স্ত্রীর জন্য পাগল পারা হয়ে গেছেন।'

শহীদ খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। মহুয়ার কথা যেন ওর কানেই যাচ্ছে না।

মহুয়া বলল, 'কি ভাবছ?'

তেপয়ের উপর থেকে মিসেস শাহানার ফটোটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল সে।

শহীদ জানালার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল, 'কি ভাবছি?. ভাবছি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং অতি ক্ষুদ্র মানব—দুটোই বড় রহস্যময়।'

'ওরে বাব্বা! দর্শন আওড়াচ্ছে যে!'

শহীদ সহাস্যে তাকাল স্ত্রীর দিকে। বলল, 'খানিক আগে কিছু যেন বলছিলে তুমি?'

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ, বলছিলাম। বলছিলাম, এতদিন তো তোমাকে একটা অনুরোধই করে এসেছি, খুন-খারাবি ইত্যাদির কাছ থেকে দূরে থাকো। কিন্তু আজ ঠিক তার উল্টো অনুরোধ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভদ্রলোকের স্ত্রীর চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে। এমন সুন্দরী মেয়ে, আজ পাঁচ দিন যার কোন খবর নেই…তাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না…। ভেবে দেখো, চরম দুঃসংবাদটা যখন পাবেন ভদ্রলোক, কি ভয়ানক শক্ পাবেন। বিশ্বাস করো, ভদ্রলোকের জন্য কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে আমারই। আমি মেয়েমানুষ, পারি না কিছু করতে। তাই তোমাকে বলছি, ভদ্রলোকের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করো। অক্ষত অবস্থায় যদি সন্ধান পাওয়া যায় তবে তো খুবই সুখের কথা। কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে তিনি বেঁচে নেই…তাহলে…তাহলে যে বা যারা দায়ী তাদেরকে তুমি ক্ষমা কোরো না।'

শহীদ বলল, 'তোমার ওই একটা অনুরোধ আমি রাখব। যে দায়ী তাকে ক্ষমা করব না। সন্তুষ্ট?'

'সন্তুষ্ট।'

শহীদ বলল, 'যদি ভদ্রলোকই দায়ী হয়ে থাকেন?'

মহুয়া চমকে উঠল। পরমুহূর্তে দ্রুত মাথা নাড়ল সে। অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে, তীব্র প্রতিবাদ জানাল, 'কি বললে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো? তুমি বলতে চাইছ স্ত্রীর নিখোঁজের ব্যাপারে ভদ্রলোক স্বয়ং দায়ী? লুকিয়ে রেখেছেন স্ত্রীকে? খুন করেছেন! অসম্ভব! আমি আমার একশো ভরি গহনা বাজি ধরে বলতে পারি, ভদ্রলোক এ ব্যাপারে নির্দোষ...'

শহীদ বলল, 'বাজি ধরতে আমি রাজি নই। বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় তোমার কাছে আমি হারছি। পরাজয়ের সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। তবে আশ্বাস দিচ্ছি, অপরাধীকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। ভাল কথা, ভদ্রলোকের দুঃখে তুমি দুঃখী, তাই না? তাঁর জন্য কিছু করারও ইচ্ছা রয়েছে তোমার। বেশ। রাসেলের নাম্বার জানো তো? হোস্টেলে থাকে ও...'

'জানি, জানি। কি করতে হবে তাই বলো।'

শহীদ বলল, 'ওকে ফোন করো। দেখো পাওয়া যায় কি না। মি. ফেরদৌসের কেস নিয়ে ওকে খানিকটা মাথা ঘামাবার সুযোগ দিই। দারুণ খুশি হবে ও সুযোগটা পেলে।'

মহুয়া রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল।

ছয়

ক্রীমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনটা থামল মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার ছয়তলা একটা বিল্ডিংয়ের সামনে। সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরনে, মুখে জ্বলন্ত পাইপ, চোখে সানগ্লাস, ক্লিনশেভড, স্মার্ট এবং সুদর্শন, চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি, পকেটে লোডেড রিভলভার—শখের গোয়েন্দা শহীদ খান নামল গাড়ি থেকে। দৃঢ়পায়ে গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল ও। বিল্ডিংটার ফার্স্ট ফ্লোরটা ভাড়া নিয়েছে ওরই সহকারী কামাল। গোটা ফার্স্ট ফ্লোর জুড়ে তার সান্ধ্য-পত্রিকা যোগফলের অফিস, কম্পোজ এবং মেশিন সেকশন।

ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে করিডোরের ডান দিকের একটা হল রুমে ঢুকল শহীদ। বার্তা বিভাগের সাংবাদিকরা রাজনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক করছিল। শহীদকে দেখেই তারা থামল, পরমুহূর্তে শশব্যস্ত হয়ে উঠল ওকে অভ্যর্থনা জানাতে।

সকলের উদ্দেশে মৃদু হেসে 'চীফ এডিটর' লেখা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল শহীদ। পর পর দু'বার এবং একটু বিরতি নিয়ে আর একবার নক্ করতেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হু ইজ দ্যাট?'

শহীদ উত্তর না দিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলে উঠল, 'তুই আমার সহকারী হবার যোগ্যতা হারাতে বসেছিস, কামাল। তোর কাছ থেকে আমি এই রকম গুরুতর ভুল আশা করি না।'

কামাল বলে উঠল, 'আয় আয়, বোস। তোকে হঠাৎ এভাবে আশা করিনি।

খবর দিলেই তো পারতিস। কিন্তু তোর সাঙ্কেতিক নক্ চিনতে না পারার কারণ সেটা নয়। কারণ হলো, বেলা বাজে সাড়ে এগারো—না, পৌনে বারোটা, অথচ পত্রিকার হেডলাইন কি যাবে তা এখনও ঠিক করতে পারিনি। হটকেক নিউজ একটাও নেই। হাউএভার, অপরাধ স্বীকার করছি। এবারের মত মাফ করে দে, ভবিষ্যতে আর হবে না।'

শহীদ ডেস্কের সামনে, কামালের মুখোমুখি একটা চেয়ার দখল করে বসল, বলল, 'এরপর দ্বিতীয়বার এই ভুল হলে তোকে আমি জানাবও না, সহকারীর পদ থেকে বরখাস্ত করব। কথাটা ভুলিস না। যাক। হটকেক নিউজ দরকার বলছিলি না? কফির অর্ডার দে, ব্যবস্থা করছি আমি। হটকেক নিউজ একটা আছে আমার কাছে। কিন্তু সেটা তোর পত্রিকার ভাগ্যে আছে কিনা তা আরও ঘণ্টা দু'য়েক পরে বিবেচনা করা যাবে।'

'বলিস কি, দোস্ত! মাইরি বলছি, তোকে আমি কফি তো খাওয়াবই, তার আগে চাইনিজও খেতে হবে তোকে।'

কলিং বেলে থাবা মারল কামাল। বিদেশী ফিলটার টিপড্ সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল হাতে। বলল, 'মাই গড! জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। নতুন কোন কেস পেয়েছিস নাকি রে?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কী সাংঘাতিক! আসল খবরই এতক্ষণ চেপে রেখেছিলি তুই। সূতো ছাড়, দোস্ত!'

পিয়ন ঢুকল দরজা ঠেলে। কামাল পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার দুটো নোট বের করে দিয়ে বলল, 'দুটো চাইনিজ ডিশ। গতকালের মেনু মনে আছে?'

'আছে, স্যার।'

'তাই আনবে।'

'জ্বী, স্যার।'

পিয়ন বেরিয়ে গেল। কামাল সাগ্রহে তাকাল শহীদের দিকে। বলল, 'বল্!'

শহীদ কোটের পকেট থেকে মিসেস শাহানার পাসপোর্ট সাইজের ফটোটা বের করে ডেস্কের উপর রাখল, বলল, 'মিসেস শাহানা। সোমবার রাত থেকে নিখোঁজ।'

ফটোটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে কামাল মন্তব্য করল, 'দারুণ ফটোজেনিক ফেস। অসাধারণ সুন্দরী, না রে? গত সোমবার রাতে···তার মানে আজ পাঁচ দিন। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে লাশটা পচে গেছে।'

শহীদ এক মনে পাইপ টানছে।

'ঘটনাটা কি?'

শহীদ বলল, 'তুই আগে ছবিটা ব্লক করতে পাঠিয়ে দে। তারপর বলছি কাহিনীটা। আর শোন্, এই ছবির কয়েকটা কপি করাবার ব্যবস্থাও কর্।'

কলিং বেলে আবার চাপড় মারল কামাল। অন্য একজন পিয়ন ঢুকল ভিতরে। ফটোটা তার হাতে দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সে। পিয়ন দ্রুত বেরিয়ে গেল

আবার। কামাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

মিনিট পনেরো কোন কথা না বলে পাইপ টানতে টানতে চিন্তা করল শহীদ। তারপর বলতে শুরু করল ঘটনাটা। কোন রকম মন্তব্য না করে মনোযোগ দিয়ে সবটুকু ঘটনা শুনল কামাল। শহীদ সবশেষে বলল, 'মিসেস শাহানার ছবিসহ খবরটা ছাপা উচিত কিনা তা আমি বলতে পারব ক্যাপিটাল হোটেলের সিকিউরিটি চীফ সামাদের সাথে কথা বলার পর। কেসটা সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার ধারণা নেই আমার। মি. ফেরদৌস মি. সিম্পসনের সাথেও দেখা করেছেন। মি. সিম্পসন এ সম্পর্কে কি ভাবছেন, কি করছেন তা-ও জানা দরকার।'

কামাল বলল, 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি অন্য কথা ভেবে। তুই কেসটা নিলি কেন? এটা তো একটা সাধারণ ব্যাপার। শহরে প্রতিদিন কত সুন্দরী মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে স্বামীদের কাছ থেকে। তারা আবার ফিরেও আসে কেউ কেউ, কেউ কেউ নতুন স্বামীর ঘর করার সিদ্ধান্ত নেয়, কোনদিনই তারা ফিরে আসে না।'

শহীদ বলল, 'এটা সাধারণ কেস বলে মনে হয়নি আমার, কামাল। ভদ্রলোক ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। একটা ব্যাপারে তিনি খুবই জোর দিচ্ছেন, তার স্ত্রী কিক্ পছন্দ করেন না। স্ত্রীর প্রতি দারুণ আস্থা তার। স্ত্রীর খোঁজ পাবেন না একথা তিনি ভাবতেই পারছেন না। থাক, রহস্য যত গভীরই হোক, প্রকাশ পাবেই আসল ঘটনা। কইরে, তোর চাইনিজ ডিশ কত দূরে?'

'এই এল বলে।' কামাল উত্তর দিতেই দরজা ঠেলে চাইনিজ ডিশ নিয়ে ভিতরে ঢুকল পিয়নটা।

শহীদ বলল, 'লাঞ্চ সেরে দেরি নয়, চল বেরিয়ে পড়ি।'

কামাল বলল, 'ঠিক হ্যায়। হটকেক নিউজও পাচ্ছি, প্রখ্যাত গোয়েন্দা শহীদ খানের সাথে থেকে রহস্যের কিনারা করার কাজেও যোগ দিচ্ছি—এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই রকম সুযোগ পাব বলেই তো পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম! অবশ্য তোর বুদ্ধিতেই...'

শহীদ বলল, 'কথা কম বল্। আমাকে একটু চিন্তা করতে দে।'

পিয়ন ওদের দু'জনার সামনে প্লেট সাজাতে শুরু করল।

বেলা দেড়টার সময় ওদেরকে দেখা গেল ক্যাপিটাল হোটেলের সিকিউরিটি অফিসার আবদুস সামাদের অফিস কক্ষে। শহীদ এবং কামালকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসিয়েছে আবদুস সামাদ। অবশ্য ওদেরকে দেখামাত্র সতর্ক হয়ে গেছে সে। কথাবার্তা বলছে খুব সাবধানে। তার কারণও আছে।

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ওরা আবদুস সামাদের বক্তব্য।

'একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। আমি হোটেলের স্বার্থ দেখার দায়িত্বে নিয়োজিত। অবশ্য গেস্টদের স্বার্থই হোটেলের স্বার্থ—এ-ও সত্যি, কিন্তু কোন গেস্ট যদি হোটেলের বাইরে গিয়ে ফিরে না আসে বা হোটেলের বাইরে গিয়ে ভাল-মন্দ কিছু করে তাহলে আমাদের কি করণীয় থাকতে পারে? ঠিক, আমরা পুলিশে খবর দিতে পারতাম। মি. ফেরদৌসকেও টেলিফোন করতে পারতাম।

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে কাজটা হত বোকামি। এই রকম কাজ যতবার আমরা করেছি ততবারই বোকা বনেছি।'

শহীদ বলল, 'আপনাদের অসুবিধের কথাটা আমি বুঝি। সে যাক। আমি এসেছি মি. ফেরদৌসের প্রতিনিধি হয়ে। তিনি আমার ক্লায়েন্ট।'

কামালের দিকে তাকাল আবদুস সামাদ। জোর করে হাসল, 'মি. কামাল কি একজন সাংবাদিক হিসেবে পায়ের ধুলো এনেছেন আমার আপিসে?'

শহীদ বলল, 'ও এসেছে বন্ধু হিসেবে, এক। দুই, একজন সাংবাদিক হিসেবেও বটে। আমি হোটেলের লোকজনদের সাথে কথা বলতে চাই। যারা মিসেস শাহানাকে দেখেছে বা কথা বলেছে। কোন সূত্র পেলে, সূত্রটা বিবেচনা করে দেখব আমরা, মিসেস শাহানার নিখোঁজ হওয়াটা গুরুত্বহীন না গুরুত্বপূর্ণ—কেবল তখনই ছবিসহ তার নিখোঁজ হবার কাহিনী ছাপার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব আমরা।'

'আমাদের দিকটা একটু বিবেচনা করুন, মি. শহীদ। এই হোটেল থেকে মিসেস শাহানা নিখোঁজ হয়েছে এ সংবাদ ফলাও করে সংবাদপত্রে ছাপা হলে গুডউইল ধসে পড়বে হোটেলের। সম্ভাব্য গেস্টরা এ-মুখো হবেন না। আমি বলছি না মিসেস শাহানার খোঁজ পাবার চেষ্টা বন্ধ করুন। আমি বলছি...'

শহীদ বলল, 'বললাম তো, সেটা পরে বিবেচনা করা হবে।'

আবদুস সামাদ বলল, 'ভাববেন না আমরা মিসেস শাহানার ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না। বসে নেই আমরা। গত সোমবার যারা ডিউটিতে ছিল তাদের প্রত্যেককে একে একে ডেকে পাঠিয়েছিলাম আমি। প্রত্যেককে জেরা করেছি। তাতে লাভ হয়েছে অনেক। বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি।'

'তাই নাকি! শোনা যাক...'

আবদুস সামাদ বলল, 'আমি নিজে বলতে চাই না, যারা মিসেস শাহানার সাথে কথা বলেছিল তাদেরকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি। আপনারা তাদের মুখ থেকেই শুনুন।'

কথা শেষ করে আবদুস সামাদ কলিংবেলের বোতামে আঙুলের চাপ দিল। উর্দিপরা একজন বেয়ারা সাথে সাথে ঢুকল ভিতরে।

'পোর্টার জামশেদ, রিসেপশনিস্ট ফারুক সাহেব, বেলবয় আবদুল হক এবং বারটেণ্ডার সুকুমার সেনকে পাশের কামরায় এখুনি আসতে বলো। প্রথমে এখানে আনবে পোর্টার জামশেদকে।'

'ইয়েস স্যার!'

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বেয়ারা। শহীদ মাথা নিচু করে একমনে পাইপে টোবাকো ভরছে। কামাল সিকিউরিটি চীফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মি. ফেরদৌস তার স্ত্রীর স্যুইটেই থাকছেন?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোক আমার ওপর ভীষণ খেপে আছেন। স্ত্রীর ওপর অগাধ আস্থা তাঁর। অথচ...।'

কামাল বলল, 'অথচ?'

আবদুস সামাদ বাঁকা কণ্ঠে বলল, 'সকলকে জেরা করে দেখুন, অনেক

ব্যাপার আঁচ করতে পারবেন।'

খানিক পর দরজা খুলে গেল। পোর্টার জামশেদ ভিতরে ঢুকে সালাম করল অভ্যস্ত কায়দায়।

'মি. শহীদ, জামশেদ গত সোমবার সন্ধ্যায় হোটেলের গেটে ডিউটিতে ছিল। ও কি দেখেছে প্রশ্ন করে জেনে নিন। জামশেদ, এঁরা বিখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খান এবং কামাল আহমেদ। এঁদের সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে তুমি।'

শহীদ পকেট থেকে মিসেস শাহানার ফটোটা বের করে টেবিলের উপর রাখল। বলল, 'দেখো তো, ফটোটা কার চিনতে পারো কিনা?'

জামশেদ এক পা এগিয়ে একটু ঝুঁকে ফটোটা দেখল। কয়েক সেকেণ্ড পর সোজা হয়ে বলল সে, 'জ্বী, স্যার। চিনতে পারছি। ইনিই মিসেস শাহানা, নিখোঁজ হয়েছেন।'

'ঠিক ক'টার সময় হোটেলে প্রবেশ করেন মিসেস শাহানা?'

'সময়টা সঠিক মনে নেই, স্যার।'

'ট্যাক্সি করে এসেছিলেন, তাই না? সাথে কেউ ছিল?'

জামশেদ বলল, 'ট্যাক্সি করে না, স্যার। একটা সাদা ফোক্সওয়াগেন থেকে গেটের সামনে নামেন তিনি। গাড়িটা চালাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। মিসেস শাহানা নামার পর তিনি গাড়ি নিয়ে চলে যান।'

ভুরু কুঁচকে উঠল কামালের।

শহীদের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, 'ঠিক মনে আছে তোমার?'

'ঠিক মনে আছে, স্যার।'

'ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

'বেশিক্ষণ দেখবার সময় পাইনি। মিসেস শাহানা নেমে আমাকে হাত-ইশারায় ডেকে ব্যাগ এবং সুটকেস নামাতে বলেন। ওগুলো নামাবার সময় ভদ্রলোককে দেখি আমি। দামী স্যুট পরে ছিলেন তিনি। গায়ের রঙ ফর্সা, নাকটা খুব খাড়া, বয়স হবে বত্রিশ-তেত্রিশ...'

'স্যুটের রঙ?'

'ছাই রঙের ছিল স্যুটটা, স্যার।'

শহীদ বলল, 'মিসেস শাহানা ভদ্রলোকের সাথে কথা বলেননি?'

'গাড়ি থেকে নামার পর বলেন। তবে ভদ্রলোক মিসেস শাহানার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "বড় জোর চল্লিশ মিনিট, তার বেশি দেরি হবে না।" মিসেস শাহানা কোন উত্তর দেননি।'

শহীদ জানতে চাইল, 'ভদ্রলোককে পরে তুমি হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলে?'

'না, স্যার। মিসেস শাহানাকে রিসেপশনে পৌঁছে দিয়ে আমি খবিরকে গেটে পাঠিয়ে দিয়ে চলে যাই কোয়ার্টারে...'

'গাড়ির নাম্বারটা বলতে পারবে?'

'জ্বী-না, স্যার। লক্ষ করিনি।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো। রিসেপশনিস্ট ফারুক

সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়ো যাবার সময়।'

জামশেদ বেরিয়ে যেতে আবদুস সামাদ বলল, 'সাদা ফোক্সওয়াগেনের ভদ্রলোক পরে যে হোটেলের ককটেল লাউঞ্জে ঢুকেছিলেন সে প্রমাণও আপনারা পাবেন।'

কামাল লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে শহীদের চিন্তিত মুখের দিকে তাকাল, 'একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী পাব বলে মনে হচ্ছে আমার।'

শহীদ বলল, 'হুঁ।'

রিসেপশনিস্ট যুবক ভিতরে ঢুকে করমর্দন করল একে একে সকলের সাথে, বসল শহীদের পাশের চেয়ারটায়। আবদুস সামাদ পরিচয় করিয়ে দিল।

শহীদের প্রথম প্রশ্ন হলো, 'মিসেস শাহানার সাথে ঠিক কি কি বিষয়ে কথা হয়েছিল আপনার? তিনি কি সরাসরি এসে একটা স্যুইট ভাড়া চান?'

'না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আধঘণ্টা আগে তাঁর নামে একটা স্যুইট রিজার্ভ করার জন্যে কেউ ফোন করেছিল কিনা? আমি বলি—হ্যাঁ।'

'আধঘণ্টা আগে কেউ ফোন করেছিল তাহলে রিজার্ভেশনের জন্য? কে সে?'

'মিসেস শাহানা আমার সাথে কথা বলার সময় দু'বার উল্লেখ করেছিলেন ভদ্রলোকের কথা। একবার বলেছিলেন "আমার এক বন্ধু," তারপর বলেছিলেন, "অর্ধ-পরিচিত এক বন্ধু ছাড়া আর কাউকে চিনি না এখানে।" '

'তাঁর স্যুইটে তিনি কতক্ষণ ছিলেন? সেই সময়ের মধ্যে বাইরের কেউ তাঁর সাথে দেখা করেছিল কিনা বলতে পারেন?'

'তিনি পঞ্চাশ মিনিট কি ঘণ্টাখানেক ছিলেন স্যুইটে। না, কেউ তাঁর স্যুইটে যায়নি।'

'একঘণ্টা পর তিনি নামেন। পরনে কি ছিল?'

'লাল শিফন। লাল ব্লাউজ। হাতের নীল হীরের আঙটিটা আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম। নেকলেসটায় ছিল দামী পাথর বসানো।'

'কথা হয় আপনার সাথে?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার বাড়ির ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন, যদি আপত্তি না থাকে।'

'কারণ?'

রিশেপসনিস্ট যুবক ইতস্তত করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন, রাতে যদি বোরিং এবং লোনলি ফীল করি তাহলে ফোনে গল্প করব আপনার সাথে।'

'দিয়েছিলেন নাম্বার?'

'দিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন, গেস্টদের অনেক উদ্ভট আবদার পূরণ করতে হয় আমাদের...'

শহীদ বলল, 'আর এমন কি কথা তিনি বলেছিলেন যা ঠিক স্বাভাবিক নয়, বেশ একটু অদ্ভ?'

রিসেপশনিস্টকে আবার ইতস্তত করতে দেখা গেল। তারপর বলল, 'দেখুন মি.

শহীদ, ভদ্রমহিলা অসাধারণ সুন্দরীই শুধু নন, বিদুষী এবং মডার্নও বটে। তাঁর কথায়বার্তায় খানিকটা অস্বাভাবিকতা থাকলেও সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা আমার কাছে ধরা পড়েনি। পরে, মি. সামাদ আজ সকালে যখন তাঁর বিষয়ে জানতে চান, চিন্তা করে দেখি, সত্যি, বেশ অস্বাভাবিক বা অড্ ছিল তাঁর কথাবার্তা। যেমন, তিনি আমাকে যেচে পড়েই বলেন যে তাঁর স্বামী চার বছরে অন্তত একবার একা একা কিছুদিন দূরে কোথাও থাকেন তিনি। আমাকে জিজ্ঞেসও করেন, ডু ইউ থিঙ্ক ইটস্ সাচ আ গুড আইডিয়া?'

শহীদ বলল, 'হুঁ। আচ্ছা, সোমবার রাতে আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, ফারুক সাহেব?'

'মানে?'

শহীদ বলল, 'হোটেলের ডিউটি শেষ করার পর কোথায় ছিলেন আপনি?'

'বাড়িতেই।'

শহীদ বলল, 'বাড়িতে কে কে আছেন আপনার?'

'ওনলি ফাদার অ্যাণ্ড আ মেল-সার্ভেন্ট।'

শহীদ কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফারুক সাহেবের বাড়ির ঠিকানাটা লিখে নে, কামাল।'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'কিন্তু আমি ঠিক...'

শহীদ বলে উঠল, 'কিছু মনে করার নেই আপনার, ফারুক সাহেব। আমরা একটা নিখোঁজ ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল যুবক। ঠিকানাটা বলল সে। কামাল লিখে নিল।

শহীদ টেবিলের উপরকার ফটোটা চোখ-ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'ওটা দেখুন। ভাল করে দেখুন।'

দেখল রিসেপশনিস্ট, বলল, 'হ্যাঁ, এটা মিসেস শাহানার ছবি।'

'আপনি বলছেন আপনি মিসেস শাহানাকে শেষবার দেখেছেন হোটেলে ওঠার এক ঘণ্টা পর, তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। তারপর তাঁর সাথে আমার আর দেখা হয়নি।'

শহীদ বলল, 'কোথায় তিনি যাচ্ছিলেন তা তিনি বলেছিলেন?'

'না।'

শহীদ বলল, 'আপাতত আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমার, ফারুক সাহেব। আপনি উঠতে পারেন। বেলবয়...কি যেন নামটা...আবদুল হক, ওকে পাঠিয়ে দেবেন এখানে।'

রিসেপশনিস্ট চলে গেল। বেশ একটু গম্ভীরই দেখাল তাকে। মনে মনে সে রেগে গেছে শহীদের উপর তাও বোঝা গেল তার জুতোর দ্রুত শব্দ শুনে। শহীদ চেয়ে রইল তার গমন পথের দিকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পরও সেদিক থেকে চোখ ফেরাল না শহীদ। ঘাড় বাঁকা করে চেয়েই রইল।

'কিছু বুঝছেন, মি. শহীদ?' আবদুস সামাদ জিজ্ঞেস করল।

শহীদ কোন কথা না বলে নড়েচড়ে বসল, পাইপটা মুখে তুলল।

আবদুস সামাদ বলল, 'বেলবয় আবদুল হক মিসেস শাহানার ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে স্যুইটের ভিতরে গিয়েছিল। ওর সাথেও কথাবার্তা হয় মিসেস শাহানার। খুবই...'

আবদুস সামাদ চুপ করে গেল আবদুল হককে রুমে প্রবেশ করতে দেখে। সালাম করে দুই হাত দূরে দাঁড়াল সে। শহীদ তার দিকে বাড়িয়ে দিল ফটোটা, বলল, 'দেখো তো, এই ছবিটা কার চিনতে পারো কিনা?'

হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল আবদুল হক। দেখতে লাগল। শহীদও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল ছোকরার পেটা লোহার মত মজবুত শরীরটা।

'স্যার, ইনিই মিসেস শাহানা, আমি এনারই লেদার ব্যাগ আর একটা সুটকেস তাঁর ছয়তলার বাহাত্তর নম্বর রুমে তুলে দিতে গিয়েছিলাম...কিন্তু স্যার আমি তো...বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি কিছু জানি না, আমি ভোর চারটের সময় হোটেলে এসে তাঁকে পাইনি, খোদার কসম বলছি,স্যার...'

শহীদ বলল, 'থামো, থামো। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করব শুধু তারই উত্তর দেবে। ভয় নেই, তুমি যদি কোন অপরাধ করে না থাকো তাহলে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। আচ্ছা, বলো এবার, মিসেস শাহানার স্যুইটে ঢোকার পর কি কি কথাবার্তা হয়েছে তোমার সাথে।'

আবদুল হক ঘনঘন ঢোক গিলছে। চোখমুখ থেকে থেকে বিভিন্ন আকৃতি নিচ্ছে। কখনও দাঁত চেপে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে সে, কখনও জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে। দ্রুত এবং বিরতি না নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল সে, 'এলিভেটরের ভিতরেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি ফুটবল খেলি কিনা। আমি বলি, হ্যাঁ খেলি। তারপর স্যুইটের ভিতর ঢুকে তিনি আমাকে একটা একশো টাকার নোট দিতে চান। আমি বলি, আপনি হয়তো ভুল করছেন ম্যাডাম। কিন্তু তিনি আমার একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়ান, বলেন, ভুল করছি না। এটা ধরো, দেবার কারণটা বলছি। টাকাটা নিই আমি। তিনি এরপর জানতে চান আমার ডিউটি কখন শেষ হবে। আমি বলি রাত বারোটায়। তিনি জানতে চান রাত্রে কোথায় শুই আমি? আমি বলি কোয়ার্টারে শুই। রাত চারটের সময় আমি ঘুম থেকে তাঁকে ওঠাতে পারব কিনা জানতে চান তিনি। আমি বলি সে-সময় যে বেলবয় ডিউটিতে থাকবে তাকে বলে রাখব আমি। কিন্তু তিনি বলেন আর কাউকে এসব কথা বলার দরকার নেই। আমি চাই তুমি আসবে। কোন ভয় নেই তোমার। তোমাকে দিয়ে আমি একটা কাজ করাব। আমি তোমাকে সুযোগটা দিতে চাই। কেউ জানবে না।'

'তুমি রাজি হয়েছিলে?'

আবদুল হক চুপ করে রইল।

'জবাব দাও।'

মাথা নিচু করে ফেলল আবদুল হক। অস্ফুটে বলল, 'হয়েছিলাম, স্যার...'

'কোয়ার্টার থেকে ভোর চারটের সময় হোটেলে ঢুকেছিলে তুমি। মিসেস শাহানার স্যুইটের ভিতর ঢুকেছিলে নিশ্চয়ই?'

'না, স্যার, বিশ্বাস করুন, ঢুকিনি। কলিংবেল টিপেছিলাম, কিন্তু সাড়া পাইনি বলে ফিরে গিয়েছিলাম।'

শহীদ দেখল ছোকরা কাঁপছে একটু একটু। বলল, 'ঠিক আছে, যাও তুমি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। মিথ্যে কথা বললে কঠিন শাস্তি পাবে। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'না স্যার, মিথ্যে কথা বলিনি, বিশ্বাস করুন...'

'যাও। অবশিষ্ট কে আছে পাঠিয়ে দাও।'

ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল বেলবয় আবদুল হক।

আবদুস সামাদ কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য মুখ খুলতে গিয়ে দমন করল নিজেকে। কামাল বলে উঠল, 'মি. ফেরদৌস—বেচারা!'

আবদুস সামাদ বলল, 'হ্যাঁ, বেচারা!'

শহীদের ভারি গলা শোনা গেল, 'মিসেস শাহানা, বেচারী!'

রুমের ভিতর বারটেণ্ডার সুকুমার সেন ঢুকে, সকলের উদ্দেশে কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, 'আদাব।'

আবদুস সামাদ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'মিসেস শাহানাকে তুমি ককটেল লাউঞ্জে দেখেছিলে, বলেছ। কি কি কথাবার্তা হয়েছে তা শোনার অবসর হয়নি আমার। আমাদের সকলের সামনে শোনাও দেখি।'

শহীদ বলল, 'না। কথাবার্তা কি কি হয়েছে তা পরে শুনব। তার আগে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। সুকুমার বাবু, এই ফটোটা দেখুন তো, কার এটা?'

শহীদের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে দেখল সুকুমার। বলল, 'কোন সন্দেহ নেই, মিসেস শাহানার।'

শহীদ বলল, 'আচ্ছা, ভদ্রমহিলা কি একাই আপনার বারে ঢোকেন?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি ঢুকতেই একজন ওয়েটার আমাকে বলে, ম্যাডামের সঙ্গী ভদ্রলোক পরে আসবেন, কি একটা কাজে বাইরে গেছেন তিনি। ম্যাডামের সুবিধে-অসুবিধে লক্ষ রাখবেন, স্যার।'

'তার মানে মিসেস শাহানার সঙ্গী একজন ছিলেন। তিনি বারেই ছিলেন, তবে বাইরে গিয়েছিলেন কোন কাজে, পরে ফেরার কথা ছিল। ফিরেছিলেন সেই ভদ্রলোক?'

'ফিরেছিলেন। কয়েক মিনিট পরে।'

শহীদ বলল, 'ভদ্রলোকের পোশাকের বর্ণনা দিতে পারেন?'

'ছাই রঙের স্যুট পরেছিলেন। আর কিছু লক্ষ করিনি। মিসেস শাহানা তখন আমার কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে বসে শ্যাম্পেন পান করছিলেন। ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে কর্ণারের এক টেবিলে গিয়ে বসেন। বড়জোর পৌনে এক ঘণ্টা ছিলেন ওঁরা, তারপর চলে যান।'

'ভদ্রলোকের নাম ইত্যাদি কিছু জানতে পারেননি? এর আগে তাকে আপনার বারে দেখেছেন কখনও?'

'দু'একবার দেখেছি। না, নাম ইত্যাদি জানি না।'

শহীদ বলল, 'ভদ্রলোক বারে এসে মিসেস শাহানাকে টেবিলে নিয়ে যান। তার আগে মিসেস শাহানার সাথে কি বিষয়ে কথা হয় আপনার?'

সুকুমার বলে, 'আমি তাঁকে বসতে অনুরোধ করি। জিজ্ঞেস করি, তিনি কিছু পান করবেন কিনা! বললেন, বাড়িতে পান করলেও বাইরে কখনও পান করেননি। তবে হালকা কিছু দিলে পান করবেন। আমি শ্যাম্পেন সাজেস্ট করি। তিনি বলেন তাঁর বন্ধু হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না। তারপরই বলেন, তিনি সামান্য একটু বেসামাল হতে চান। আমি দিচ্ছি বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাই, তিনি আবার কথা বলেন। জানতে চান, বারে বসে মেয়েরা একা একা ড্রিঙ্ক করে কিনা। ঢাকায় তিনি নতুন, নিয়ম-টিয়ম জানেন না। আমি বলি, এখানে মেয়েরা সব করতে পারে। তারপর তিনি জানতে চান, ঢাকায় মেয়েদের এনটারটেনমেন্টের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে। তিনি বিশেষ ভাবে জানতে চান পুরুষরা যেমন মদ খায়, ফ্ল্যাশ খেলে, ড্রাইভ করে, নাচে, নাইট ক্লাবে যায়, নীলছবি দেখে তেমনি মেয়েরাও কি পারে? আমি বলি, পারে। তবে এটা নির্ভর করে মেয়েটির ইচ্ছা এবং রুচির উপর। এরপর তিনি সিগারেট চান আমার কাছ থেকে। আমি সিগারেট দিই, তাঁর পাশে বসা ভদ্রলোক লাইটার জ্বেলে তাঁর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেন। এই ভদ্রলোক মিসেস শাহানার সাথে আলাপ জমাবার সামান্য প্রয়াস পান। কিন্তু এর একটু পরই মিসেস শাহানার সঙ্গী ভদ্রলোক বারে ঢোকেন এবং তাঁকে নিয়ে টেবিলে চলে যান।'

শহীদ বলল, 'এই ঘটনার প্রায় পৌনে একঘণ্টা পর ওঁরা চলে যান বার থেকে, তাই না? এই পৌনে একঘণ্টার মধ্যে আপনার সাথে আর কথা হয়নি মিসেস শাহানার?'

'না।'

'তাঁরা কোথায় গেলেন তাও আপনার জানা হয়নি!'

'না।...তবে একজন ওয়েটার পরে আমাকে বলে যে মিসেস শাহানা তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, চলো ফ্ল্যাশ খেলব। এই কথা বলে উঠে পড়েন ওঁরা চেয়ার থেকে, বেরিয়ে যায়।'

'এরপর ওদের কাউকে আপনি আর দেখেননি?'

'দেখিনি।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।'

সুকুমার বেরিয়ে যেতে আবদুস সামাদ বলল, 'আরও কিছু জানার আছে আপনার, মি. শহীদ?'

শহীদ বলল, 'কামাল, এবার তোর কাজ তুই শুরু কর। মি. ফেরদৌসকে বোধহয় তাঁর স্যুইটে...তাঁর স্ত্রীর স্যুইটে, পাবি এই মুহূর্তে। যা, ভদ্রলোকের নিজের মুখ থেকে সংগ্রহ কর তোর পত্রিকার জন্যে হটকেক নিউজ। আমার কথা বললে ভদ্রলোক বলবেন সব কথা।'

আবদুস সামাদ নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কয়েকবার এদিক ওদিক। বলল, 'মি. শহীদ, খবরটা ছাপবেনই, তাই না? আমাদের হোটেলের নামটা উল্লেখ না করে খবরটা ছাপা যায় না?'

কামাল বলল, 'দুঃখিত, সামাদ সাহেব। তবে আপনাদের হোটেলের প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকটা লক্ষ রাখার চেষ্টা করব আমি।'

'সেটাও মন্দের ভাল। থ্যাঙ্ক ইউ, মি. কামাল।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল।

কামালও উঠতে উঠতে বলল, 'কোথায় যাবি তুই এখন?'

'বাইরে আয়। একটা কথা বলব তোকে।'

আবদুস সামাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। শহীদ নিচু গলায় বলল, 'বেলবয় আবদুল হক এবং রিসেপশনিস্ট ফারুক সাহেব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তোকে...'

'তার মানে। শহীদ, তুই ওদের সন্দেহ করছিস?'

শহীদ শান্তভাবে বলল, 'উত্তেজিত হোসনে। সন্দেহ আমি কাউকে করছি না। কিন্তু ওদের দু'জনের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষী নেই কেউ। মি. ফেরদৌস তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে যে ধারণা আমাকে দেবার চেষ্টা করেছেন তা ভুল। মিসেস শাহানার চরিত্র প্রশংসার যোগ্য নয়, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছিস। তিনি ঢাকায় পা দেবার পর পরই পুরুষমানুষের সান্নিধ্যে পাবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে শুরু করেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সাধারণ রুচিবোধও হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। একটা বেলবয়—তাকেও তিনি টাকার লোভ দেখিয়ে ভোর চারটের সময় নিজের স্যুইটে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বড় বেশি খাপছাড়া লাগছে আমার।'

কামাল বলল, 'হুঁ। ঠিকই বলেছিস। ঠিক আছে, রিপোর্ট করব যত তাড়াতাড়ি পারি।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

কুয়াশা ৬৬

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৭৭

এক

এই ঢাকার বুকে অজায়গায় কুজায়গায় ডজন ডজন জুয়ার আড্ডা বসে। ভাল ভাল হোটেলে, নাইটক্লাবে, অভিজাত নাগরিকদের কোন কোন বাড়িতেও বসে জুয়ার আসর।

আইনরক্ষক কর্তৃপক্ষের নাকের ডগাতেই জুয়া খেলা হচ্ছে। এই নিষিদ্ধ কর্মটি বন্ধ করার জন্য চেষ্টা যে হয় না তা নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই পুরোপুরি সফল হয়নি। সংবাদপত্রে তো প্রায়ই দেখা যায় জুয়াড়ী গ্রেফতারের কাহিনী। কিন্তু সে আর ক'টা। তাছাড়া গ্রেফতার হয় নিম্নশ্রেণীর জুয়াড়ীরা। ধনী লোকেরাও তো জুয়া খেলে, কই তারা তো ধরা পড়ে না!

ধনী জুয়াড়ীরা ধরা পড়ে না বিভিন্ন কারণে। এক, ধনী লোকদের গ্রেফতার করতে হলে পুলিশকে তৈরি হতে হয় দীর্ঘদিন ধরে, আঁটঘাট বেঁধে কাজে হাত দিতে হয়। ধনী জুয়াড়ীদের মান-সম্মানের দিকটাও ভাবতে হয় তাদের। তারপর ধনী জুয়াড়ীরা হাতেনাতে ধরা পড়লেও গ্রেফতার হবার বদলে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ছাড়া পেয়ে যায়। লোভ সামলানো অনেক সময় পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

হোটেলে জুয়ার আড্ডা বসে গোপন প্রকোষ্ঠে। এই গোপন প্রকোষ্ঠের সন্ধান পুলিশ যে জানে না তা নয়। তারা জেনেও নিষ্ক্রিয় থাকে অনেক ক্ষেত্রে। কারণ বহুবিধ। হোটেলটা হয়তো নামজাদা কোন নাগরিকের। কিংবা, হোটেল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত মোটা টাকা দান করেন কর্তব্যপালনরত লোকদের।

মাঝে মাঝে যে জুয়ার আড্ডায় পুলিশ হানা দিয়ে জুয়াড়ীদের গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয় না তা নয়। প্রায়ই এইরকম মহৎ কাজ তারা করে। কিন্তু জুয়ার আড্ডার সংখ্যার তুলনায় সে কিছুই না।

তবে নিরাশ হবার তেমন কিছু নেই। আইনরক্ষক কর্তৃপক্ষ চুপচাপ বসে নেই। সম্প্রতি ঢাকায় অপরাধ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর একটা সেমিনার হয়ে গেছে। সেই সেমিনারে জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতেরা কিছুসংখ্যক পুলিশের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ঘুষ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এইসব পুলিশদের কঠোর শাস্তি দেবার কথা ঘোষণা করেছেন তাঁরা। তাঁরা বলেছেন, মাত্র স্বল্প সংখ্যক অসৎ পুলিশের জন্য মহান পুলিশবাহিনীর সম্মান এবং মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে—এটা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। কঠোর হস্তে···ইত্যাদি।

ক্রিমিনলজিস্ট হিসেবে এই সেমিনারে শহীদও বক্তৃতা দিয়েছিল।

শহীদ জানে কোথায় কোথায় জুয়ার আসর বসে। মুশকিল হলো, একই সময়ে প্রতিটি জুয়ার আসরে হানা দিয়ে জুয়াড়ীদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া জুয়াড়ীদের চর-অনুচরের সংখ্যাও কম নয়। হানা দেবার জন্য পুলিশবাহিনী থানা থেকে রওনা দিলেই তারা আগে ভাগে খবর পেয়ে যায়—পুলিশ সেখানে পৌছে দেখে, চিড়িয়ারা ভেগেছে।

গাড়ি থামাল শহীদ বিটলস্ হোটেল অ্যাণ্ড বার-এর সামনে। ঘণ্টা খানেক ধরে পাঁচটা হোটেল অ্যাণ্ড বারে সন্ধান নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ও, এইসব হোটেলের জুয়ার আসরে মিসেস শাহানা এবং তার সঙ্গী ভদ্রলোক গত সোমবার রাত্রে যায়নি। বিটলস্ হোটেল অ্যাণ্ড বারেও ঢুঁ মেরে একবার দেখতে চায় ও। সঙ্গী ভদ্রলোকের পরিচয়টা জানতে হবে। এটাই একমাত্র সূত্র, সূত্রটা ধরে এগোনো ছাড়া উপায় নেই।

লবিতে ঢুকে কয়েকজন মাত্র গেস্টকে এখানে-ওখানে বসে থাকতে দেখল শহীদ। ককটেল লাউঞ্জে ঢুকে পরিচিত একজন ওয়েটারকে চোখের ইশারায় কাছে আসতে বলে একটা টেবিল দখল করে বসল ও। ওয়েটার লোকটার বয়স হবে চল্লিশের মত। গায়ের রঙ কয়লার মত কালো। চোখ দুটো ছোট ছোট। বিশাল বুক। সারা শরীরে কমপক্ষে গোটা পঞ্চাশেক ক্ষতচিহ্ন আছে ওর। প্রথম জীবনে কুখ্যাত গুণ্ডা ছিল। বছর কয়েক হলো চাকরি নিয়ে এক ধরনের সৎজীবন যাপন করছে। শহীদকে শ্রদ্ধা করে। কারণ শহীদই ওকে চাকরিটা যোগাড় করে দিয়ে সৎজীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। সে কাছে আসতে নিচু গলায় বলল, 'কি খবর, সাদেক?'

সবিনয়ে নিচু গলাতেই উত্তর দিল সাদেক, 'আপনার দোয়ায় ভালই, হুজুর। গত হপ্তায় আমি যেতে পারিনি রুবিনকে দেখতে···খোকাবাবু কেমন আছেন, হুজুর?'

'ভাল। আগামী রবিবার দিন যেয়ো। তোমার কাছ থেকে একটা তথ্য নিতে এসেছি, সাদেক।'

'কি তথ্য, হুজুর?'

শহীদ পাইপ বের করে টোবাকো ভরতে ভরতে বলল, 'তোমাদের এখানে জুয়ার আড্ডা এখনও বসে?'

'জী হুজুর,বসে,' চাপা গলায় বলল সাদেক।

'গত সোমবারে তুমি ছিলে আড্ডায়?'

'দাঁড়ান, হুজুর, মনে করে দেখি। গত সোমবার···হ্যাঁ ছিলাম, হুজুর।'

শহীদ পাইপ তুলল মুখে। অগ্নিসংযোগ করে বলল, 'সেদিনের আড্ডায় কারা কারা ছিল বলতে পারো? পুরুষ বা মেয়ে—সকলের নাম জানো? চেহারাগুলো মনে আছে?···সাদেক, তোমাদের বারম্যান ঢুকছে ভিতরে, কেটে পড়ো কয়েক মিনিটের জন্য! ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে ফিরে এসো আবার।'

সাদেক সরে গেল নিঃশব্দে।

মিনিট দু'য়েক পর শীতল পানীয় নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। বলল, 'সকলের

চেহারা মনে নেই, হুজুর। সকলের নামও আমার জানা নেই। আমি রাত সাড়ে ন'টা কি দশটা পর্যন্ত ছিলাম ওখানে। আবার নতুন কারা কারা এসেছিল বলতে পারব না, হুজুর।'

শহীদ বলল, 'এক ভদ্রলোক এবং এক ভদ্রমহিলার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। মহিলার পরনে ছিল লাল শিফন শাড়ি, জরির কাজ করা। ব্লাউজটাও ছিল লাল। বাঁ হাতের আঙুলে ছিল হীরে বসানো আঙটি...'

সাদেক বলে উঠল, 'আর বলতে হবে না, হুজুর! মনে পড়ছে, পরিষ্কার মনে পড়ছে বিবিসাহেবার কথা। তিনি তো হুজুর ইকবাল সাহেবের সাথে এসেছিলেন।'

'ইকবাল সাহেব?'

'ইকবাল সাহেবকে চেনেন না, হুজুর? বিরাট পয়সাওয়ালা মানুষ। লম্বা, ফর্সা চেহারা। সেদিন এসেছিলেন ছাই রঙের একটা স্যুট পরে।'

'হ্যাঁ, ওই লোকেরই সন্ধান চাইছি আমি। কি ব্যবসা ভদ্রলোকের তা জানো? তুমি কি ইন্‌ডেন্ট ব্যবসায়ী ইকবাল চৌধুরীর কথা বলছ?'

সাদেক সমীহভরে বলে উঠল, 'আপনি তো সবাইকেই চেনেন, হুজুর। জ্বী, আমি ওই ইকবাল সাহেবের কথাই বলছি। বিবিসাহেবাকে নিয়ে আসেন তিনি, রাত তখন ন'টা হবে।'

'দু'জনেই খেলছিল?'

'জ্বী। তবে দু'জন দুই টেবিলে বসে খেলছিলেন।'

'আচ্ছা! দুই টেবিলে কেন?'

সাদেক বলল, 'তা ঠিক বলতে পারব না, হুজুর।'

'কতক্ষণ ছিল ওরা?'

'আমি দশটার দিকে বাড়ি চলে যাই, হুজুর। যাবার আগে ওনাদেরকে খেলতে দেখে গেছি।'

শহীদ শীতল পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'যথেষ্ট উপকার করেছ তুমি, সাদেক। যাও, কাজে যাও।'

মিনিট তিনেক পর বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল শহীদ। ইন্‌ডেন্ট ব্যবসায়ী ইকবাল চৌধুরী! দেশের ধনীলোকদের মধ্যে একজন। কে না তাকে চেনে। মাত্র অল্প কিছুদিনে অগাধ টাকার মালিক হয়েছে সে। তার ব্যবসার হেড-অফিসটা চেনে শহীদ। গাড়ি ছুটিয়ে দিল ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। ইকবাল চৌধুরীর হেড-অফিস ওদিকেই।

চৌধুরী বিল্ডিংয়ের থার্ডফ্লোরের সবটুকু নিয়ে ইকবাল চৌধুরীর হেড-অফিস। মোটা লাল কার্পেট মোড়া করিডর ধরে এগিয়ে রিসেপশনে ঢুকল শহীদ। অল্প বয়েসী, প্রায় কিশোরী একটি মেয়ে নির্মল হাসিতে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলল মুখটা শহীদকে দেখে। ইংরেজীতে বলল, 'গুড আফটার-নুন্। মে আই হেলপ্ ইউ, স্যার?'

শহীদ পকেট থেকে ব্যাম্বো কার্ডের উপর নিজের পরিচয় ছাপা ভিজিটিং কার্ডটা ডেস্কের উপর রেখে বাংলায় বলল, 'ই বাল সাহেবকে এটা পৌঁছে দাও।'

'কিন্তু মি. ইকবাল তো অফিসে আসেননি, স্যার।'

শহীদ বলল, 'ম্যানেজার?'

মেয়েটি বলল, 'ম্যানেজার, মি. রথীন কুমার, তাঁর সাথে কথা বলতে চান? ঠিক আছে...'

কলিংবেল বাজাতেই একজন উর্দিপরা পিয়ন বেরিয়ে এল ভিতরের দরজা খুলে। রিসেপশনিস্ট কিশোরী তাকে কার্ডটা দিয়ে বলল, 'মি. রথীনকে এটা পৌঁছে দাও, বশির।'

বশির চলে গেল ভিতরে কার্ড নিয়ে। মিনিট দেড়েক পরই ফিরে এল সে, সবিনয়ে বলল, 'মি. রথীন আপনার সাথে দেখা করবেন, স্যার। আসুন আমার সাথে।'

গোটা অফিসটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। হলরুমে ঢুকে শহীদ দেখল প্রায় পঞ্চাশ জন লোক যার যার টেবিলে বসে কাজ করছে। সবাই খুব ব্যস্ত। হলরুম থেকে বেরিয়ে একটা প্যাসেজে ঢুকল ও। প্যাসেজের দু'পাশে দরজা। প্রতিটি দরজার গায়ে ছোট ছোট সাইনবোর্ড। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, চীফ্ অ্যাকাউনট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্লারিক্যাল ম্যানেজার, চীফ্ পারচেজ অফিসার—এইসব শব্দ লেখা রয়েছে বোর্ডগুলোয়।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তের দরজাটা প্রকাণ্ড। সেটার গায়ে প্লাস্টিকের সাদা অক্ষর দিয়ে লেখা, 'ম্যানেজার।'

পিয়ন নক্ করে দরজাটা খুলে এক কদম সরে দাঁড়াল। হাতে পাইপ নিয়ে ভিতরে ঢুকল শহীদ।

সুসজ্জিত চেম্বার। চারদিকের দেয়ালে নাইলনের স্ক্রীন ঝুলছে। বিরাট একটা ডেস্ক সামনে নিয়ে বসে আছে ম্যানেজার রথীন কুমার। গোলগাল চেহারা, চোখে ধূর্ত দৃষ্টি, মুখে অল্প অল্প হাসি। শহীদকে দেখে নিল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল, 'গ্লাড টু মিট ইউ, মি. খান। বসুন।'

ম্যানেজারের মুখোমুখি বসে রয়েছেন আর এক ভদ্রলোক একটা প্রশস্ত চেয়ারের সবটুকু জুড়ে। শহীদের দিকে তিনি ফিরেও তাকালেন না। তার সামনে একটা ফাইল খোলা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, তিনি সেটা গভীর মনোযোগের সাথে দেখছেন।

শহীদ এই ভদ্রলোকের পাশের একটা চেয়ারে বসল।

'বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

শহীদ বলল, 'আমি মি. ইকবালের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। শুনলাম তিনি অফিসে আসেননি। ব্যাপারটা খুব জরুরী। এক ভদ্রমহিলা নিখোঁজ হয়েছেন, সে সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল আমার।'

ম্যানেজার বলল, 'কাজ না থাকলে আপনার মত স্বনাম-ধন্য ব্যক্তিদের পদধূলি কি আর পড়ে যেখানে সেখানে। কিন্তু মি. শহীদ, এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে আপনাকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। মি. ইকবাল অফিসে কখন আসেন, কবে আসেন তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। মাসের পর মাস আসেন না, এমনও হয়। গত পনেরো দিন তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি...।'

'ব্যবসা তিনি দেখাশুনা করেন না নাকি?'

ম্যানেজার গর্বিতভাবে হাসল, 'ব্যবসার নীতি নির্ধারণ করে দিয়েই তিনি মুক্ত, সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন আমার ওপর।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু ইমার্জেন্সী দেখা দেয় না? তাঁর সাথে যোগাযোগ করার দরকার হলে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেন?'

'না। তেমন কোন জরুরী ব্যাপার দেখা দিলে সিদ্ধান্ত আমিই নিই।'

শহীদ বলল, 'তিনি কোথায় থাকেন সে সম্পর্কে কোন খবরই রাখেন না আপনারা?'

'আমরা খবর রাখি না বলা ঠিক উচিত হবে না। আসলে তিনি চান না আমরা তাঁর প্রতিমুহূর্তের খবর রাখি। তাঁকে বিরক্ত না করার ব্যাপারে আমাদের ওপর নির্দেশ আছে।'

শহীদ বলল, 'অস্বাভাবিক।'

ম্যানেজার বলল, 'তা বলতে পারেন। কিন্তু মি. ইকবাল বলেন, আমার প্রাইভেসির ব্যাপারে আমি কম্প্রমাইজ করতে রাজি নই।'

শহীদের পাশে বসা ভদ্রলোক ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকালেন শহীদের দিকে। শহীদ দেখল ভদ্রলোকের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে রঙিন চশমা। কপালের উপর ছোট একটা আঁচিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'মি. ইকবালের সাথে দেখা করা কি খুবই দরকার আপনার?'

শহীদ বলল, 'খুবই দরকার। আপনি কি বলতে পারবেন কোথায় তাঁকে পেতে পারি?'

রথীন কুমার বলে উঠল, 'আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, দাঁড়ান। মি. শহীদ, প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মি. শহীদ, ইনি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার, ঢাকায় বদলী হয়ে নতুন এসেছেন, মি. সালাহ উদ্দীন খান।'

করমর্দন করল ওরা। শহীদের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। ভদ্রলোক যে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কেউ হতে পারেন না তা সন্দেহ হতেই প্রশ্ন করল ও, 'নতুন বদলি হয়ে এসেছেন? কিন্তু...'

হঠাৎ চুপ করে গেল শহীদ। প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'কিন্তু আমার হাতে সময় খুব কম। আপনি যদি মি. ইকবালের সন্ধান আমাকে জানাতে পারেন...'

'ফোন নাম্বারটা জানি আমি। এই নাম্বারে ফোন করলেই আপনি মি. ইকবালের খোঁজ পেয়ে যাবেন,' ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বললেন।

ম্যানেজার বলে উঠল, 'কিন্তু মি. সালাহউদ্দীন, আপনি আমার বসের অবস্থান সম্পর্কে জানেন কিভাবে?'

ভদ্রলোক সরাসরি তাকালেন ম্যানেজারের দিকে, বললেন, 'আমি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার, মি. রথীন। কেউ যা জানে না আমাকে তা জেনে রাখতে হয়। মি. শহীদ নাম্বারটা লিখে নিন।'

শহীদ নোট বইটা বের করে বলল, 'বলুন।'

ভদ্রলোক নাম্বারটা বললেন। লিখে নিল শহীদ। তারপর উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার সাথে এবং ম্যানেজারের সাথে করমর্দন সেরে বিদায় নিয়ে শহীদ দ্রুত নেমে এল নিচে, গাড়ির কাছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল শহীদ। একটা প্রশ্ন ওকে অস্থির করে তুলেছে। ছদ্মবেশের জন্যে প্রথমে চিনতে না পারলেও একটু পরেই চিনতে ভুল করেনি ও কুয়াশাকে। প্রশ্ন হলো, ইকবাল চৌধুরীর অফিসে কুয়াশা কেন? মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কি উদ্দেশ্যে গেছে সে ওখানে?

একটা মেডিসিনের দোকান দেখে গাড়ি দাঁড় করাল শহীদ। দোকানে ঢুকে অনুমতি নিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে কুয়াশার দেয়া নাম্বারে ডায়াল করল, অপরপ্রান্ত থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'গুড আফটারনূন্। হোটেল লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডো। মে আই হেলপ্ ইউ?

শহীদ বলল, 'ইউ হ্যাভ!'

বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠল ও।

পাঁচ মিনিট পর শহীদকে দেখা গেল লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডো হোটেলের ফার্স্ট-ফ্লোরের একশো এগারো নম্বর স্যুইটের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক্ করতে।

দেরি হচ্ছে দেখে দ্বিতীয়বার নক্ করল শহীদ, পরমুহূর্তে খুলে গেল দরজা, সুদর্শন চেহারার ইকবাল চৌধুরী দরজার কবাট একটু ফাঁক করে শহীদকে দেখল, বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল তার কপালে, বলল, 'ভুল করেছেন সম্ভবত।'

কথাটা বলেই দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলো সে। শহীদ ঠিক সেই সময় লক্ষ করল ভিতরের সীটিং রুমের দ্বিতীয় দরজা পথে দেখা যাচ্ছে বেডরুমের খানিকটা। বেডরুমে লাল শাড়ি পরা একটা যুবতীকে দেখা গেল পলকের জন্য। ঠিক চিনতে না পারলেও আশায় ভরে উঠল বুকটা ওর। হাত দিয়ে দরজার কবাট দুটো ধরে চাপ দিয়ে বাধা দিল ও ইকবাল চৌধুরীকে, 'ভুল করিনি, ইকবাল সাহেব। পথ ছাড়ুন, ভিতরে ঢুকব আমি।'

'হোয়াট! কে আপনি? কোন্ অধিকারে...'

মৃদু হেসে শহীদ বলল, 'নার্ভাস হবেন না। আমি শহীদ খান। শুনেছেন কখনও নামটা?'

'শহীদ খান? না...হ্যাঁ। তার মানে? আপনি কি বলতে চান আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান?'

শহীদ বলল, 'শুধু বলতে চাই না, তা প্রমাণও করতে পারি আমিই স্বয়ং প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান।'

ইকবাল চৌধুরী নিজেকে সামলে নেবার জন্য চেষ্টা করল। সতর্কতা ফুটল তার চোখে মুখে। জানতে চাইল, 'কি জানতে চান আপনি? কে আমার ঠিকানা দিয়েছে আপনাকে?'

'ওসব কথা পরে। আমাকে ঢুকতে দিন। আমি দেখতে চাই আপনার বেডরুমে কে আছে।'

'কে আবার, ও আমার স্ত্রী।'

শহীদ বলল, 'আপনি আমার পরিচয় পাবার পরও সাবধান হচ্ছেন না, ইকবাল সাহেব। ভুল করছেন। পস্তাতে হবে কিন্তু। দুনিয়ার সবাই জানে আপনি বিয়ে করেননি। পথ ছাড়ুন...'

শহীদ হাত দিয়ে ইকবাল চৌধুরীর বুকে চাপ দিল। পিছিয়ে গেল ইকবাল চৌধুরী। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। শহীদ তার গায়ে হাত দিয়ে সরিয়ে দেবে তা সে ভাবতেই পারেনি।

দৃঢ় পায়ে বেডরুমে ঢুকল শহীদ।

কিন্তু বেডরুম ফাঁকা, শূন্য। কেউ নেই সেখানে।

ইকবাল চৌধুরীও বেডরুমে ঢুকল। শহীদ তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সময় নষ্ট করাবেন না। আপনার সঙ্গিনীকে বলুন বাথরুম থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে আসতে।'

ইকবাল চৌধুরী প্রতিবাদ করে কি যেন বলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলাল। বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'পুতুল, বেডরুমে এসো তো একবার। ভয়ের কিছু নেই!'

একটু পরই খুলে গেল বেডরুমের দরজা। শহীদ দেখল লাল বেনারসী শাড়ি পরা মেয়েটা শ্যামলা এবং বেঁটে। এ মেয়ে কক্ষনো মিসেস শাহানা নয়।

ইকবাল চৌধুরীর দিকে তাকাল শহীদ, 'মিসেস ফেরদৌস কোথায়?'

'মিসেস ফেরদৌস? ওই নামের কাউকে আমি চিনি না।'

পকেট থেকে ফটোটা বের করে বাড়িয়ে দিল শহীদ, 'একে চেনেন না বলতে চাইছেন?'

এগিয়ে এসে ছবিটা নিল ইকবাল চৌধুরী, দেখেই মুখ তুলল, অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'শাহানা! কেন...কি হয়েছে শাহানার?'

শহীদ কঠিন কণ্ঠে ব্যঙ্গ করল, 'চমৎকার! আপনি দেখছি আমাকেই প্রশ্ন করছেন। গত সোমবার রাতে আমি বুঝি ওকে নিয়ে ক্যাপিটাল হোটেলের ককটেল লাউঞ্জ থেকে বেরিয়েছিলাম?'

'মি. শহীদ, বিলিভ মি অর নট, সোমবার রাত এগারোটা পর্যন্ত ওর সাথে আমি ছিলাম বটে কিন্তু তারপর...তারপর থেকে ওর কোন খবর আমি রাখি না। প্লীজ...'

ইকবাল চৌধুরী শহীদের একটা হাত ধরে ফেলল, হঠাৎ হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাকাল বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়ানো যুবতীর দিকে, বলল, 'চিন্তা কোরো না, পুতুল। তুমি বসো। আমরা সীটিং রুমে বসে কথা বলি। মি. শহীদ, চলুন, বসে বসে সব কথা শুনবেন।'

সীটিং রুমে এসে মুখোমুখি বসল ওরা। ইকবাল চৌধুরীর কণ্ঠে আবেদনের অকৃত্রিম সুর ফুটে উঠল, 'কি হয়েছে শাহানার, মি. শহীদ। ও কি কোন বিপদে পড়েছে?'

শহীদ চুপ করে রইল।

'আমি জানি বিপদে পড়েছে সে...কিন্তু...প্লীজ। মি. শহীদ, বলুন কি হয়েছে

তার…।'

শহীদ বলল, 'গত সোমবারের সবটুকু ঘটনা আমি শুনতে চাই ইকবাল সাহেব। আপনি অভিনয় করছেন কিনা তা আমি জানি না। অভিনয় করুন বা না করুন, সত্য চাপা থাকবে না। কোন প্রশ্ন আমাকে করার আগে আপনি একে একে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিন। মিসেস শাহানার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? কতদিনের পরিচয়? তিনি ঢাকায় এসেছিলেন ওই সোমবার দিনই? প্রথম কোথায় দেখা হয় তার সাথে?'

ইকবাল চৌধুরী সিগারেট জ্বালাল। শহীদ লক্ষ করল হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে তার। শহীদের চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'বলছি। সব কথাই বলছি। বিশ্বাস করুন, কিছুই লুকাব না আমি।'

'শুরু করুন।' শহীদের কণ্ঠস্বর এতটুকু নরম শোনাল না।

ইকবাল চৌধুরী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলতে শুরু করল, 'কয়েক বছর আগের কথা, শাহানাকে আমি ভালবাসতাম। তখন আমি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ভালবাসাটা ছিল একতরফা অর্থাৎ শাহানা আমাকে ভালবাসত না। দেখা সাক্ষাৎ যা হত আমারই চেষ্টায়। আমাকে দেখে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, বিরক্তই হত ও। একটা সময় আসে যখন আমি ওর সাথে দেখা করা ছেড়ে দিই। কিন্তু ওকে না দেখে থাকতে পারতাম না আমি। বলতে সঙ্কোচ নেই, ওকে আমি অন্ধের মত ভালবাসতাম। আজও বাসি। কিন্তু আমার ভালবাসা যে ব্যর্থ হবে তা আমি মনে মনে জানতাম। তবু একদিন মরিয়া হয়ে উঠলাম। দেখা করলাম ওর সাথে, বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি। স্বভাবতই ব্যঙ্গ করে হাসল শাহানা। বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি না এবং ভালবাসতে কখনও পারবও না। সেই শেষ। ফেরার সময় ওকে বলেছিলাম, তুমি সুখী হও তাই আমি চাই। সেই জন্যেই অনুরোধ করছি, বিয়ে যদি করো তবে যাকে ভালবাসতে পারবে তাকেই করো। শাহানা বলেছিল, আচ্ছা, মনে রাখব কথাটা। এরপর ওর সাথে আমি আর দেখা করিনি। ঢাকায় চলে আসি আমি। ওকে ভুলে যাবার চেষ্টা করি। ভুলতে অবশ্য পারিনি। তবে ওর সাথে কোন সম্পর্ক রাখিনি, ওর খবর জানতেও চেষ্টা করিনি। তারপর হঠাৎ গত সোমবার দুপুরে, ফোন করে ও আমার বাড়িতে। আমাকে বলে, বিকালের ফ্লাইটে আমি ঢাকায় আসছি, তুমি এয়ারপোর্টে থেকো।'

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে ইকবাল আবার শুরু করল, 'ফোনে ওর কথাবার্তা শুনে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করি। ঢাকা এয়ারপোর্টে ওকে সশরীরে দেখে চমকে উঠি আমি। চেনা যাচ্ছিল না ওকে। চিরকাল ও শান্ত, নম্র ছিল। সিঁড়ি বেয়ে প্লেন থেকে নামার সময় ওর হাত নাড়া দেখে, হাসি দেখে, শরীর উন্মুক্ত করা পোশাক দেখে রীতিমত বিস্মিত হই। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। ওর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই আমি।'

'ঢাকায় আগমনের কারণ সম্পর্কে কি বলেন তিনি?'

'বলে, স্বামী চান ঢাকায় দিন পনেরো থাকি আমি একা, তাতে করে পরস্পরের প্রতি টান বাড়বে।'

'হুঁ। তারপরের ঘটনা বলে যান।'

ইকবাল শুরু করল, 'সংক্ষেপে বলি। শাহানা প্রথমে উঠতে চায় আমার বাড়িতে। বলে, ঢাকায় যে ক'দিন থাকব, মদ খাব, ফ্ল্যাশ খেলব, নাইটক্লাবে যাব—সবরকম ফুর্তি করে মজা লুটব। আমি ওর প্রস্তাব গ্রহণ করি না। ও বলে, ঠিক আছে, আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দাও। সেখানে আমি আধঘণ্টা থাকব, তারপর তুমি আমাকে ভাল কোন হোটেলে তুলে দিয়ে আসবে। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সাথে হোটেলে থাকতে পারো। আমি সব কিছু করে দিতে রাজি হই। কিন্তু হোটেলে ওর সাথে থাকতে অক্ষমতা প্রকাশ করি। এসব বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় আমি ওকে পরিষ্কার বলি, শাহানা, তোমাকে আমি ভাল মেয়ে বলেই জানি, সেটাই আমি চিরকাল জানতে চাই। শাহানা বলে ঢাকায় আমার একজন পুরুষ সঙ্গী দরকার। তুমি রাজি না হলে আমি অন্য পুরুষকে খুঁজে নেব। মোটকথা, শাহানার কথাবার্তা এবং ব্যবহার দেখে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, নির্ঘাত একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে ও। সেজন্যেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিই, যতক্ষণ সম্ভব ওর সাথে সময় কাটাব। ওর আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিই ওকে। টেলিফোনে ক্যাপিটাল হোটেলের স্যুইট রিজার্ভ করি। আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আবার ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হোটেলের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই। জরুরী একটা কাজ ছিল বলে তখন হোটেলে ঢুকিনি আমি। পরে, ঘণ্টাখানেক পরে সম্ভবত ক্যাপিটালের লাউঞ্জ থেকে ওকে ফোন করে জানাই আমার উপস্থিতির কথা। ফোন করার পর হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়ে যায়, তাকে নিয়ে আমি আধঘণ্টার জন্যে বাইরে বেড়িয়ে আসি। ফিরে দেখি শাহানা কাউন্টারের সামনে বসে শ্যাম্পেন পান করছে। তারপর···।'

শহীদ বলল, 'এসব আমি জানি। ক্যাপিটালের ককটেল লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে আপনারা হোটেল লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডোতে যান। সেখানে কি কি ঘটে সেখান থেকে কোথায় যান তাই বলুন।'

'ফ্ল্যাশ খেলার জন্য জেদ ধরায় ওকে হোটেল লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডোয় নিয়ে যাই আমি। ভিতরের রুমে জুয়া খেলা হয় জানতাম আমি। সেখানে গিয়ে রহস্যময় আচরণ শুরু করে শাহানা। আমাকে সে হঠাৎ বলে, আমি বুঝতে পারছি আমার সাথে থাকতে তুমি অস্বস্তি বোধ করছ। জোর করে তোমাকে আমি সঙ্গী করতে চাই না। তুমি অন্য টেবিলে বসে খেলো। আমি আর এক টেবিলে বসব।'

'তারপর?'

'ওর কথায় আপত্তি করে লাভ নেই জেনে তাই মেনে নিই আমি। আমি খেলতে বসি মনটাকে শান্ত করার জন্য। তবু মাঝে মধ্যেই ওর দিকে লক্ষ রাখছিলাম। চারজন ভদ্রলোকের সাথে খেলছিল ও। ওর পাশে বসেছিলেন যিনি তাকে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের মাথায় ছোট একটা টাক ছিল, যতদূর মনে পড়ছে। প্রথম থেকেই লক্ষ করি, শাহানা সেই ভদ্রলোকের সাথে খুব হেসে হেসে কথা বলছে। এমন কি, একসময় দেখি, ভদ্রলোকের কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে কি সব বলছে যেন তাকে। অসহ্য রাগ হয় আমার। কিন্তু কি করব ভেবে ঠিক

করতে পারি না। রাত এগারোটার দিকে শাহানা এবং সেই ভদ্রলোক এক সাথে খেলা ছেড়ে উঠে পড়ে। শাহানা দূর থেকেই আমার উদ্দেশে বলে, "ইকবাল, তোমাকে মুক্তি দিলাম। গুড নাইট!" ওর এই আচরণে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা যেমন কৌতুক বোধ করেন তেমনি আমার উপর করুণা বোধ করেন। লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে আমার। উঠে দাঁড়িয়ে যে দরজার দিকে এগোব সে শক্তিও আমার ছিল না। রাগে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম বলতে পারেন। যার ফলে শাহানা অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সাথে চলে যাচ্ছে, বিপদে পড়তে পারে ও—এসব কথা মনে জাগেনি আমার। রাত সাড়ে এগারোটার সময় আমি খেলা ছেড়ে উঠি। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিই শাহানার সাথে আমি আর দেখা করব না। দেখা করার চেষ্টাও আমি করিনি। ফোন করে ওর খবর নেবার ইচ্ছা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু যতবারই ফোন করার কথা ভেবেছি ততবারই মনে হয়েছে, কি লাভ? যে শাহানাকে আমি ভালবাসতাম সে শাহানার তো মৃত্যু ঘটেছে, এ অন্য এক শাহানা—তার খবরে দরকার নেই আমার।'

কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল শহীদ। নিচে, রাস্তায় কে যেন চিৎকার করে কি বলছে। মেঝের কার্পেট থেকে চোখ তুলল ও, বলল, 'ব্যস?'

ইকবাল চৌধুরী বলল, 'বিশ্বাস করুন বা না করুন।'

'কি যেন নাম বললেন···পুতুল। কি সম্পর্ক আপনার সাথে ওর?'

ইকবাল ইতস্তত করতে লাগল। তারপর বলল, 'বান্ধবী। এ ব্যাপারে ও কিছু জানে না।'

শহীদ বলল, 'জানুক বা না জানুক, আপনার সাথে ওকেও একবার থানায় যেতে হবে। থানায় না, আপনাদেরকে সি.আই.ডি বিভাগের স্পেশাল অফিসারের কাছে পাঠাব। তাতে ঝামেলা কম হবে। কিছু না, জবানবন্দী দিয়ে বেরিয়ে আসবেন আপনারা। তবে আপনার কথা যদি মিথ্যে প্রমাণিত হয় তাহলে থানাতেই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে এবং বেরুবার ব্যাপারটা নির্ভর করবে বিচারকের বিচারের উপর। যে যাক, মিসেস শাহানা যে ভদ্রলোকের সাথে জুয়ার আসর থেকে বেরিয়ে যান, তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'তিনি আমার দিকে পিছন ফিরে বসে ছিলেন, দেখতে পাইনি। মি. শহীদ, আমার সব কথাই আমি বলছি। চেষ্টা করলে আপনি সত্য মিথ্যা যাচাই করে দেখতে পারেন। এবার আপনি দয়া করে বলুন—কি হয়েছে শাহানার।'

'মিসেস শাহানা সেই রাত থেকে নিখোঁজ—আপনিই তাকে শেষবার দেখেছেন। তার স্বামী এখন ঢাকায়। ভদ্রলোক পাগলের মত হয়ে পড়েছেন স্ত্রীর সন্ধান পাবার জন্য।'

'শাহানা নিখোঁজ?'

শহীদ বলল, 'আশ্চর্যের এবং সন্দেহের ব্যাপার হচ্ছে, এই ক'দিন আপনি তার একটা খবর নেবারও চেষ্টা করেননি।'

'খবর নেবার চেষ্টা করিনি···কিন্তু আমি কি জানতাম···কল্পনাও করিনি যে···মানে, সত্যি সত্যি শাহানা কোন বিপদে পড়বে তা ভাবিনি···।'

শহীদ বলল, 'সে যাক। সত্য যথা সময়ে প্রকাশ পাবেই। এবার তা হলে উঠতে হয়, ইকবাল সাহেব।'

'মি. শহীদ,...মানে, আপনি জানেন আমি একজন সম্মানী লোক। থানায় বা সি.আই.ডি বিভাগে...'

শহীদ রিস্টওয়াচে সময় দেখে বলল, 'আরও কিছু তথ্য যদি দেবার থাকে, দিন। হ্যাঁ, আমি জানি আপনি সম্মানী লোক। আপনার কথাগুলো যদি সত্য হয়, আপনি যদি আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন, সম্মান হারাবার কোন ভয় নেই আপনার। তা না হলে...বুঝতেই পারছেন।'

ইকবাল চৌধুরী উঠল। বলল, 'বেশ চলুন। আচ্ছা, পুতুলকে এর সাথে না জড়ালেই কি নয়?'

'ঠিক আছে, আপনার বান্ধবী থাকুন এখানে।'

ইকবাল চৌধুরী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ, মি. শহীদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

শহীদ বলল, 'আমি ফোন করছি এখান থেকে সি.আই.ডি বিভাগের বিশেষ কর্মকর্তা মি. সিম্পসনকে। তিনি লোক পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবেন। আমি বলে দিচ্ছি ফোনে আপনাকে তিনি আটকে রাখবেন না।'

'আমার সাথে যাবেন না আপনি?'

শহীদ বলল, 'না। আমার হাতে সময় খুব কম।'

হাত বাড়াল শহীদ ফোনের দিকে।

দুই

বিশ মিনিট পর মি. সিম্পসনের ডান হাত ইন্সপেক্টর আকমল হোসেনকে সংক্ষেপে পরিস্থিতির সারমর্ম বুঝিয়ে দিয়ে তার সাথে ইকবাল চৌধুরীকে সি.আই.ডি ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিল শহীদ। হোটেল লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডোর লবিতে নেমে ফোন করল ও বাড়িতে। ফোন ধরল মহুয়া। শহীদের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেই মহুয়া অস্থির উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে বলল, 'শহীদ! কোথায় কি করছ তুমি?' এইমাত্র ফোন করেছিল কামাল। ওর পত্রিকা বেরিয়ে গেছে। মিসেস শাহানার ছবিসহ তার নিখোঁজ সংবাদটা তো ছাপা হয়েছেই, মি. ফেরদৌস দুই হাজার টাকা ঘোষণা করেছেন মিসেস শাহানা রেন্ট এ-কার-এর যে গাড়িটা নিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন সেই গাড়ির সন্ধান পাবার জন্য। এবং...।'

'গাড়িটা পাওয়া গেছে বুঝি?' শহীদ জানতে চাইল।

'পাওয়া গেছে। এবং কোথায় জানো?'

'কোথায়?'

মহুয়া রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ক্যাপিটাল হোটেলেই। অদ্ভুত, তাই না? হোটেলের গ্যারেজেই পাওয়া গেছে গাড়িটাকে। এই মুহূর্তে কামাল সেখানেই...'

'আমিও যাচ্ছি, মহুয়া। শোনো, চট্টগ্রাম থেকে রাসেলের ফোন আসবে। কথা

বোলো ওর সাথে, কেমন?'

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল শহীদ।

ক্যাপিটাল হোটেলের গ্যারেজের সামনে চওড়া কংক্রীটের উঠন। গাড়ি থেকে নামতেই মুখোমুখি দেখল শহীদ সিকিউরিটি চীফ্ আবদুস সামাদকে। কামাল বা কামালের মটর সাইকেলের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। আবদুস সামাদের খানিকটা পিছনে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক ছোকরা। কয়েক সেকেণ্ড ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল শহীদ। ছোকরাকে রীতিমত উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

আবদুস সামাদ বলল, 'গ্যারেজ অ্যাটেনড্যান্ট—খলিল। যোগফলে ফোন করে আগে, তারপর আমাকে জানায়। পুরস্কারের আশা!'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'পুলিশে খবর দিয়েছেন? গাড়িটা···গত সোমবার থেকেই এখানে পড়ে ছিল নাকি?'

'খবর দিয়েছি। জোর করে কিছুই বলা যাবে না।'

ছোকরা খলিলকে ডাকল শহীদ হাত-ইশারায়। সে কাছে আসতে বলল, 'আগে দেখোনি! পুরস্কারের কথাটা ঘোষণা করা মাত্রই চোখে পড়ে গেল? পুরস্কার ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলে নাকি?'

'জ্বী—! জ্বী না! আমি জানব কি ভাবে?' ছোকরার হাসি উবে গেল মুখ থেকে। বলে উঠল আবার, 'গ্যারেজে রাতদিন গাড়ি আসছে, যাচ্ছে—কোন্‌টা কখন যাচ্ছে আসছে মনে রাখা যায় না। কোন কোন গাড়ি তিন-চারদিন পড়ে থাকে। এখনই দেখুন না, এগারোটা গাড়ি রয়েছে। সকালে ছিল বত্রিশটা। বিজ্ঞাপনটা দেখে মনে মনে ভাবি, গ্যারেজের গাড়িগুলো একবার ভাল করে দেখলে হয়···দেখতে গিয়ে পেয়ে যাই ওটাকে।'

আবদুস সামাদ বলল, 'সন্ধ্যার পর থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত গ্যারেজে থাকে না কেউ। কোন গেস্ট যদি গাড়ি নিতে বা রাখতে চায় তাহলে বেলবয়কে জানায়, নয়তো নিজেই আসে।'

ফট্-ফট্-ফট্-ফট্—মটর সাইকেলের শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই শহীদ দেখল কামালের দুই চাকাওয়ালা গাড়িটা ওর পাশে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনের সীট থেকে নামল যোগফলের একজন ফটোগ্রাফার।

'সংবাদ পত্রের ক্ষমতা আর একবার প্রমাণিত হলো!' সহাস্যে বলল কামাল।

শহীদ বলল, 'কাজ শুরু করে দে। গাড়িটার ছবি তোল্, খলিলকে গাড়ির পিছনে দাঁড় করিয়ে রেখে।'

কামাল এগোল, ফটোগ্রাফারকে সাথে নিয়ে, 'কোন্ গাড়িটা? লাল টয়োটা তো দেখছি তিনটে!'

'মাঝখানেরটা···।'

খলিল এগোল কামালের আগে আগে। শহীদ পা বাড়াতে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছনে। জীপ আসছে একটা।

এগিয়ে গেল আবদুস সামাদ। জীপটা থামল তার পাশে। মি. সিম্পসন নামলেন। মুচকি হেসে শহীদ বলল, 'গুড ইভ্‌নিং, মি. সিম্পসন!'

'গুড ইভনিং, মাই বয়।'

আবদুস সামাদ হাত নেড়ে কি যেন বলছে, সিম্পসন তার দিকে মনোযোগী হয়ে পড়লেন। শহীদ পা বাড়াল কামালের দিকে।

খলিল দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পিছনে। ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে। কামালের কাঁধে টোকা দিল শহীদ, 'রেন্ট-এ-কার কোম্পানীর লোক চাবি নিয়ে আসছে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। গাড়ির ভিতর কালো ট্রাঙ্কটা দেখতে পাচ্ছিস?'

'বলিস কি! আমি কি অন্ধ যে দেখতে পাব না?'

শহীদ জোরে শ্বাস টানল, বলল, 'দুর্গন্ধ পাচ্ছিস না কি!'

কামালের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, 'তার মানে? তুই কি বলতে চাস?'

শহীদ কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু এগোতে হলো না ওকে। মি. সিম্পসন এবং আবদুস সামাদ এগিয়ে আসছে।

'মি. ফেরদৌসকে খবর দেয়া হয়েছে?'

'না। দিচ্ছি খবর···।'

শব্দ শুনে সবাই তাকাল, দেখল একটা কালো ফিয়াট এগিয়ে আসছে গ্যারেজের দিকে। গাড়িটা থামল ওদের পাশে। দু'জন লোক নামল। একজনের পরনে তেল-কালিতে কলঙ্কিত প্যান্ট-শার্ট, দেখেই বোঝা যায় মেকানিক।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আপনারা রেন্ট-এ-কার থেকে চাবি নিয়ে এসেছেন, তাই না? এগিয়ে যান, গাড়ির দরজার তালা খুলুন। কিন্তু সাবধান, হাতলে বা গাড়ির গায়ে হাত দেবেন না। কামাল?'

কামাল ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এখনও আসেনি। তোমার ফটোগ্রাফারকে বলো, গাড়ির হাতলের ছবি তুলতে।'

কামাল বলল, 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম তো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।'

রেন্ট-এ-কার-এর মেকানিককে নিয়ে সুপারভাইজার এগিয়ে গেল। হাতলে বা গাড়ির গা স্পর্শ না করে কী হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলল মেকানিক।

দরজা খোলা হতেই কামালের ফটোগ্রাফার ট্রাঙ্কের ছবি তুলে নিল।

'ট্রাঙ্কের হাতলের ছবি, কামাল,' শহীদ বলল।

ফটোগ্রাফার আবার ছবি তুলল।

শহীদ সুপাইভাইজারকে প্রশ্ন করল, গাড়ি ডেলিভারি দেবার সময় আপনারা পেট্রল, রানিং কণ্ডিশন ইত্যাদি সম্পর্কে রেকর্ড রাখেন?'

'রাখি। এটারও রেখেছি।'

মি. সিম্পসন শহীদকে পকেট থেকে রুমাল বের করতে দেখে চোখ কপালে তুললেন কিন্তু কিছু না বলে ওকে অনুসরণ করে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন লাল টয়োটার দিকে।

ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। কামাল তার পাশে। শহীদ

এবং মি. সিম্পসন গাড়ির ব্যাকডোরের ডানপাশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটু পিছনে আবদুস সামাদ।

একজন কনস্টেবল মি. সিম্পসনের নির্দেশে ট্রাঙ্কের ডালা তুলে ধরল।

ক্লিক! ক্লিক। ফটোগ্রাফার নির্বিকার ছবি তুলছে। কারও মুখে কথা নেই। দম বন্ধ করে চেয়ে আছে সবাই ট্রাঙ্কের দিকে। লাল শিফন দেখা যাচ্ছে একটা। শিফনের সর্বাঙ্গে সোনালি জরির নকশা। বব-চুল মেয়েটার। কুণ্ডলী পাকানো একটা লাশ। পায়ের হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে ঠেকেছে যুবতীর বুকের কাছে।

নিষ্ঠুর, মর্মন্তুদ একটা দৃশ্য। সবাই অস্বাভাবিক গম্ভীর। থমথম করছে মুখগুলো।

যুবতীর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারল না কেউ। নির্মমভাবে তার মুখটাকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে—চেনার কোন উপায়ই নেই। নিহত হবার আগে যুবতী হয়তো অসাধারণ সুন্দরী ছিল। কিন্তু তার উল্টোটা অর্থাৎ যুবতী যে কুৎসিত মুখের অধিকারিণী ছিল না তাও জোর করে বলা যায় না। মোট কথা, জানবার কোন উপায় রাখেনি খুনী।

ছুটন্ত পদশব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদ। তাকাল আর সবাই।

মোফাজ্জল সাহেব ছুটে আসছেন। মুখের চেহারা দেখে মনে হলো, কেঁদে উঠবেন। সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁকে। গায়ে কোট নেই, শার্টের বোতামগুলো খোলা, বাতাসে উড়ছে সেটা। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল।

এগিয়ে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল শহীদ, 'মি. ফেরদৌস…'

পাশ কাটিয়ে শহীদকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে গেলেন মোফাজ্জল সাহেব। কেউ তাঁকে বাধা দেবার আগেই তিনি লাল টয়োটার দরজার সামনে পৌঁছে গেলেন।

মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল মোফাজ্জল সাহেবের দেহ। শহীদ লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'টেক ইট ঈজি, মি. ফেরদৌস। আমার সাথে আসুন আপনি, প্লীজ। পরে সনাক্ত করবেন…।'

মোফাজ্জল সাহেব যেন শুনতে পাননি শহীদের কথা। স্থির বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি লাশটার দিকে। 'কে ও? ওকি…আমার স্ত্রী?'

শহীদ কাঁধে হাত রাখল মোফাজ্জল সাহেবের, 'জানি না এখনও। হতেও পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি আমার কথা শুনুন…'

'আমি সুস্থ আছি! আ…আমি…' বিড়বিড় করে বললেন মোফাজ্জল সাহেব।

ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন নিঃশব্দে মি. সিম্পসন। জানতে চাইলেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে? চিনতে পারছেন?'

মোফাজ্জল সাহেব কেঁপে উঠলেন, 'কিভাবে…চেনবার কোন উপায় আছে? শাহানা…'

মোফাজ্জল সাহেব দুই হাতে মুখ ঢাকতে গিয়ে টলে উঠলেন। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, শহীদ দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলল দেহটা। 'আমাকে সাহায্য করুন, সামাদ সাহেব।'

দু'জন ধরাধরি করে নিয়ে চলল ওরা মোফাজ্জল সাহেবকে। জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি।

দু'জন পোর্টার ছুটে আসছিল ওদের দিকে।

শহীদ বলল, 'ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।'

মি. সিম্পসন কামালকে নিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পিছিয়ে এলেন গাড়িটার কাছ থেকে। কামাল একটু বেশি আবেগপ্রবণ। মোফাজ্জল সাহেবের অবস্থা দেখে চোখে পানি এসে গিয়েছিল তার। অবশ্য সামলে নিয়েছে দ্রুত নিজেকে। মি. সিম্পসনের উদ্দেশে বলে উঠল, 'প্যাথেটিক!'

তিন

ঘণ্টাখানেক পরের কথা।

শহীদের ড্রয়িংরুম। মুখোমুখি সোফায় বসে আছে শহীদ, মি. সিম্পসন। কামাল এবং মহুয়া বসে আছে পাশাপাশি। মহুয়া ছাড়া আর সকলের সামনে এক কাপ করে ধূমায়িত কফির পেয়ালা।

মি. সিম্পসন পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বললেন, 'যাই বলো, আমার ধারণার কথা আমি বললাম। মি. ফেরদৌসের নির্দোষিতা প্রমাণ হয়নি সত্য, কিন্তু প্রমাণ করা সম্ভব। সে-কাজ আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করব। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, এই কেসে রহস্য বলতে কিছুই নেই। মিসেস শাহানা সম্পর্কে যতটুকু আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঢাকায় এসে তার গোপন ইচ্ছাগুলো ডানা মেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিশোরী মেয়েদের মত অস্থির, ছটফটে হয়ে ওঠে সে। ভালমন্দ বিচার বিবেচনার জ্ঞান হারিয়ে যার-তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার জন্য উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। এইভাবে খারাপ কোন লোকের পাল্লায় পড়ে যায়। সেই লোক নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং অবশেষে খুন করে তাকে। পরিষ্কার ব্যাপার। রহস্য কোথায়?'

শহীদ কথা বলল না। নিষ্পলক চেয়ে আছে সে খোলা জানালা পথে।

মি. সিম্পসন উঠলেন, 'চললাম। নতুন খবর হলে জানাব, শহীদ।'

শহীদ অন্যমনস্কভাবে ঘাড় কাত করল। মি. সিম্পসন বেরিয়ে গেলেন জুতোর শব্দ তুলে।

ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল জুতোর শব্দ।

শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন একটা নয়, অনেকগুলো ভুল করছেন।'

কামাল এবং মহুয়া একযোগে জানতে চাইল, 'যেমন?'

শহীদ নড়ে চড়ে বসল, 'এক, তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ না পেয়েই ধরে নিচ্ছেন লাশটা মিসেস শাহানার।'

মহুয়া সবিস্ময়ে বলল, 'তুমি কি বলতে চাও...'

হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে শহীদ বলল, 'মুখটা এমনভাবেই ক্ষত বিক্ষত যে মুখ নেই বললেই চলে। কোন সন্দেহ নেই যে লাশের পোশাক ইত্যাদি আর সব কিছু দেখে বোঝা যাচ্ছে লাশটা মিসেস শাহানারই। কিন্তু মুখহীন একটা লাশকে

নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করবে তোমরা কিভাবে? এই ব্যাপারটাই চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। আমার জীবনে এইরকম লাশ আমি কম দেখিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গভীর রহস্য ছিল—তদন্ত করে তা উন্মোচন করেছি আমি! আমার বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও গভীর রহস্য রয়েছে! আমার সন্দেহ হচ্ছে…'

'কি সন্দেহ হচ্ছে তোমার?' সাগ্রহে জানতে চাইল মহুয়া।

'সন্দেহ হচ্ছে, আমাদেরকে খুনী বোকা বানাতে চায়। খুনী হয়তো চাইছে লাশটা দেখে আমরা ধরে নিই ওটা মিসেস শাহানারই লাশ। আসলে হয়তো তা নয়।'

কামাল বলল, 'তোর কথার ভিত্তি মজবুত নয়, বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি। গাড়িটার কথা ধর, মাত্র বাইশ মাইল চলেছে ওটা। বোঝা যাচ্ছে, সোমবার রাতেই গাড়িটাকে হোটেলের গ্যারেজে নিয়ে এসে রাখা হয়। সরকারী ডাক্তার তার রিপোর্টে বলছে, খুন করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাশটাকে ট্রাঙ্কের ভিতর ঢোকানো হয়েছে। সোম কি মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই কাজটা করা হয়েছে, তাঁর বিশ্বাস।'

শহীদ বলল, 'এসব আমিও জানি, কিন্তু লাশের মুখের চেহারা ক্ষতবিক্ষত করার কারণ কি?'

মহুয়া বলল, 'হাতের ছাপ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।'

শহীদ পাইপে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'মি. সিম্পসন চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। ইতিমধ্যেই তিনি মি. ফেরদৌসকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন মিসেস ফেরদৌসের ফিঙ্গার প্রিন্টের রেকর্ড আছে কিনা। রেকর্ড নেই। মি. সিম্পসন মি. ফেরদৌসের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়েছেন। আজ রাতেই তিনি লাশের ফিঙ্গারপ্রিন্টের নমুনা পাঠিয়ে দেবেন চট্টগ্রামে। তাঁর নির্দেশে চট্টগ্রাম শহরের পুলিশ মি. ফেরদৌসের বাড়িতে গিয়ে মিসেস শাহানার হাতের ছাপ সংগ্রহ করবে। রিপোর্ট পাওয়া যাবে আগামী কালের মধ্যেই। তখন হয়তো শিওর হওয়া যাবে।'

মহুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভদ্রলোকের জন্য বড্ড মায়া হচ্ছে আমার, যাই বলো। তবে এ বরং একদিক থেকে ভালই হয়েছে। মিসেস শাহানা খুন হয়েছেন স্বামীর পক্ষে এ বরং সহনীয়। কিন্তু যদি জানা যেত যে, না, মিসেস শাহানা খুন হননি, অপর পুরুষের সাথে রাত কাটাচ্ছিলেন—আঘাতটা আরও ভয়ঙ্কর হত। নিজের স্ত্রীকে অসতী দেখার চেয়ে তার লাশ দেখা বরং ভাল।'

শহীদ মুচকি হাসল, 'কে যে কিসে খুশি হয় তা বলা বড় কঠিন, মহুয়া। একটা রহস্য কি জানো, মি. ফেরদৌস তার স্ত্রী সম্পর্কে যা মনে করেন তা ভুল। মিসেস শাহানা সম্পূর্ণ তার উল্টো প্রকৃতির। মি. সিম্পসনের ব্যাখ্যাটা আংশিক ঠিক। মিসেস শাহানা ঢাকায় পা দিয়েই পুরুষদের নিয়ে ভয়ঙ্কর এক খেলায় মেতে ওঠে।'

ক্রিং…ক্রিং…

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে কানের কাছে তুলল শহীদ, 'শহীদ খান স্পীকিং।'

'শহীদ ভাই, রাসেল বলছি।'

'কি খবর, রাসেল? পেলে কিছু তথ্য?'

রাসেল বলল, 'পেয়েছি। কিন্তু আপনি যে রকম আশা করেছিলেন তেমন তো

নয়ই বরং ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। মিসেস্ শাহানার নামে গোটা চট্টগ্রাম শহরে আধখানাও বদনাম নেই। পুরুষদের নাচানো তার স্বভাব ছিল না। অভিনেত্রী, অভিনেতা—অনেকের সাথে কথা বলেছি আমি। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে, শাহানা ছিল অত্যন্ত ভদ্র, নম্র এবং চরিত্রবতী মেয়ে। স্বামীকে ছাড়া দুনিয়ার কাউকে ভালবাসত না। বিয়ে করার পর বাইরেও বেরুত খুব কম। ওদের বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের যাতায়াত ছিল না বললেই হয়। শহীদ ভাই, ভদ্রমহিলাকে এখনও পাওয়া যায়নি নাকি?'

'পাওয়া গেছে। তার লাশ।'

'অ্যাঁ!'

শহীদ বলল, 'শোনো, রাসেল। এবার তুমি মি. মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। ওঁর স্ত্রী সোমবার বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকায় এসেছিল। সম্ভবত সেদিন রাতেই সে খুন হয়। সন্ধান নিয়ে জানবার চেষ্টা করো সোমবার রাতে মঙ্গলবার সারাটা দিন কোথায় ছিলেন মি. ফেরদৌস। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও তথ্য চাই।'

রাসেল উৎসাহের সাথে বলল, 'ঠিক আছে, শহীদ ভাই। মহুয়াদি, রুবিন, কেমন আছে ওরা?'

'খুব ভাল আছে। রাসেল, টাকার দরকার হলে...'

'দরকার নেই, শহীদ ভাই। দরকার হলে আমিই তো জানাব। ছাড়ি।'

'হ্যাঁ।'

শহীদ রিসিভার নামিয়ে রাখতেই মহুয়া প্রতিবাদের সুরে বলল, 'তোমার মন—চিনতে পারলাম না এতদিনেও। ফেরদৌস সাহেবের ব্যক্তিগত জীবন, সোমবার রাতে তিনি কোথায় ছিলেন—এসব খবর জানতে চাইছ কেন শুনি? শেষ পর্যন্ত আসল খুনীকে ধরতে না পারলে ওই নিরীহ ভদ্রলোককে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে চাও নাকি?'

শহীদ মহুয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বলল, 'গেট আউট, ম্যাডাম। আমাকে এখন চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দাও।'

কামাল এবং মহুয়া একযোগে উঠে দাঁড়াল। কামাল হাসতে হাসতে বলল, 'চিন্তাভাবনা করতে চাও করো। ফলাফল কিন্তু সোনার ডিম চাই।'

'সোনার ডিম নয়, ফলাফল হবে—ঘোড়ার ডিম।' কথাটা বলে মহুয়া অন্দর মহলের দিকে পা বাড়াল। সশব্দে হেসে উঠে তাকে অনুসরণ করল কামাল।

শহীদ পায়চারি শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

চার

সে রাতে আর হোটেল ক্যাপিটালে গেল না শহীদ।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ড্রয়িংরুমে ঢুকে দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়ে বসল ও। হোটেলের গ্যারেজে গাড়ির ভিতর লাশ প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রতিটি দৈনিকই বড় বড়

হেডিং করে খবর ছেপেছে। শহীদের জানা নেই এমন দু'একটা তথ্যও পাওয়া গেল। যেমন লাশের সাথে ভ্যানিটি ব্যাগ, হীরে বসানো আঙটি এবং গলার নেকলেসটা পাওয়া যায়নি গাড়ির ভিতরে বা বাইরে, কোথাও কারও হাতের ছাপ মেলেনি। লাশটা যে নিখুঁত এবং নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি রিপোর্টাররা তা উল্লেখ করতে ভুল করেনি। মি. সিম্পসনের উদ্ধৃতিও ছাপা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য সেই একই—কোন ডাকাতের বা গুণ্ডার হাতে নিহত হয়েছেন মিসেস শাহানা। কারণ উল্লেখ না করে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, খুনী সর্বস্ব লুঠ করেছে এবং মিসেস শাহানার মুখের চেহারা বিকৃত করেছে, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। প্রতিটি দৈনিক খবরের শেষ প্যারায় শহীদের নাম উল্লেখ করে লিখেছে—প্রখ্যাত শখের গোয়েন্দা শহীদ খান এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব নিয়েছেন দেখে অনুমান করা যায় যে এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে জটিলতা অথবা গভীর রহস্য রয়েছে।

কাগজগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে পাইপে টান দিল শহীদ।

ক্রিং···ক্রিং···

রিসিভার তুলল শহীদ। অপরপ্রান্ত থেকে অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওর কানে, 'মি. শহীদ খান, শখের গোয়েন্দাকে চাই আমি!'

'বলছি।'

মার্জিত কিন্তু ব্যগ্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী ভদ্রলোক বললেন, 'মি. শহীদ, আপনি আমাকে চিনবেন না, সকালের কাগজে এই মাত্র দেখলাম মিসেস শাহানা হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন···'

'ঠিকই দেখেছেন।'

ভদ্রলোক আবেদনের সুরে বললেন, 'মি. শহীদ, এই মুহূর্তে আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি, আপনাকে···আপনার সাহায্য দরকার আমার। নিহত ভদ্রমহিলা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই আমি···আমি কি আপনার বাড়িতে আসব?'

শহীদ ভদ্রলোককে ওর বাড়ির ঠিকানা জানাল, বলল, 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

'ধন্যবাদ, মি. শহীদ, ধন্যবাদ!'

দশ মিনিটও কাটল না, শহীদের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বয়স কোনমতেই চল্লিশের বেশি হবে না। পরনে দামী কাপড়ের ট্রপিকাল স্যুট। মাথার পিছন দিকে এতটুকু একটা টাক। চুলে এখনও পাক ধরেনি। মুখটা গোলগাল, শরীরে মেদ থাকলেও, খুব বেশি নয়। ভদ্রলোক পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির মত লম্বা। গায়ের রঙ শ্যামলা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল শহীদ ভদ্রলোককে। লক্ষ করল রুমাল দিয়ে ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছছেন। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন বোঝা যায়।

বসতে অনুরোধ করে শহীদ বলল, 'ফোনে আপনি আপনার নাম বলেননি।'

'আমার নাম দেলওয়ার হোসেন। দিনাজপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায়

বেড়াতে এসেছি। দিনাজপুরে কয়েকটা ব্যবসা আছে আমার। ঔষধের দোকান, বাইসাইকেল পার্টসের এজেন্সী, মটর পার্টসের দোকান, এইসব।'

শহীদ বলল, 'আপনি ঠিক কি বলতে এসেছেন জানি না। তবে মিসেস শাহানাকে নিয়ে গত সোমবার রাত এগারোটার দিকে আপনি লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডো হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। তাই না?'

দেলওয়ার হোসেনের চোখ কপালে উঠল, বললেন, 'হ্যাঁ—কিন্তু এ খবর আপনি জানলেন কিভাবে?'

শহীদ বলল, 'জানি। আপনি বরং আপনার বক্তব্য বলুন।'

দেলওয়ার হোসেন বলল, 'কথাগুলো আসলে জানানো দরকার পুলিশকে। গতকাল সন্ধ্যায় যোগফলে ভদ্রমহিলার ছবি দেখা অবধি আমি ছটফট করতে শুরু করি। তখন ভেবেছিলাম তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে।'

বিরতি নিয়ে মাথা দোলালেন তিনি। আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু সকালে তাঁর নিহত হবার খবর কাগজে দেখে ঘাবড়ে গেলাম। পুলিশের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকলেও মন সায় দিল না। মি. শহীদ, আপনার ডিমাণ্ড অনুযায়ী ফী দিতে আমি রাজি আছি, আপনি শুধু আমাকে পুলিশী ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন কিনা বলুন।'

শহীদ বলল, 'আপনার কথা শেষ করুন আগে। সব না শুনে কথা দিই কিভাবে? আপনি যদি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না হন...'

'অবশ্যই আমি জড়িত নই! সব কথা বলছি আপনাকে, তাহলে বুঝতে পারবেন।'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে দেলওয়ার হোসেন আবার শুরু করলেন, 'রাত সাড়ে ন'টার দিকে আমার সাথে পরিচয় হয় মিসেস শাহানার। এর আগে আপনাকে জানাতে চাই, স্ত্রীর কাছে আমি একজন আদর্শ এবং বিশ্বস্ত স্বামী। জুয়া আমি সচরাচর খেলি না। মদও খাই না, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়েদের ব্যাপারে, সত্যি কথা বলতে কি, অন্যায় কোন অভিজ্ঞতাও নেই। সোমবার বিকেল থেকে আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বাইরে বেরুতে না পারলেও এক রকম জোর করে আমাকে সন্ধ্যাটা বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে আসার জন্য ব্যস্ত করে তোলেন। অগত্যা একাই বেরুই আমি। আমার এক বন্ধুর সাথে আমি লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডোয় যাই। ওখানে ফ্ল্যাশ খেলা হয় তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধু সরাসরি আমাকে সেই তাসের আসরে নিয়ে যায়। খেলা চলছে দেখে আমিও ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়ি এবং খেলতে বসি। রাত তখন সাড়ে আটটা হবে হয়তো। মিসেস শাহানা সম্ভবত এই সময়ের খানিক পর ওখানে পৌঁছান। আমাদের টেবিলেই বসেন তিনি। সাথে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তবে তাকে আমি তখনও দেখিনি। না দেখার কারণ, তখন আমি প্রচুর হেরে গেছি, কোনও দিকে খেয়াল দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না।'

দম নিয়ে আবার শুরু করলেন দেলওয়ার হোসেন, 'মিসেস শাহানা খেলতে বসার পর খেলার মোড় ঘুরে গেল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার লস কভার করে

বেশ কিছু টাকা জিতলাম আমি, ঠিক এই সময় থেকে যেচে পড়ে আলাপ শুরু করলেন মিসেস শাহানা আমার সাথে। আলাপ শুরু করলেন, মানে, ব্যক্তিগত কথা জানতে চাইলেন এবং নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁর স্বামী তাকে পনেরো দিনের জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছেন ফুর্তি করতে…এবং তিনি চানও তাই করতে। ভদ্রমহিলার মার্জিত কথা বলার ভঙ্গি, চেহারা, পোশাক ইত্যাদি দেখে আমি মুগ্ধ হই। বাজে মেয়েদের একজন বলে মনে হচ্ছিল না তাঁকে। তা মনে হলে আমি তাঁকে এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করতাম। যাক, এখানে একটা কথা স্বীকার করা উচিত। ভদ্রমহিলার প্রতি আমি সত্যি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। আপনাকে বলেছি, স্ত্রী ছাড়া আর কোন মেয়ে আমার জীবনে আসেনি। কিন্তু সেই রাতে, ভদ্রমহিলার পাশে বসে আমার মন অন্য রকম হয়ে উঠল। আমি নির্জনে ভদ্রমহিলার সান্নিধ্য পাবার জন্য…পাগল না হলেও, ভিতরে ভিতরে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। একজন সদ্য পরিচিত ভদ্রমহিলার প্রতি এই রকমভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠা শোভন বা সঙ্গত নয়, তা আমি জানি। কিন্তু এর জন্যে যতটা না আমি দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী ভদ্রমহিলা স্বয়ং। তিনি ক্রমশ আমার অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। এক সময়, লক্ষ করলাম তিনি আমার গায়ে গা ঘেঁষে বসেছেন। তাঁর পোশাকে ছড়ানো সেন্টের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। খানিক পর, তিনি কণ্ঠস্বর নামাতে নামাতে একেবারে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করলেন। একবার তিনি আমার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে অতি অন্তরঙ্গভাবে বললেন—আমার সাথে এখানে এক লোক এসেছে। লোকটা ছ্যাঁচড়া! আমার পিছু ছাড়ছে না! অনেকদিনের পরিচয়—কিছু বলতেও পারছি না। লোকটাকে ভাগাবার জন্যে, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন? আমি সহাস্যে জানতে চাই—কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমি? তিনি বলেন, বুঝতেই তো পারছেন, লোকটাকে ভাগাতে না পারলে আপনার সাথে যেতে পারব না। ভাগাতে না পারলে, অন্তত আমার পিছু ত্যাগ করে যাতে তার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটা নীরস ইমপোটেন্ট। একটুও ভাল লাগে না ওকে আমার! ভাল কথা, আপনি আড্ডাটাড্ডা পছন্দ করেন তো? আমার স্বামী নেই এখানে, আমি একা—সুযোগটা আপনি নিতে পারেন। আমি আবার সেই একই প্রশ্ন করি, বলি, সে দেখা যাবে। কিন্তু কি সাহায্য চান আপনি? তিনি বলেন, আপনি আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলুন, হাসুন। ব্যাপারটা লক্ষ করবে লোকটা। মনে মনে নিরাশ হয়ে পড়বে। তারপর একসময় আমরা এক সাথে উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাব এখান থেকে, কেমন? আমি রাজি হই। এবং খানিক পর ওর কথা মত তাই করি।'

শহীদ বলল, 'ওখান থেকে বেরিয়ে আপনারা কোথায় যান?'

দেলওয়ার হোসেন বলেন, 'ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনটা বেঁকে বসে। স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, বুঝতে পারি। কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার পর আমি বলি, চলুন, আমরা যে হোটেলে উঠেছি সেখানেই যাই। আপনার সাথে আমার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেব।'

শহীদ হঠাৎ হেসে ফেলল। বলল, 'তারপর।'

'ভদ্রমহিলা বললেন···বললেন···'

দেলওয়ার হোসেনের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তিনি কথাটা শেষ করতে পারছেন না বুঝতে পেরে শহীদ জানতে চাইল, 'কি বললেন তিনি?'

'বললেন···বললেন, না, আগে অন্য কোন হোটেল রুম ভাড়া নিয়ে···আসলে তিনি কি বোঝাতে···।'

শহীদ বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বলে যান।'

দেলওয়ার হোসেনের কণ্ঠস্বর খাদে নামল, 'গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন তিনিই। এক সময় বললেন, আমরা নিউ সিটি হোটেলে যাচ্ছি! আমি কোন আপত্তি করলাম না। ইতিমধ্যে, তাঁর প্রস্তাবে, আমি মনে মনে রাজি হয়ে গেছি। স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে একথা একদম মনেই নেই।'

'তারপর কি হলো? সিটি হোটেলে পৌঁছলেন আপনারা···।'

'না—হ্যাঁ, বলতে পারেন পৌঁছলাম। হোটেলটা নিশ্চয়ই চেনেন আপনি? রাস্তার ধারেই। হোটেলের গেটেই গাড়ি থামালেন মিসেস শাহানা। পোর্টার এবং গেটম্যান এক সাথে স্যালুট করল! পোর্টারই খুলে দিল আমার পাশের দরজাটা। আমি নেমে মিসেস শাহানাকে নামতে সাহায্য করার জন্য তার দিকের দরজার প্রতি হাত বাড়ালাম এমন সময় হুস্ করে গাড়িটা সামনে থেকে সরে গেল চোখের পলকে।'

'মানে!' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল শহীদ।

দেলওয়ার হোসেন ম্লান মুখে বললেন, 'আপনার মতই, আমিও চমকে উঠেছিলাম। যাক, পরের ঘটনা বলি। বলার নেইও বিশেষ কিছু। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, গাড়ির পিছনের লাল দুটো আলো ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আমাকে ব্যঙ্গ করতে করতে। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল আলো দুটো। এতক্ষণে খেয়াল হলো, পোর্টার এবং গেটম্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে আমারই পাশে। লজ্জায় মাথা তুলতে পারলাম না। আড়চোখে দেখি দু'জনেই চেষ্টা করছে হাসি চেপে রাখতে। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম আমি।'

শহীদ বলল, 'এখানেই শেষ? এরপর আর দেখেননি আপনি মিসেস শাহানাকে?'

'না। এরপর আর দেখিনি।'

শহীদ বলল, 'আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে ঘটনাটার কথা নিউ সিটি হোটেলের পোর্টার এবং গেটম্যান জানে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা সাক্ষী দেবে।'

দেলওয়ার হোসেন বললেন, 'ঘটনাটা ভুলে যাবার মত নয়। খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা, তাই না? সাক্ষী না দেবার কোন কারণ নেই।'

শহীদ বলল, 'উঠুন তাহলে। আপনাকে আমি আপনার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে নিউ সিটিতে যাব।'

'মি. শহীদ, পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আপনার কাছে এসেছি আমি। যা জানি, যা সত্যি সবই আপনাকে বলেছি। আপনি···'

'আপনার কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে অবশ্যই পুলিশের সন্দেহ যাতে আপনার ওপর না পড়ে তার ব্যবস্থা আমি করব। চলুন, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

উঠল ওরা।

পাঁচ

দুপুর অতিক্রান্ত প্রায়। ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে একমনে পাইপ টেনে চলেছে শহীদ। মহুয়া উপস্থিত থাকলেও, সে একটা রোমাঞ্চোপন্যাসে ডুবে আছে গভীর মনোযোগের সাথে।

মিসেস শাহানা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কেই চিন্তাভাবনা করছিল শহীদ। দেলওয়ার হোসেনের কাহিনী যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পেয়েছে ও। নিউ সিটি হোটেলের গেটম্যান এবং পোর্টার দু'জনই তার কাহিনীর সত্যতার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছে। ঘটনাটা সবিস্তারে উল্লেখ করেছে তারা। মিসেস শাহানাকে খুব ভাল করে দেখার সুযোগ না পেলেও, চেহারাটা ভুলে যাবার মত নয়। শহীদ ওদেরকে মিসেস শাহানার ফটো দেখায়। ওরা বলে—এই ভদ্রমহিলাই, মনে হচ্ছে।

সুতরাং দেলওয়ার হোসেন সাহেব নির্দোষ। তাঁর উপর সন্দেহ করা চলে না। প্রশ্ন হলো, মিসেস শাহানা তাঁর সাথে অমন অস্বাভাবিক আচরণ কেন করেছিল? দেলওয়ার হোসেনকে লোভ দেখিয়ে লাইট অ্যাণ্ড শ্যাডোর জুয়ার আসর থেকে বের করে এনে এভাবে বোকা বানাবার পিছনে কি কোন উদ্দেশ্য ছিল?

ছিল। কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে শহীদের। কিন্তু উদ্দেশ্য বা রহস্যটা যে কি তা জানতে পারছে না ও।

বারান্দায় জুতোর শব্দ। চিনতে পারল শহীদ। মি. সিম্পসনের কাছে পাঠিয়েছিল ও কামালকে।

মহুয়া হাতের বইটা একপাশে রেখে মুখ তুলে তাকাল দরজার দিকে। কামালকে দেখা গেল দরজার সামনে।

'এসো। নতুন কোন খবর এনেছ?' প্রশ্নটা স্বভাবতই, মহুয়ার।

মহুয়ার পাশে বসে পড়ল কামাল। বলল, 'হ্যাঁ। মি. সিম্পসন বলছেন, আগামী ছয় ঘণ্টার মধ্যে তিনি মিসেস শাহানার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হবেন।'

কথাটা বলেই কামাল হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

হাসি থামতে আবার মুখ খুলল সে, বলল, 'ভুমটা ভাঙিয়ে দিয়ে এসেছি। তাঁর ধারণা ছিল, দেলওয়ার হোসেন হত্যাকারী। ইকবাল চৌধুরীর জবানবন্দী পড়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছান তিনি।'

শহীদ জানতে চাইল, 'তোকে যে খবর নিতে পাঠিয়েছিলাম তার কি হলো?'

কামাল বলল, 'মি. সিম্পসন লাশটার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে—নিজেই সন্দিহান ছিলেন, বুঝলি। চট্টগ্রামে লাশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাঠিয়েছিলেন তিনি গতকালই। সেখানকার পুলিশ ফেরদৌস সাহেবের বাড়িতে গিয়ে মিসেস শাহানার পুরানো

হাতের ছাপ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং সফল হয়। সেই পুরানো হাতের ছাপের নমুনা পেয়েছেন খানিক আগে মি. সিম্পসন। মিলিয়ে দেখেছেন—হুবহু এক। অর্থাৎ এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে লাশটা মিসেস শাহানারই।'

শহীদ গম্ভীর হয়ে উঠল। খানিক পর জানতে চাইল, 'পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট কি বলছে।'

'বুলেটই মৃত্যুর কারণ। মিসেস শাহানার ব্লাউজটা ছিল লো কাট্ ফলে বুলেটটা বুকে বিঁধলেও ব্লাউজ বা শাড়িতে ফুটো করতে পারেনি। স্বভাবতই, শাড়িটা ছিল না বুকের কাছে। বুলেট ছোঁড়া হয়েছে থার্টি-টু ক্যালিবার পিস্তল থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস শহীদ? মুখের ওই সব ভয়ানক গভীর ক্ষতগুলো করা হয়েছে খুন করার পর।'

মহুয়া শহীদের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখল শহীদের চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক করছে। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না সে।

কামাল বলে চলেছে, 'মেডিক্যাল এগজামিনার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে পজিটিভ হতে পারছেন না। তবে সোম এবং মঙ্গলবার রাতের মধ্যে যে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে—এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। সোমবার রাতের ওপর জোর দিচ্ছেন বেশি। লাশের নিচে, কালো ট্রাঙ্কের মেঝেতে, রক্তের দাগ নেই···তাঁর ধারণা মৃত্যুর অন্তত এক ঘণ্টা পর লাশটা ঢোকানো হয়েছে ট্রাঙ্কে। আর একটা কথা, মৃত্যুর ঘণ্টা দু'য়েক আগে মিসেস শাহানা মুরগীর রোস্ট এবং মদ খেয়েছিলেন।'

কামাল শেষ করল।

মহুয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে?'

মুচকি হেসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শহীদ বলল, 'আমাকে চ্যালেঞ্জ করার মনোভাব রয়েছে দেখছি তোমার মধ্যে?'

'অবশ্যই। তুমি অকারণে বেচারা ফেরদৌস সাহেবকে সন্দেহ করছ কেন? আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি ফেরদৌস সাহেব তাঁর স্ত্রীকে খুন করতে পারেন না। এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারি আমি।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাক কি হয়। রাসেলের ফোন আসবে, সময় হয়ে গেছে···'

ক্রিং···ক্রিং···

শহীদ দ্রুত তুলে নিল ফোনের রিসিভার, 'শহীদ খান স্পীকিং।'

'শহীদ ভাই, আপনাকে ফোন করতে দেরি হয়ে গেল। আজ রবিবার, মানুষজনকে নির্দিষ্ট কোথাও পাওয়া যায় না।'

শহীদ বলল, 'কতদূর কি জানতে পারলে বলো তো!'

রাসেল বলল, 'আপনি হয়তো নিরাশ হবেন, শহীদ ভাই! ফেরদৌস সাহেব সম্পর্কে বিশদ খবর সংগ্রহ করেছি আমি। কোন সন্দেহ নেই যে তিনি সোমবার এবং মঙ্গলবার দিন রাতে চট্টগ্রাম শহরেই ছিলেন।'

শহীদ বলল, 'হুঁ।'

রাসেল আবার শুরু করল, 'তবে নতুন একটা খবর আছে। ফেরদৌস সাহেব

এবং তাঁর স্ত্রীর নামে এক লক্ষ টাকার একটা যুক্ত বীমা আছে। একজনের মৃত্যু হলে টাকাটা অপরজনের পাবার কথা। টাকাটা একটা মোটিভ হতে পারে তাই না? ওদের বন্ধু-বান্ধবের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানতে পেরেছি ইদানীং ফেরদৌস সাহেবের আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না, সংকটেই ছিলেন বলা যায়। আপনি চাইলে আমি আগামীকাল জানার চেষ্টা করতে পারি ফেরদৌস সাহেব ধার দেনা করেছিলেন কিনা, করলে কি পরিমাণ করেছিলেন।'

শহীদ জানতে চাইল, 'আর কিছু?'

রাসেল বলল, 'নির্ঘাত! সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ খবর···খবর না বলে গুজব বলাই ভাল···।'

'গুজব?'

'হ্যাঁ। একটি যুবতী মেয়েও জড়িত, শহীদ ভাই। ফেরদৌস সাহেবের অফিস সেক্রেটারি মিস জেসমিন। বছর তিনেক ধরে ফেরদৌস সাহেবের ফার্মে চাকরি করছে মেয়েটা। প্রথম বছর সম্পর্কটা যা হওয়া উচিত তাই ছিল। পরের বছর ফেরদৌস সাহেবের সাথে সিরিয়াস ধরনের তিক্ত হয়ে ওঠে তার সম্পর্ক। কিন্তু এই তিক্ততার কারণ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ওদের দু'জনের ব্যক্তিগত ব্যাপার···আমি বলতে চাইছি, গোপনীয় ব্যাপার। সবাই আশা করেছিল মিস জেসমিনের চাকরি নির্ঘাত যাবে। কিন্তু তা যায়নি। অনেকের কাছেই এটা একটা রহস্য। কেন যে ফেরদৌস সাহেব তাকে চাকরি থেকে সরাননি তা জানা যায়নি। কারও কারও ধারণা মিস জেসমিনকে ভয় করতেন ফেরদৌস সাহেব। কারণটা অজ্ঞাত। তারপর, তৃতীয় অর্থাৎ চলতি বছরের গত মাস দু'য়েক আগে থেকে হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ওদের সম্পর্ক প্রায় রাতারাতি শুধু স্বাভাবিক নয়, রীতিমত মধুর হয়ে ওঠে। রহস্যময়, তাই না?'

শহীদ বলল, 'খুবই। কি জানতে পেরেছ তার সম্পর্কে?'

রাসেল নাটকীয় কণ্ঠে বলল, 'তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েও রহস্যের গন্ধ পেয়েছি। মিসেস শাহানার সাথে তার চেহারার, চুলের, দৈহিক আকার আকৃতির প্রচুর মিল আছে। আরও বিস্ময়কর ঘটনা, গত সোমবার থেকেই সে ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে···পনেরো দিনের জন্যে। কক্সবাজারে বেড়াতে যাবার কথা তার। মিনার্ভা হোটেলের রুম রিজার্ভ করা হয়েছিল হপ্তা খানেক আগে।'

শহীদ বলল, 'কাজ বন্ধ কোরো না, রাসেল। মিস জেসমিন সম্পর্কে যা পাও সংগ্রহ করো, কক্সবাজারের মিনার্ভা হোটেলেও ফোন করে খবর নাও।'

রাসেল উৎসাহভরে জানাল, 'আজই আমি খবর নিচ্ছি। শহীদ ভাই, ওদিকের খবর কি? নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?'

রাসেলকে সর্বশেষ ঘটনার কথা জানাল শহীদ। রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে বলল, 'ধন্যবাদ, রাসেল।'

মহুয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'কি জানলে?'

শহীদ বলল, 'বিশেষ কিছু নয়। মিস জেসমিন জড়িত।'

'কে?'

শহীদ বলল, 'মি. ফেরদৌসের অফিস সেক্রেটারি। মিসেস শাহানার সাথে চেহারাগত মিল আছে। সে-ও…'

ধীরে ধীরে সব বলল শহীদ। সব শুনে মহুয়া একটু নিরাশই হলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা সবাই উঠে পড়ে লেগেছ বেচারা ফেরদৌস সাহেবকে ফাঁসাবার জন্য…। যাই, চা করতে বলে আসি।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'মি. ফেরদৌসের সাথে দেখা করেছিলি?'

কামাল বলল, 'করেছিলাম। যাই বলিস শহীদ, ভদ্রলোককে দেখে সন্দেহ করা যায় না। স্ত্রীর শোকে পাথর হয়ে গেছেন ভদ্রলোক।'

শহীদ বলতে শুরু করল, 'কি জানিস, মানবচরিত্র…'

ক্রিং! ক্রিং! ক্রিং!

ভুরু কুঁচকে ফোনের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়াল শহীদ, বলল, 'হ্যালো?'

রাসেলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল তারের মাধ্যমে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে, 'জরুরী একটা খবর এইমাত্র পেলাম শহীদ ভাই। আপনার সাথে কথা শেষ করে ফোন করেছিলাম কক্সবাজারে—মিনার্ভা হোটেলে। হোটেলের ম্যানেজারের সাথে কথা হলো। তিনি বললেন, মিস জেসমিন গত সোমবার হোটেলে পৌছাননি। এক হপ্তা আগে রুম রিজার্ভ করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিন দিন পর অর্থাৎ শুক্রবারদিন ফোন করে মিস জেসমিন রিজার্ভেশন বাতিল করে দেন।'

'এখন সে কোথায় তাহলে?'

'কেউ জানে না। আজ দুপুরে ফোনে কথা বলেছি আমি তার রুম-মেট মিস রেখার সাথে, একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওরা থাকে বছর খানেক থেকে এক সাথে। এই মিস রেখাই তথ্যগুলো দেয় আমাকে। সে তো জানে মিস জেসমিন সোমবার থেকে ছুটি নিয়েছে, ছুটি নিয়ে চলে গেছে কক্সবাজারে। রিজার্ভেশন বাতিল করার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। জানলে অবশ্যই বলত আমাকে।'

গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠেছে শহীদের মুখ। বলল, 'মিস জেসমিন—তার সন্ধান চাই আমরা, রাসেল। খুঁজে বের করো তাকে। জানার চেষ্টা করো কেন সে তার রুম-মেটকে না জানিয়ে হোটেলের রিজার্ভেশন বাতিল করেছে।'

রিসিভার রেখে দিল শহীদ।

কামাল বলে উঠল, 'রহস্য দানা বাঁধছে…'

শহীদ বাধা দিয়ে বলল, 'না। রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।'

ছয়

পরদিন দুপুরে ডাইনিংরুমে খেতে দিয়ে মহুয়া শহীদকে বলল, 'জানো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, দেলওয়ার হোসেন ভদ্রলোক তোমাকে উপহার পাঠিয়েছেন।'

'উপহার?'

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ। দশটা বিদেশী মদের বড় বড় বোতল। হুইস্কি আর ব্র্যাণ্ডি। ছোট্ট একটা চিরকুটও আছে সাথে।'

শহীদ অবাক হলো, 'উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন মদ? ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। চিরকুটটা কোথায়?'

'ড্রয়িংরুমে টেবিল ক্লথের নিচে রেখে দিয়েছি।'

খাওয়া শেষ হতে ড্রয়িংরুমে এসে বসল শহীদ। চিরকুটটা বের করল যথাস্থান থেকে। দেলওয়ার হোসেনের হস্তাক্ষর, ছোট ছোট, পরিষ্কার। বেশ কয়েকটা লাইন লিখেছেন তিনি।

শ্রদ্ধেয় শহীদ সাহেব,

সালাম নেবেন। আপনার উপকার আমি আজীবন স্মরণ রাখব। আপনার ঋণ আমি কোনভাবেই পরিশোধ করতে পারব না। বিদেশী জিনিসগুলো পাঠালাম, গ্রহণ করলে বাধিত হব। ওই জিনিসের ইমপোর্টার আমি, লাইসেন্স আছে বলে পাই। কিনে পাঠিয়েছি ভেবে অন্য কিছু মনে করবেন—তাই কথাটা উল্লেখ করলাম।

ঢাকায় এসে একটা শিক্ষা পেয়েছি। কথা দিচ্ছি স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করার চেষ্টা আর করব না। আন্তরিক ধন্যবাদ নেবেন।

ইতি, আপনার গুণমুগ্ধ,
দেলওয়ার হোসেন।

মহুয়া ড্রয়িংরুমে ঢুকতে শহীদ জানতে চাইল, 'কোথায় সেগুলো?'

'কিচেনরুমে রেখে দিয়েছি।'

শহীদ পাইপে অগ্নিসংযোগ করে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল ফোনের। ডায়াল করে বলল, 'কামাল, তোকে ক্যাপিটাল হোটেলের বেলবয় আবদুল হক এবং রিসেপশনিষ্ট ফারুক সাহেব সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেছিলাম। কি হলো?'

কামাল বলল, 'রিপোর্ট তৈরি করেছি। তোকে জানাবার প্রয়োজন মনে করিনি। ওদের দু'জনেরই রেকর্ড ভাল। সোমবার রাতে ওরা যে যার জায়গা মতই ছিল। তাছাড়া মিসেস শাহানা ইকবাল চৌধুরীর সাথে বেরিয়ে যাবার পর আর ফেরেনি ক্যাপিটালে বা ক্যাপিটালের আশে পাশে।'

শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন মিসেস শাহানার মামাতো ভাই বুলবুলকে গতকাল সকালেও থানায় আনিয়েছিলেন। একথা তুই আমাকে বলিসনি কেন?'

'বলিনি এই জন্যে যে জেরা করার পর তাকে আমার সামনেই ছেড়ে দেন। বুলবুল ছেলেটা নিরীহ টাইপের, সে কথা তো আগেই বলেছি আমি। ওর সম্পর্কেই রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম।'

শহীদ বলল, 'বুঝেছি! শোন্, তোর সাথে কথা আছে। আয় দেখি কিছুক্ষণের মধ্যে একবার।'

'কি কথা রে?'

শহীদ বলল, 'কী আশ্চর্য! আমাদের হাতে একটা মার্ডার কেস রয়েছে তা বুঝি ভুলে গেছিস? সল্‌ভ্ করতে হবে না?'

'শহীদ, তুই...'

কামালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শহীদ রিসিভার রেখে দিল ক্রেডলে। পরমুহূর্তে ক্রিং...ক্রিং...শব্দে বেজে উঠল ফোনের বেল। আবার রিসিভার তুলল

শহীদ, বলল, 'শহীদ খান স্পীকিং।'

'রাসেল বলছি, শহীদ ভাই। মিস রেখার সাথে আজ কথা বলেছি আমি। মিস জেসমিন মিনার্ভা হোটেলে নেই শুনে অবাক হলেও, চমকে উঠতে দেখিনি তাকে। মনে হলো, সে মনে মনে ধরে নিয়েছে মিস জেসমিন কক্সবাজারে যাবার নাম করে অন্য কোথাও ছুটি কাটাতে গেছে।'

'অন্য কোথাও মানে?'

রাসেল বলল, 'আমার ধারণা, ফেরদৌস সাহেবের সাথে, এই চট্টগ্রামেই ছুটি কাটাবার জন্যে রয়ে গেছে মিস জেসমিন। ফেরদৌস সাহেব এবং মিস জেসমিন হয়তো পরিকল্পনা করেছিল মিসেস শাহানা ঢাকায় চলে গেলে মিস জেসমিন ফেরদৌস সাহেবের বাড়িতে গোপনে থাকবে।'

শহীদ বলল, 'বুঝতে পেরেছি তোমার কথা। মি. ফেরদৌসের অফিসে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম। নিজের পরিচয় না দিয়ে আলাপও করেছি অনেকের সাথে। কর্মচারীদের ধারণা, মিস জেসমিনকে ইদানীং একেবারে মাথায় তুলে ফেলেছেন ফেরদৌস সাহেব। ফেরদৌস সাহেবের আর্থিক সংকট সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পেরেছি আমি। রীতিমত দেনায় ডুবে আছেন তিনি।'

'দেনায় ডোবা অবস্থায় প্রচুর টাকা দিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন ঢাকায় ফুর্তি করতে। মিলছে না।'

রাসেল বলল, 'হ্যাঁ, মিলছে না। কিন্তু আমি আবারও খোঁজ নিয়ে কনফার্ম হয়েছি যে ফেরদৌস সাহেব সোম এবং মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত চট্টগ্রাম ছেড়ে কোথাও যাননি।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে শহীদ বলল, 'ঠিক আছে, রাসেল। তোমার কাজ শেষ। এ ব্যাপারে আর দৌড়াদৌড়ি কোরো না।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মহুয়ার দিকে তাকাল শহীদ, বলল, 'মহুয়া, খানিকক্ষণের মধ্যে কামালকে আশা করছি আমি। ও এলে আমরা তিনজন একসাথে বসে আলোচনা করব।'

'কিসের আলোচনা…?'

'মিসেস শাহানার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা। রহস্যটার সমাধান বের করতে হবে না?'

মহুয়া বলল, 'তার মানে…?'

শহীদ বলল, 'তার মানে পরে শুনো। আগে তুমি কফির ব্যবস্থা করো।'

মহুয়া ড্রয়িংরুম ত্যাগ করল।

'কি রে, খুনীর পরিচয় জানতে পেরেছিস নাকি? তর সইল না…'

কামাল ঢুকল অপর দরজা দিয়ে ড্রয়িংরুমে। বসল শহীদের মুখোমুখি।

শহীদ মুচকি হাসল।

'হাসছিস যে?'

শহীদ বলল, 'আজ সকালে কুয়াশা ফোন করেছিল। বিকেলের দিকে আসবে

বলেছে।'

'বিকেল তো হয়েই গেছে।'

শহীদ বলল, 'যে কোন মুহূর্তে আশা করছি তাকে।'

কামাল অন্দর মহলে যাবার দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহুয়াদি কোথায়?'

কফি আনতে গেছে।

খানিকপর মহুয়া ঢুকল, পিছনে তোতলা লেবু। তার হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে কেটলি এবং কয়েকটা কাপ।

কামাল হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা শহীদ, কুয়াশাকে তুই ইকবাল চৌধুরীর অফিসে দেখেছিলি, না? কারণটা জানিস?'

শহীদ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'কিছুই জানি না আমি। জানাবার হলে কুয়াশা অবশ্যই জানাত। হয়তো ব্যাপারটা গোপনীয়···তবে আজ যখন আসবে বলেছে, এ ব্যাপারে হয়তো কিছু বলতেও পারে।'

মহুয়া কাপে কফি ঢালছে।

শহীদ মহুয়ার হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'এবার কাজের কথা শুরু করি। শুরু করা যাক—একেবারে প্রথম থেকে। ধরা যাক প্রথমে মি. মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌসকে। তিনি একজন ইনডেন্ট ব্যবসায়ী। প্রেম করে বিয়ে করেছেন চট্টগ্রামের মঞ্চাভিনেত্রী অসাধারণ সুন্দরী শাহানাকে। সুন্দরী শাহানাকে বিয়ে করেও তিনি সন্তুষ্ট নন, সেক্রেটারি মিস জেসমিনের সাথেও ইদানীং তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। মিস জেসমিন অসাধারণ সুন্দরী না হলেও চেহরাগত দিক থেকে মিসেস শাহানার সাথে তার আশ্চর্য মিল আছে। সে যাই হোক, মি. ফেরদৌস, তাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়া সত্ত্বেও, মিসেস শাহানাকে একা ঢাকায় পাঠালেন প্রায় জোর করে ছুটি কাটাবার জন্যে বা ফূর্তি করার সুযোগ দেয়ার জন্যে। সেই একই সময়ে মি. ফেরদৌসের সেক্রেটারি মিস জেসমিনও অফিস থেকে ছুটি নিল। এক নম্বর প্রশ্ন, মিসেস শাহানা কি জানতেন মিস জেসমিনের ছুটি নেবার ব্যাপারটা? জানলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? তিনি কি কিছু সন্দেহ করবেন?'

মহুয়া বলল, 'সম্ভবত মিসেস শাহানা ব্যাপারটা জানতেন না। জানলে···হ্যাঁ, সন্দেহ হওয়া অসম্ভব নয়।'

শহীদ কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'এবার মিসেস শাহানাকে ধরি। বিয়ের আগে বা পরে তিনি ছিলেন শান্ত, ভদ্র, নম্র, এবং চরিত্রবতী। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একা ঢাকায় পা দিয়েই তিনি উদ্ভট আচরণ করতে শুরু করলেন। আমূল পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর মধ্যে। তাঁর হাবভাব, কথাবার্তা দেখে যে কোন পুরুষ ভাবতে বাধ্য—ইচ্ছা করলেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। এক এক করে গুণতে থাকো। ইকবাল চৌধুরী, বুলবুল, রিসেপশনিস্ট ফারুক, পোর্টার আবদুল হক, বারটেণ্ডার সুকুমার, মি. দেলওয়ার হোসেন। ছয়জন। ঢাকায় আসার প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ছয়জন পুরুষকে মিসেস শাহানা একভাবে না একভাবে সঙ্গদানের বা অবৈধ ঘনিষ্ঠতার প্রস্তাব দিয়েছেন। দু'নম্বর প্রশ্ন হলো—এ কিভাবে

সম্ভব? মিসেস শাহানা রাতারাতি বদলে একেবারে অন্য রকম, সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের হয়ে উঠলেন কিভাবে? কেন?'

কেউ কোন মন্তব্য করল না।

শহীদই বলল, 'উত্তরটা কি? দুটো পসিবিলিটির কথা উল্লেখ করছি আমি। এক, হয় গত সোমবার বিকেলের ফ্লাইটে চট্টগ্রাম থেকে যিনি ঢাকায় আসেন তিনি মিসেস শাহানা নন। নয়তো, তিনি যদি মিসেস শাহানাই হন তাহলে ঢাকায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অভিনয় করতে শুরু করেন, নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লোকজনের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন—যদিও উদ্দেশ্যটা এই মুহূর্তে আমাদের জানা নেই।'

শহীদ বিরতি নিয়ে পাইপে টোবাকো ভরল।

কামাল বলল, 'কিন্তু আমরা জানি, তিনি স্বয়ং মিসেস শাহানাই। এক ডজন লোক তাঁর ছবি দেখে সনাক্ত করেছে তাঁকে। তাছাড়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের রেজাল্টও পজিটিভ।'

শহীদ বলল, 'আমরা সবাই জানি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিথ্যে বলে না। ঠিক, তিনি যে মিসেস শাহানা এ সত্য অখণ্ডনীয় বলে ধরে নিতে হবে। তবে এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব আমরা। যা বলছিলাম খানিক আগে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, বিশেষ কোন কারণে মিসেস শাহানা লোকজনের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন—কেন? ইতিহাস বলছে, তিনি সে-ধরনের মেয়ে নন। তাহলে?'

মহুয়া এবং কামাল চুপ করে রইল।

শহীদ বলল, 'রহস্যের জটিলতা এখানেই। দেখা যাক এই জটিলতাকে সরল করা যায় কিনা।'

মহুয়া হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'দাঁড়াও, আমি বলছি। মিসেস শাহানার অমন অদ্ভুত আচরণের কারণ হয়তো এই যে, তিনি চেয়েছিলেন কয়েকদিন হোটেলে না থেকে অন্য কোথাও থাকবেন। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে অমন কৃত্রিম আচরণ করছিলেন। যাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ পরে তাঁর স্যুইটে তাঁকে অনুপস্থিত দেখে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর প্রকৃতির কথা। জানতে পেরে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন এই ভেবে যে ভদ্রমহিলা অস্থির প্রকৃতির, কোথাও হয়তো ফুর্তি করছেন।'

'ঘটেছিলও আসলে তাই। হোটেল কর্তৃপক্ষ সে-কথা ভেবেই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখন প্রশ্ন হলো,—মিসেস শাহানা হোটেল ছেড়ে অন্য কোথাও থাকার কথা কেন ভেবেছিলেন? সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তর দিল না এবার মহুয়া। কামালও নিঃশব্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

'এবার অন্য একজনকে নিয়ে আলোচনা করব আমরা। মিসেস শাহানার ব্যাপারটা আপাতত থাক। মহুয়া, তুমি দৈব-দুর্ঘটনা মানো?'

'মাঝে মাঝে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটেই তো।'

শহীদ বলল, 'আমি মানি না। অন্তত হত্যাকাণ্ডে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটলে আমি মেনে

নিতে পারি না। মিস জেসমিন—এবার তাঁর কথায় আসা যাক। চট্টগ্রাম থেকে সোমবার বিকেলে মিস জেসমিন নিখোঁজ হয়ে যান, সেই একই দিনে প্রায় একই সময়ে মিসেস শাহানা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। এটা কি দৈব-দুর্ঘটনা? মিস জেসমিনের যাবার কথা কক্সবাজারে। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে তিনি শুক্রবারে রিজার্ভেশন বাতিল করে দেন। কক্সবাজারে তিনি যাননি। চট্টগ্রামেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় তাহলে তিনি এখন?'

কামাল জানতে চাইল, 'রাসেল বলেছে ওদের দু'জনের চেহারার আশ্চর্য মিল আছে—কতটা মিল তা বলেছে?...কিন্তু...নাহ্। তা সম্ভব নয়, শহীদ। ফটোটা সবাই দেখেছে এবং আইডেনটিফাই করেছে। একেবারে হুবহু মিল থাকলে হয়তো...কিন্তু তা যদি হত তাহলে রাসেল সে কথা উল্লেখ করতে ভুলত না।'

শহীদ বলল, 'তা ঠিক। দু'জন একই রকম দেখতে হতে পারে না।'

মহুয়া চিন্তিতভাবে বলল, 'ফটো দেখেও এতগুলো লোক ভুল করবে...না, তা হতে পারে না। আমরা ধরে নিতে বাধ্য যে নিহত ভদ্রমহিলা মিসেস শাহানাই।'

'এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। লাশটা কার? এ রহস্যের সমাধান করতে হলে একটা প্রশ্নের সমাধান চাই সবচেয়ে আগে। লাশের মুখটা ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে কেন? গুলি করে খুন করা হয়েছে—তারপর লাশের মুখ বিকৃত করার দরকার পড়ল কেন? আজকাল ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারটা সবাই জানে। কেউ যদি লাশের প্রকৃত পরিচয় জানতে দিতে না চায় তাহলে শুধু মুখের চেহারা বিকৃত করবে কেন সে? তাকে তো লাশের মুখের চেহারা বিকৃত করার সাথে সাথে হাতের আঙুলের চামড়া তুলে নিতে হবে কিংবা কব্জি থেকে হাত দুটো কেটে ফেলে দিতে হবে। তবেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।'

কামাল বলল, 'ধরা যাক, ফেরদৌস সাহেবই খুনী। তিনি হয়তো ভাবেননি পুলিশ তাঁর চট্টগ্রামের বাড়িতে মিসেস শাহানার হাতের ছাপ খোঁজার জন্যে যাবে।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু ক্যাপিটাল হোটেলের স্যুইটে মিসেস শাহানার ওঠার কথা। তাঁর স্যুইটেও তো হাতের ছাপ থাকতে পারে? না—আমি ফেরদৌস সাহেবকে অতটা বোকা মনে করি না।'

কামাল বলল, 'ক্যাপিটাল হোটেলের স্যুইটে আমার ক্যামেরাম্যান মিসেস শাহানার হাতের ছাপ পায়নি, তোকে তো আগেই বলেছি। তবে তোর সাথে একটা ব্যাপারে আমি একমত, ফেরদৌস সাহেব অত বোকা নন।'

শহীদ ঘনঘন পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গল গল করে। বলল, 'এবার মোটিভের ব্যাপারে আলোচনা করি। মি. ফেরদৌসের মোটিভ কি হতে পারে? তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তিনি বীমার এক লক্ষ টাকা পাবেন। আর্থিক অবস্থা ইদানীং তাঁর খুবই খারাপ, তার ওপর অন্য এক যুবতীর সাথে দহরম-মহরমও চলছিল। কামাল, আমার ধারণা, মি. ফেরদৌসই তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন।'

মহুয়া তীব্রকণ্ঠে জানতে চাইল, 'কিভাবে?'

শহীদ মুচকি হেসে বলল, 'উত্তেজিত হয়ো না, মহুয়া। আমরা আলোচনা করছি মাত্র। আচ্ছা, ধরো, গত সোমবার বিকেলের ফ্লাইটে মিসেস শাহানা নয়, মিস জেসমিন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসে। মিসেস শাহানা তাহলে কোথায় ছিলেন,

কি করছিলেন? ধরা যাক, তিনি কিছুই করছিলেন না। কারণ তখন তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর লাশটা চট্টগ্রামে তাঁদের বাড়িতেই পড়ে রয়েছে। মিস জেসমিন মিসেস শাহানার টিকেট, সুটকেস, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে ঢাকায় এল। এমন কি, মিসেস শাহানার আঙুলের হীরে বসানো আঙটিটাও তাঁর হাতে ছিল। মিস জেসমিনকে প্লেনে তুলে দিয়ে মি. ফেরদৌস বাড়িতে ফিরে গেলেন। স্ত্রীর লাশটা তিনি একটা কালো ট্রাঙ্কে ভরলেন, তারপর ট্রাঙ্কটা তুললেন নিজের গাড়িতে।'

কামাল চোখ বড় বড় করে বলল, 'শহীদ, তুই…'

হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিল শহীদ কামালকে, বলল, 'থাম। আমাকে শেষ করতে দে। মিস জেসমিনের অ্যালিবাই তৈরি করাই ছিল। সবাই জানে তিনি কক্সবাজারে গেছেন। মি. ফেরদৌসও সোমবার রাত থেকে জনসমক্ষে নিজেকে হাজির করতে ভুল করলেন না, যাতে লোকে পরে তাঁর চট্টগ্রামে উপস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে। তারপর স্ত্রীকে হত্যা করার চারদিন পর, কৌশলে ব্যবসায়িক কারণে ফেনীতে যাবার অজুহাত সৃষ্টি করে রওনা হলেন তিনি গাড়ি নিয়ে। এই অজুহাত তৈরি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি। ব্যবসায়ী মানুষ তিনি, পার্টিদের সাথে হর-হামেশা দেখা করতে যান, সুতরাং এটাকে কেউ সন্দেহের চোখে দেখতে পারে না। অন্তত তাই তিনি ভেবেছিলেন। ফেনী থেকে ঢাকা। স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাওয়াটা বেআইনী নয়, খুবই স্বাভাবিক সেটা। সুতরাং ফেনী থেকে চট্টগ্রামে ফিরে না গিয়ে তিনি সারারাত গাড়ি চালিয়ে পৌঁছুলেন ঢাকায়।'

কামাল বলল, 'কিন্তু…'

শহীদ আবার বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল তাকে, বলল, 'জানি কি বলতে চাইছিস তুই। কিন্তু আমার চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই আমি। মিস জেসমিন, মিসেস শাহানা নয়, ক্যাপিটাল হোটেলে উঠেছিল—এটা আমরা আলোচনার খাতিরে ধরে নিয়েছি, তাই না? মিস জেসমিন, ইকবাল, বুলবুল, ফারুক সাহেব, আবদুল হক, সুকুমার সেনের সাথে যে ধরনের আচরণ করে তাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ তার স্যুইটে তাকে উপস্থিত না দেখে বিশেষ কিছু মনে করেনি। তারা ধরে নিয়েছিল, পুরুষ ঘেঁষা মেয়ে, কারও না কারও সাথে গিয়ে ফুর্তি করছে। টনক নড়ল সকলের শনিবার দিন ভোরে। মি. ফেরদৌস স্বয়ং হাজির হলেন ক্যাপিটালে। সেদিনই সন্ধ্যার দিকে পাওয়া গেল গাড়িটা। গাড়িটা পাবার আগেই সবাই মনে মনে ধরে নিয়েছিল লাশটাও পাওয়া যাবে। সুতরাং লাশ যখন পাওয়া গেল—কেউ তেমন আশ্চর্য হলো না। যে ধরনের মেয়ে তাতে গুণ্ডার হাতে না পড়াটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার, সবাই ভাবল।'

মহুয়া বলল, 'ফেরদৌস সাহেব তাঁর গাড়িতে করে নিজের স্ত্রীর লাশ ঢাকায় আনেন, তুমি বলছ। লাশটা ক্যাপিটাল হোটেলে এল কিভাবে? মিস জেসমিনই বা কোথায়? তাঁর গাড়িতেই বা লাশটা চালান দিলেন কিভাবে ফেরদৌস সাহেব?'

শহীদ বলল, 'এসব প্রশ্নের উত্তর তো জলবৎ তরলং। মি. ফেরদৌসের সাথে মিস জেসমিনের কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল আগেই। মি. ফেরদৌস জানতেন ঢাকার কোন্ হোটেলে আত্মগোপন করে থাকবে মিস জেসমিন। ঢাকায় তিনি পৌঁছন ভোরে নয়, আরও কয়েক ঘণ্টা আগে। সরাসরি মিস জেসমিনের হোটেলে ওঠেন

তিনি। নিজের গাড়ি থেকে কালো ট্রাঙ্কটা নামিয়ে নিয়ে তোলেন, মিস জেসমিনের লাল টয়োটায়। লাল টয়োটা নিয়ে তিনি পৌঁছন ক্যাপিটাল হোটেলের গ্যারেজে। গাড়িটা রেখে চুপচাপ চলে যান আবার মিস জেসমিনের হোটেলে। তারপর ভোর বেলা তিনি ক্যাপিট্যালে আবার আসেন। অন্তত একটা রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে—তাই না? লাশের মুখটা ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে কেন—বুঝতে পারছিস এখন?'

কামাল গম্ভীর মুখে বলল, 'হুঁ।'

শহীদ বলল, 'দেখতেই পাচ্ছিস খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সবকিছু। মনে করে দেখ্ ট্রাঙ্কের ভিতর এক ফোঁটা রক্ত পাওয়া যায়নি। হোটেলের কর্মচারীরা লাশ দেখে ভুল করেছে তার কারণও আছে। তারা মিসেস শাহানাকে চিনত না। মিস জেসমিনকেই তারা মিসেস শাহানা হিসেবে জানত। ওদের দু'জনার স্বাস্থ্য, বর্ণ, উচ্চতা, চুলের স্টাইল, পোশাক—একই রকম দেখতে ছিল। লাশের মুখ দেখে চিনবার যখন উপায় নেই তখন ওই সব মিলিয়ে দেখে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো, গত সোমবার সন্ধ্যায় তাদের হোটেলে যে ভদ্রমহিলা উঠেছিলেন এ লাশ তারই।'

'কিন্তু ফটোটা? ফটোটাও সবাই দেখেছে। ফটোর মুখটা তো আর ক্ষতবিক্ষত ছিল না? মিস জেসমিন যদি হোটেলে উঠে থাকে, ফটো দেখে তারা পার্থক্যটা ধরতে পারল না? এ অসম্ভব!'

মহুয়া উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'ঠিক্! ইস্—! আমি তো শহীদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম আর একটু হলে!'

শহীদ বলল, 'আর একটুও পূরণ করে দিচ্ছি। ফটোটা, না? ব্যাখ্যা করছি। ব্যাখ্যা শুনলে বুঝবে যে আমার বক্তব্যই আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মি. ফেরদৌস দুটো ফটো দেখান আমাদের সকলকে। একটা তিনি মি. সিম্পসনকে দেন, অপরটি আমাকে। দুটো ফটোই একজনের, দু'রকম ভঙ্গিতে তোলা। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, ফটো দুটো মিসেস শাহানার। কিন্তু আমি যদি বলি তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন? যদি বলি ফটো দুটো মিসেস শাহানার নয়, মিস জেসমিনের?'

হতবাক হয়ে চেয়ে রইল কামাল এবং মহুয়া শহীদের মুখের দিকে।

মহুয়া কিন্তু ছাড়তে রাজি নয়, সে জোর গলায় বলল, 'আর লাল শিফনের ব্যাপারটা?'

শহীদ বলল, 'লাল শিফনের ব্যাপারটাও আমার যুক্তিকে বলিষ্ঠ করছে। এ থেকে বোঝা যায়, মি. ফেরদৌস রীতিমত গবেষণা করে একটা হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করেন। লাল শিফন তিনি চট্টগ্রাম থেকে স্ত্রীর জন্যও কিনেছিলেন, মিস জেসমিনের জন্যও আর একটা কিনেছিলেন। হয়তো একই দোকান থেকে কেনা হয় দুটো শাড়ি।'

কামাল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল, 'নাহ্ আর কোন সন্দেহ নেই! তোর ব্যাখ্যা মেনে নিচ্ছি আমি, শহীদ।'

মহুয়াও অস্ফুটে বলল, 'তাই তো, কোথাও কোন ফাঁক দেখতে পাচ্ছি না…!'

কামাল অস্থিরভাবে বলে উঠল, 'আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে ফেরদৌস সাহেব

চট্টগ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। আজ সকালে তাঁর স্ত্রীকে কবরস্থ করা হয়েছে। মি. সিম্পসনকে এখুনি ফোন করলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। তিনি এয়ারপোর্ট থেকে ফেরদৌস সাহেবকে গ্রেফতার করতে পারবেন।'

'কিন্তু গ্রেফতার করবেন কিসের ওপর ভিত্তি করে?' প্রশ্ন করল শহীদ।

কামাল বলল, 'তার মানে? তুই-ই তো এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করে বোঝালি যে ফেরদৌস সাহেবই খুনী!'

শহীদ হাসল নিঃশব্দে। বলল, 'ওটা তো থিওরি।'

কামাল বলে উঠল, 'তারমানে…'

শহীদ বলল, 'তার মানে? তার মানে, নিজের থিওরিতে নিজেই আমি সন্তুষ্ট নই…।'

'কিসের থিওরি, শহীদ?' একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই, সকলেই বুকের ভিতর একটা আনন্দের ধাক্কা অনুভব করল।

কেউ টের পায়নি কখন যেন নিঃশব্দ পায়ে কুয়াশা ড্রয়িংরুমের ভিতর এসে হাজির হয়েছে। কালো আলখেল্লা পরিহিত কুয়াশা সহাস্যে আবার বলে উঠল, 'হত্যারহস্যের সমাধান হলো, শহীদ?'

'বসো, কুয়াশা,' অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল শহীদ।

মহুয়া বলল, 'দাদা, এ সম্পর্কে জানো নাকি তুমি?'

কুয়াশা আসন গ্রহণ করে বলল, 'কিছু কিছু জানি। রবিন কোথায় রে, মহুয়া?'

মহুয়া বলল, 'ঘুমাচ্ছে লীনার কাছে।'

শহীদ বলল, 'থিওরি দিয়ে সমাধান একটা বের করেছি। কিন্তু নিজেই আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। ওরা দেখতে না পেলেও, একটা ফাঁক আমি দেখতে পাচ্ছি।'

কুয়াশা বলল, 'কেন, কেসটা তেমন কঠিন তো কিছু নয়। এর চেয়ে হাজার গুণ কঠিন কেস তুমি সমাধান করেছ। আচ্ছা, শোনাও দেখি তোমার থিওরিটা।'

ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল শহীদ।

শহীদকে মাঝ পথে বাধা দিল কুয়াশা। বলল, 'তোমার থিওরি অচল, শহীদ! তুমি বলতে চাইছ—মিসেস শাহানা নয়, মিস জেসমিন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিল গত সোমবার বিকেলে। কিন্তু তা সত্যি হতে পারে না। কারণ আর কেউ না চিনলেও, ইকবাল চৌধুরী শাহানাকে চিনত আগে থেকেই। এয়ারপোর্টে মিস জেসমিনকে নয়, মিসেস শাহানাকেই দেখেছে সে।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, আমার থিওরি ওখানেই মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে। কামাল এবং মহুয়া ব্যাপারটা ধরতে না পারলেও আমি ঠিকই ধরতে পেরেছিলাম। তাই বলছিলাম, আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না।'

মহুয়া জানতে চাইল, 'দাদা, তুমিই তাহলে বলো, খুনী কে?'

কুয়াশা হাসল, 'না রে, তা বলা যাবে না। তবে তোরা সবাই যদি আগামীকাল আমার সাথে চট্টগ্রামে যেতে পারিস, আমি খুনীকে দেখিয়ে দেব। ব্যাখ্যা করে বলেও দিতে পারব খুনী কে, কিভাবে সে খুন করার পরিকল্পনা করে। তবে আরও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে আমাকে।'

শহীদ বলল, 'আচ্ছা, ইকবাল চৌধুরীর অফিসে কেন গিয়েছিলে তুমি?'

কুয়াশার মুখে রহস্যময় হাসি ফুটল। বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তরও তোমাদেরকে আমি চট্টগ্রামে গিয়ে দেব। যাবে তোমরা?'

মহুয়া সোৎসাহে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই যাব।'

কামাল সমর্থন করল তাকে, 'যাব না মানে!'

শহীদ কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইকবাল চৌধুরী কি ঢাকায় এখন?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আগামীকাল তাকে আমরা চট্টগ্রামেই পাব…।'

মহুয়া হঠাৎ জানতে চাইল, 'আচ্ছা দাদা, মি. ডি. কস্টাকে তো এই কেসে নাক গলাতে দেখলাম না? তিনি তো চুপচাপ দূরে থাকার লোক নন?'

কুয়াশা রহস্য করে বলল, 'এই কেসের সাথেই তিনি আছেন। আগামীকাল তাকেও আমরা চট্টগ্রামে দেখব।'

এরপর অন্য খাতে বইতে শুরু করল ওদের আলোচনা।

সাত

পরদিন ঘুম থেকে উঠল শহীদ বেলা এগারোটায়। প্রায় সারা রাত জেগেছিল ও। জেগে জেগে চিন্তাভাবনা করেছে, কাগজে কি সব লিখেছে।

স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করল ও। ড্রয়িংরুমে এসে বসে মহুয়াকে ডেকে পাঠাল লেবুকে দিয়ে।

'ডাকছ কেন গো?' মহুয়া প্রবেশ করল ত্রস্ত পায়ে। ঘর-সংসার গোছ-গাছ করে নিচ্ছিল সে। চট্টগ্রামে যাবে আজ সবাই, দু'চার দিন সেখানে থাকতে হতে পারে। তার ইচ্ছা, এই সুযোগে কক্সবাজারেও একবার ঘুরে আসা।

একটা এনভেলাপ পকেট থেকে বের করে মহুয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল শহীদ। রহস্যময় হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে। বলল, 'এটা তোমার কাছে রাখো। কুয়াশা মিসেস শাহানা হত্যাকাণ্ডের সমাধান বের করার পর এটা খুলবে তুমি কথা দাও, তার আগে খুলবে না।'

'কথা দিলাম। কিন্তু…'

'এনভেলাপে কি আছে রে, শহীদ!' কামাল দোর-গোড়া থেকে জানতে চাইল।

শহীদ বলল, 'আয়। এনভেলাপে কি আছে? মিসেস শাহানা হত্যাকাণ্ডের সমাধান।'

'তার মানে কুয়াশার আগেই তুই সমাধান বের করে ফেলেছিস?'

শহীদ বলল, 'কুয়াশার আগে বের করেছি তা বলা ঠিক হবে না। কুয়াশা রহস্যটা দেখতে পায় আগে, আমি দেখতে পাই পরে, গত রাতে ভাবনা চিন্তা করার পর। অবশ্য কয়েকটা তথ্য দরকার এখনও। কিন্তু তথ্যগুলো জানা না থাকলেও অনুমান করতে পেরেছি আমি।'

'সমাধানটা কাগজে লিখে এনভেলাপে ভরে রেখেছিস—কারণ?'

শহীদ বলল, 'থিওরি আওড়িয়ে নিজের কাছেই বোকা বনেছি একবার, দ্বিতীয়বার আর বোকা সাব্যস্ত হতে চাই না, তাই।'

মহুয়া জানতে চাইল, 'তোমার এবং দাদার ধারণা দুটো কি দু'রকম?'

শহীদ বলল, 'সম্ভবত না। কুয়াশার ধারণা কি তা আমি অনুমান করতে পারি। আমার অনুমান মিথ্যে না হলে—বলতে পারি, আমাদের দু'জনেরই ধারণা এক!'

'অর্থাৎ কুয়াশা যাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছে, তুইও তাকে সন্দেহ করছিস?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। তবে সন্দেহ করছি না, বিশ্বাস করছি। দৃঢ়ভাবে।'

কামাল বলল, 'যদি তোর বিশ্বাস এবং কুয়াশার বিশ্বাস না মেলে?'

শহীদ বলল, 'মিলতে বাধ্য। একবার ভুল করেছি, দ্বিতীয়বার ভুল হতে পারে না আমার। কুয়াশাও ভুল করার বান্দা নয়।'

মহুয়া বলল, 'বড্ড কৌতূহল হচ্ছে আমার! বলোই না ছাই, খুনী কে?'

শহীদ মুচকি হাসল। বলল, 'ধৈর্য ধরো। বিকেলের মধ্যেই জানতে পারবে। কুয়াশা ফোন করে জানিয়েছে, ক'টায় ফ্লাইট?'

'জানিয়েছে। আড়াইটায়। দুত্তোরী, হেঁয়ালি করছ কেন? একটা প্রশ্নের অন্তত উত্তর দাও—খুনী কি ফেরদৌস সাহেব?'

শহীদ যেন মহুয়ার কথা শুনতেই পায়নি, কামালের দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল, 'তুই মহুয়া আর লীনাকে নিয়ে কক্সবাজারে যেতে পারবি চট্টগ্রাম থেকে? ঢাকায় আমার কাজ আছে, আমি আগামীকালই ফিরে আসতে চাই।'

কামাল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'চমৎকার! অনেকদিন বঙ্গোপসাগর দেখিনি—দারুণ হবে, কি বলো মহুয়াদি?'

মহুয়া বলে উঠল, 'কথা দিয়ে ফেলেছি—এনভেলাপটা খুলে রহস্যটা জানতেও পারছি না। কি যে অশান্তি লাগছে···।'

শহীদ এবং কামাল দু'জনেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে রাসেল এবং ইন্সপেক্টর সাখাওয়াত হোসেন অভ্যর্থনা জানাল গোটা দলটাকে।

কুয়াশা ফোন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গতকালই দিয়েছিল রাসেলকে। নির্দেশ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে সে।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢুকে মিনিট কয়েকের জন্য লাউঞ্জে বসল ওরা। কুয়াশা, স্বভাবতই ছদ্মবেশে রয়েছে। রাসেল ইন্সপেক্টর সাখাওয়াতের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলল, 'সাখাওয়াত পুলিশ ইন্সপেক্টর হলেও, আমার কাছে সেটা ওর বড় পরিচয় নয়, ও আমার বন্ধু।'

কুয়াশা, শহীদ এবং কামালের সাথে করমর্দন করল সাখাওয়াত। কুয়াশার সাথে করমর্দন করার সময় হাতটা কাঁপল তার। মুগ্ধ, বিহ্বল দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। সবাই বুঝতে পারল রাসেল তার বন্ধুকে কুয়াশার পরিচয় আগেভাগেই দিয়ে রেখেছে।

কুয়াশা জানতে চাইল, 'ক্যামেরা এনেছ তো!'

রাসেল বলল, 'এনেছি। জীপ ছাড়াও একটা প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা করেছি আমি।'

কুয়াশা বলল, 'সাখাওয়াত, তুমিই তো মি. ফেরদৌসের বাড়িতে মিসেস শাহানার হাতের ছাপ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলে!'

'জ্বী—জ্বী-হ্যাঁ!'

কুয়াশা বলল, 'ঢাকা থেকে যে হাতের ছাপ মি. সিম্পসন তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তার সাথে মি. ফেরদৌসের বাড়িতে পাওয়া হাতের ছাপের হুবহু মিল ছিল, তাই না?'

'জ্বী।'

কুয়াশা শহীদের দিকে তাকাল। দেখল শহীদ মুচকি মুচকি হাসছে। সাখাওয়াতের দিকে তাকিয়ে এবার শহীদ বলল, 'সাখাওয়াত সাহেব, এখন আপনি আমাদের সাথে যাবেন মিস জেসমিনের বাড়িতে। ওখান থেকে মিস জেসমিনের হাতের ছাপ সংগ্রহ করতে হবে। রাসেল, মিস জেসমিনের বান্ধবী মিস রেখাকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

রিস্টওয়াচ দেখল রাসেল। বলল, 'দুটোর সময় অফিস ছুটি—নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া যাবে।'

শহীদ তাকাল এবার কুয়াশার দিকে।

এবার দেখা গেল মুচকি হাসছে কুয়াশা।

কুয়াশাই বলল এবার, 'চলো তাহলে।'

উঠল সবাই।

জীপে উঠল সাখাওয়াত, শহীদ, কুয়াশা এবং রাসেল। কালো মরিসে উঠল মহুয়া, রবিনকে কোলে নিয়ে লীনা এবং কামাল।

দুটো গাড়ি ছুটে চলল।

দরজা খুলে দিয়ে ইন্সপেক্টর সাখাওয়াত, মহুয়া, শহীদ এবং কুয়াশাকে দেখে মিস রেখা একটু ঘাবড়ে গেল। 'কাকে চান আপনারা?'

সাখাওয়াত বলল, 'আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর। ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান।'

কুয়াশা এবং মহুয়াকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি, আর ইনি মি. শহীদ খানের বন্ধু। আমরা মিস জেসমিনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করতে এসেছি।'

শহীদ বলল, 'এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটা প্রশ্নও করতে চাই আপনাকে।'

একমুহূর্ত চিন্তা করে মিস রেখা বলল, 'জেসমিনকে পেয়েছেন আপনরা?'

শহীদ বলল, 'ঠিক পেয়েছি বলা যায় না। কিছুটা বাকি রয়েছে এখনও।'

'আসুন, ভিতরে এসে বসুন।'

ভিতরে ঢুকল ওরা চারজন। কামাল, রাসেল এবং লীনা রবিনকে নিয়ে গাড়িতে রয়ে গেছে। একসাথে বেশি লোককে দেখলে মিস রেখা ভয় পাবে মনে করে শহীদ এদেরকে গাড়িতে রেখে এসেছে।

কুয়াশার পরিচয় দেয়া হয়েছে শহীদের বন্ধু হিসেবে। মিস রেখার উদ্দেশ্যে সে বলল, 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনারও দরকার আমাদের।'

'তা কেন দরকার? আমি যতদূর জানি, অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবার আইন নেই।'

কুয়াশা হাসিমুখে বলল, 'আমরা মিস জেসমিনের ফিঙ্গারপ্রিন্টটাই নিতে এসেছি। কিন্তু আপনাদের দু'জনেরই ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে এই বাড়িতে। কোনটা কার চিনব কিভাবে? আপনারটার সাথে মিস জেসমিনেরটা আলাদা করার জন্যেই…।'

মিস রেখা বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে।'

ইতিমধ্যে ক্যামেরা নিয়ে পাশের রুমে কাজ শুরু করে দিয়েছে ইন্সপেক্টর সাখাওয়াত। খানিক পর ফিরে এল সে। মিস রেখার সামনে একটা কালির প্যাড ধরে বলল, 'আপনি এই প্যাডে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিন, তারপর টেবিলের ওই কাগজে একটা ছাপ রাখুন—তাহলেই হবে।'

নির্দেশ পালন করল মিস রেখা। শঙ্কিতকণ্ঠে আবার একবার প্রশ্ন করল সে, 'জেসমিন…সে কি সত্যিই কক্সবাজারে যায়নি?'

কুয়াশা বলল, 'না যাননি। আচ্ছা, বলুন তো, তিনি কি কক্সবাজারে না গিয়ে ঢাকায় যাবেন—কথায় কথায় এই রকম আভাস দিয়েছিলেন আপনাকে?'

'কই, না তো। জেসমিনকে ঢাকায় দেখা গেছে নাকি?'

কুয়াশা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উঠল, বলল, 'ধন্যবাদ, মিস রেখা।'

শহীদ জানতে চাইল, 'মিস জেসমিনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে, সাখাওয়াত বলল, 'প্রচুর।'

মিস রেখা ওদের গমনপথের দিকে বেশ একটু অবাক হয়েই যেন চেয়ে রইল।

প্রায় একঘন্টা পরের ঘটনা।

চট্টগ্রাম শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা। পীচ দিয়ে মোড়া প্রশস্ত রাস্তার দুইপাশে ছবির মত সুন্দর সুন্দর বাড়ি। কোন কোন বাড়ির সামনে ছোট ছোট সুন্দর বাগান। হলুদ, লাল এবং বেগুনি ফুল ফুটে রয়েছে। রঙিন প্রজাপতি উড়ছে কয়েকটা।

পাড়াটা নিস্তব্ধ। কোথাও শোরগোল নেই, চেঁচামেচি নেই। পাড়ার সর্বদক্ষিণের বাড়িটা একতলা। সবেচেয়ে নিস্তব্ধ ওই বাড়িটাই।

বাড়িটা মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌসের। বাড়ির গেটের সামনে দুটো গাড়ি থামল। একটা জীপ, অপরটা প্রাইভেট কার।

গাড়ি দুটো থেকে নামল কুয়াশা, শহীদ, কামাল, রাসেল, সাখাওয়াত এবং মহুয়া ও লীনা।

'ফেরদৌস সাহেবের ডাটসনটা দেখা যাচ্ছে ওই যে,' রাসেল বাড়ির গেট খুলতে খুলতে গাড়ি বারান্দার দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলে উঠল।

পাশ থেকে শহীদ জানতে চাইল, 'তুমি জানলে কিভাবে ওটা মি. ফেরদৌসের গাড়ি? তাকে বা তার গাড়িকে তুমি তো দেখোনি!'

রাসেল হাসতে হাসতে বলল, 'না দেখলে কি হবে, ভদ্রলোক কি রঙের মোজা পরেন তাও আমি বলে দিতে পারি। তদন্ত করতে গিয়ে কিছু জানতে বাকি রাখিনি।'

মহুয়া হঠাৎ আঁতকে উঠল, 'বাড়ির ছাদে···কাকে দেখলাম আমি? মিস্টার···'

কুয়াশা মহুয়ার দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই চুপ করে গেল মহুয়া।

কিন্তু কামাল ছাড়ল না। জানতে চাইল, 'কাকে দেখলে তুমি আবার বাড়ির ছাদে?'

মহুয়া জোর করে হাসল, বলল, 'কি জানি, বোধহয় ভুল দেখেছি।'

গেট পেরিয়ে এগোচ্ছে ওরা। গাড়ি বারান্দার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা ধাপ টপকে উঁচু বারান্দায় উঠল সবাই। কুয়াশা সবাইকে সাবধান করে দেয়ায় কেউ কথা বলছে না আর, কেউ কোন শব্দ করছে না।

গোটা দলটা একটা বন্ধ দরজার দুইপাশে ছড়িয়ে পড়ল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু কুয়াশা আর শহীদ।

শহীদই নক করল দরজার গায়ে।

'কে!' বিস্মিত কণ্ঠ ভেসে এল।

শহীদ কথা না বলে দরজার গায়ে আবার টোকা দিল। কিন্তু দরজা খুলল না সাথে সাথে। কেউ আর সাড়াও দিল না।

শহীদ ফিসফিস করে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করবে না তো?'

আবার নক করল শহীদ।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। মোফাজ্জল হায়দার ফেরদৌসকে দেখা গেল দরজার সামনে। গায়ে বোতাম খোলা শার্ট, পরনে লুঙ্গি, পায়ে স্যাণ্ডেল। হাতে এক গ্লাস পানি···বা মদ।

'মি. শহীদ আপনি! আপনি চট্টগ্রামে কেন?' শহীদকে দেখে অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে জানতে চাইলেন মোফাজ্জল সাহেব।

শহীদ বলল, 'আপনি আপনার স্ত্রীকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে, মি. ফেরদৌস।'

মোফাজ্জল সাহেবের মুখের চেহারায় আরও বিমূঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল, 'হ্যাঁ—দিয়েছিলাম দায়িত্ব—কিন্তু তাকে তো পাওয়া গেছে। আমি আপনার কাজে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছি।'

শহীদ বাঁকা সুরে বলল, 'কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হইনি। আমি আপনার স্ত্রীকে এখনও খুঁজছি।'

'আপনি···এখনও···কিন্তু···আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মি. শহীদ···মানে, কী আশ্চর্য! আমার স্ত্রীকে গতকাল কবর দেয়া হয়েছে!'

শহীদ পা বাড়াল, মোফাজ্জল সাহেব পিছিয়ে গেলেন রুমের ভেতর। শহীদের সাথে সীটিং রুমে প্রবেশ করল কুয়াশাও।

শহীদ বলল, 'কবর দেয়া হয়েছে আপনার স্ত্রীকে নয়। মিস জেসমিনকে। মিস জেসমিন, মানে, আপনার অফিস সেক্রেটারিকে। মি. ফেরদৌস আপনার স্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

দরজা দিয়ে কামাল, রাসেল, সাখাওয়াত এবং মহুয়া ও লীনা ভিতরে ঢুকল। মুহূর্তের জন্য ওদের সবাইকে দেখে নিলেন মোফাজ্জল সাহেব। কিন্তু কারও পরিচয় জানতে চাইলেন না তিনি। শহীদের দিকে ফিরে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'হাউ ফ্যানটাসটিক! আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, মি. শহীদ? অসংখ্য লোক ঢাকায় আমার স্ত্রীর ছবি দেখে তার লাশ সনাক্ত করেছে।'

শহীদ বলল, 'ক্যাপিটাল হোটেলে গত সোমবার সন্ধ্যায় আপনার স্ত্রীই ওঠেন, তিনিই একাধিক পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উদ্ভট আচরণ করতে শুরু করেন। কিন্তু লাশটা তাঁর নয়। লাশটা ছিল মিস জেসমিনের।'

'কিন্তু সে···অসম্ভব!' মোফাজ্জল সাহেব চিৎকার করে ওঠেন, 'ঢাকার পুলিশ আমার স্ত্রীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এখানে পাঠান, এই বাড়ি থেকেও আমার স্ত্রীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয়—দুটো মিলিয়ে তারা পজিটিভ আইডেনটিফাই করেছে···।'

শহীদ বলল, 'এসব জানি আমি। আপনার এই বাড়িতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করার জন্যে ইন্সপেক্টর সাখাওয়াত এসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।'

ইন্সপেক্টর সাখাওয়াত সামনে এগিয়ে এসে বলতে শুরু করল, 'এই বাড়ির প্রতিটি কামরাই অত্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাই আমি। বুঝতে পারি রীতিমত ধোয়া মোছা করা হয়েছে প্রতি কামরায় প্রতিটি জিনিসপত্র। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, যতই ধোয়া মোছা করা হোক, কোন মানুষ যদি বাস করে থাকে সেখানে, পাওয়া যাবেই। কিন্তু প্রথমে নিরাশ হই আমি। তারপর বাথরুমে এবং ড্রেসিংরুমে ঢুকি। কেবল ওই দুই জায়গাতেই দু'জনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাই। একটা মি. ফেরদৌসের। অপরটি ঢাকায় যার লাশ পাওয়া যায় তার।'

মোফাজ্জল সাহেব চিৎকার করে উঠলেন, 'কি প্রমাণ হয় এতে?'

শহীদ বলল, 'ব্যাখ্যা করে বলছি, কি প্রমাণ হয়। কোন সন্দেহ নেই যে আপনি এবং আপনার স্ত্রী, দু'জনে মিলে, আপনার স্ত্রীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রতিটি কামরার প্রতিটি জিনিস থেকে অতি সাবধানে মুছে ফেলেন। মুছে ফেলার পর আপনার স্ত্রী প্লেনে করে ঢাকায় চলে যান। তিনি প্লেনে ওঠার পর আপনি বাড়ি ফিরে আসেন। খানিক পর আপনার কাছে আসে মিস জেসমিন। মিস জেসমিন আপনার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আপনার সাথে পনেরোটা দিন ফুর্তি করার পরিকল্পনা করেছিল। পরিকল্পনাটা অবশ্য আপনারই, সে তাতে সম্মতি দেয়। মিস জেসমিন, স্বভাবতই, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাথরুম এবং ড্রেসিংরুম ব্যবহার করে—ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েক ঘণ্টা সময় তাকে আপনি ইচ্ছা করেই দেন। তারপর আপনি যখন জানতে পারেন যে মিস জেসমিনের হাতের ছাপ এ বাড়ির বাথরুমে, ড্রেসিংরুমে অন্তত পাওয়া যাবে—সময় নষ্ট না করে এরপরই তাকে আপনি খুন করেন। খুন করার পর তার মুখে আঘাতের পর আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেন—যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

মোফাজ্জল সাহেবের হাত থেকে কাচের গ্লাসটা পড়ে সশব্দে ভেঙে গেল। চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'না! না! না! এসব কি শুনছি আমি!'

শহীদ এদিক ওদিক তাকাল, কিন্তু কুয়াশাকে কামরার ভিতর কোথাও দেখতে পেল না।

'অসম্ভব! আমাকে আপনি ফাঁসাতে চাইছেন! এই অপচেষ্টার ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি, মি. শহীদ। আমি? আমি খুন করেছি জেসমিনকে? কেন! কি কারণে? মোটিভ কি আমার!'

'মোটিভের ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি।' বাড়ির অন্দরমহল থেকে একটা দরজা পেরিয়ে সীটিং রুমে ঢুকল কুয়াশা।

'আপনি কে?'

কুয়াশা বলল, 'আমার পরিচয় জেনে লাভ নেই আপনার। ব্যাখ্যাটা শুনুন। আপনি একজন ইনডেন্ট ব্যবসায়ী, তাই না? কিন্তু ইনডেন্ট ব্যবসাটা আপনার মুখোশ, বাইরের আবরণ মাত্র। আপনার আসল ব্যবসা স্মাগলিং। এই স্মাগলিং ব্যবসা আপনি শুরু করেন বছর দু'য়েক থেকে। প্রায় প্রথম থেকেই, ব্যাপারটা জেনে ফেলে মিস জেসমিন, যেভাবেই হোক। জানার পর, সে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে। ফলে তার সাথে আপনার শত্রুতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাকে আপনি ঘৃণা করলেও চাকরি থেকে সরাবার কথা ভাবতেও পারতেন না। যাক, এই ভাবেই চলছিল। নিয়মিত প্রচুর টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছিলেন আপনি। এরপর, হঠাৎ আপনি আর্থিক সংকটে পড়েন। তার কারণ, পোর্টের কাস্টমস্ অফিসাররা আপনার স্মাগল করা মালের সন্ধান পেয়ে যায়। তারা আপনাকে সন্দেহ করেনি। কারণ ছদ্ম-কোম্পানীর নামে মালটা আনিয়েছিলেন আপনি এবং মাল পাবার জন্য কোন রকম দাবি তোলেননি। পোর্টে আপনার চর আছে, সে আগে ভাগে মাল ধরা পড়বার কথাটা আপনাকে জানিয়ে দেয়। যাক, ধরা না পড়লেও আর্থিক দিক দিয়ে চরম সংকটে পড়ে যান আপনি। এদিকে, মিস জেসমিনও টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। অনেক ভেবেচিন্তে আপনি আপনার স্ত্রীকে সব কথা বলেন। এবং এই সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় যে মিস জেসমিনকে হত্যা করা তাও তাকে জানালেন। আপনার স্ত্রী সত্যিই আপনাকে ভালবাসেন। আপনার বিপদে তিনি বিচলিত হন এবং আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে রাজি হয়ে যান।'

মোফাজ্জল সাহেব ধপ্ করে বসে পড়লেন সোফার উপর। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠেন তিনি, 'ওহ গড! সব ধ্বংস হয়ে গেল। আমি…'

কুয়াশা কঠিন কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আমরা এখানে ঢোকার আগে ইকবাল চৌধুরী এবং আপনার স্ত্রীও ছিলেন আপনার সাথে, কোথায় তাঁরা?'

'আমি জানি না…!' শহীদের উদ্দেশে কুয়াশা বলল, 'অ্যাশট্রের দিকে তাকাও, শহীদ। একটা সিগারেট দেখতে পাচ্ছ? ওই ব্র্যাণ্ডের সিগারেট ইকবাল চৌধুরী খায়, মি. ফেরদৌসের ব্র্যাণ্ড ওটা না?'

'বাড়ির ভিতরটা দেখেছ তুমি?'

'দেখেছি। নেই কেউ।'

শহীদ জানতে চাইল, 'ইকবাল চৌধুরী কিভাবে জড়িত এই কেসে?'

ইন্সপেক্টর সাখাওয়াত পকেট থেকে হাতকড়া বের করে এগিয়ে গেল মোফাজ্জল সাহেবের দিকে।

কুয়াশা বলল, 'ইকবাল চৌধুরীই মি. ফেরদৌসকে স্মাগলিংয়ের ব্যবসায় নামায়। ইকবাল অবশ্য জানত না শাহানার স্বামী এই লোকই। শাহানার বিয়ে হয়েছে এ খবর সে রাখত কার সাথে বিয়ে হয়েছে তা জানত না। দু'জনেই ইনডেন্ট ব্যবসায়ী, একসময় স্বাভাবিক ব্যবসার খাতিরেই দু'জনের পরিচয় হয়। এবং পরে আলোচনার মাধ্যমে স্মাগলিংয়ের বেআইনী ব্যবসাতে ইকবাল ওকে টেনে আনে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'শাহানার স্বামীর সাথে যে স্মাগলিংয়ের ব্যবসা করছে—একথা ইকবাল জানতে পারে কখন?'

'শাহানা সম্ভবত স্বামীর পরিচয় দেয়নি ইকবালকে। ইকবাল সম্ভবত ব্যাপারটা জানতে পারে আরও পরে। খবরের কাগজে মি. ফেরদৌসের নাম দেখে খুবই অবাক হয় সে। মি. ফেরদৌসের সাথে দেখা করারও ইচ্ছা হয় তার। কিন্তু ঢাকায় দেখা করলে পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়তে হবে ভেবে সে-চেষ্টা করেনি। তার বদলে সে প্লেনের টিকেট কাটে, একই প্লেনে মি. ফেরদৌসের সাথে চট্টগ্রাম পৌঁছায়। প্লেনে ওরা পরস্পরের সাথে আলোচনা করে। বিপদের কথা ভুলে ইকবাল মি. ফেরদৌসের সাথে চট্টগ্রাম আসে। তার কারণ, শাহানাকে সে আজও ভালবাসে। শাহানার এবং শাহানার স্বামীর এই চরম বিপদে সে সাহায্য করতে চায়।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু ওরা পালিয়েছে। ওদেরকে···।'

কুয়াশা বলল, 'পালাবে কোথায়।'

কুয়াশার কথা শেষ হবার সাথে সাথে সীটিং রুমে প্রবেশ করল ইকবাল চৌধুরী, তার পাশে মিসেস শাহানা।

দু'জনেরই মাথা নত, মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে। দু'জনের হাত দুটো মাথার উপর তোলা। ওদের পিছনে উদ্যত রিভলভার হাতে দেখা গেল মিস্টার স্যানন ডি. কস্টাকে।

মহুয়া নিস্তব্ধতা ভেঙে উঠল, 'আমি ভুল দেখিনি, বাড়ির ছাদে আমি পরিষ্কার দেখেছিলাম ডি. কস্টাকে।'

ডি. কস্টা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বলল, 'বসের নির্দেশে মি. ইকবাল অ্যাণ্ড শাহানার উপর দৃষ্টি রাখিটেছিলাম। উহারা বাড়ির ব্যাক ডোর দিয়া পলাইয়া যাইটেছিলেন, হামি অ্যারেস্ট করিয়া আনিয়াছি। এই-বীরট্বপূর্ণ কাজের জন্য হাপনারা সবাই হামার প্রশংসা করুন!'

হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

সকলের মিলিত হাসির শব্দ চাপা পড়ে গেল একজনের হাসির উচ্চকিত শব্দে। সে হাসিটা বেরিয়ে আসছে স্বয়ং ডি. কস্টার কণ্ঠ থেকে।

***